বনফুলের ছোটগল্প

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ্.ডি. (বাংলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক ঃ সুবল কান্তি চৌধুরী

তত্ত্বাবধায়ক ঃ ড. নিখিল চন্দ্র রায়

বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজা রামমোহনপুর
দার্জিলিং
৭৩৪০১৩
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

২০১১

Th 80.33
খুব/বন

17 DEC 2012

241096

প্রাক্-কথন

বস্তুতপক্ষে আমি যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তরের ছাত্র ছিলাম, সেই সময় 'বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প' পাঠ করে আমার বনফুলের ছোটগল্প সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহল জাগে। পরবর্তীতে অন্যান্য গল্পকারদের গল্প পড়ে ভালো লাগলেও বনফুলের ছোটগল্পের আবেদন আমার মনকে বেশি টেনেছে। সেই ভালোলাগার জায়গা থেকেই 'বনফুলের ছোটগল্প' রচনার প্রচেষ্টা। বনফুলের ছোটগল্প সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে নানা আলোচনা হয়েছে কিন্তু বনফুলের ছোটগল্পের বিভিন্ন দিক সমন্বিত একটি অন্তর্গূঢ় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বা গবেষণা এ যাবৎ হয়নি। এবিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা গ্রন্থ রচনা আমাকে প্রতিনিয়ত উদ্বোধিত করেছে। যার প্রচেষ্টাজাত ফল এই গবেষণাগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যে বনফুলের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট আলোচনা করে তাঁর গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য, শ্রেণীবিভাগ, ভাষা শৈলী, শিল্প সার্থকতা বিচার করে একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। বনফুলের ছোটগল্প নিয়ে ভাবনার এখনও যে অবকাশ নেই তা নয়, বরং উল্টোটাই। আমি আমার নিজের সাধ্যমতো ভাবনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সামান্য ভেবেছি মাত্র।

এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক ড. নিখিল চন্দ্র রায় মহাশয়। তাঁর আনুকূল্য, সস্নেহ উপদেশ, আলাপ-আলোচনা আমাকে প্রতিমুহূর্তে সমৃদ্ধ করেছে এবং এইগ্রন্থকে পরিপুষ্টি দিয়েছে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

এছাড়া আমার বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকরাও আমাকে প্রতিমুহূর্তে একাজে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তাঁদের আমার প্রণাম জানাই।

আর যাঁদের আশীর্বাদ ছাড়া আমি এক পা'ও এগোতে পারতাম না এবং পারবও না তাঁরা হলেন আমার পিতা শ্রী শিবপ্রসাদ চৌধুরী এবং মাতা শ্রীমতি প্রমিলা চৌধুরী আর আমার ঈশ্বর। গুরুজনদের আশীর্বাদই আমার পাথেয়।

নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমার একাজে প্রতিমুহূর্তে মনপ্রেরণা ও উৎসাহের সঙ্গী হয়েছে আমার সহধর্মিণী ঝর্ণা চৌধুরী (সিং)। সে-ই আমার লেখার প্রথম পাঠিকা এবং গুণগ্রাহীও বটে।

আমার এগ্রন্থ রচনায় রায়গঞ্জ কলেজ (ইউনিভার্সিটি কলেজ)-এর 'সেন্ট্রাল লাইব্রেরী'-র গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ, কলকাতা 'জাতীয় গ্রন্থাগার'-এর গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ, 'লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণাকেন্দ্র'-এর কর্ণধার ও কর্মীবৃন্দ, 'রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগার'-এর গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ, কর্ণজোড়া 'রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগার'-এর গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ, হেমতাবাদের 'গৌড় গ্রামীণ স্মৃতি পাঠাগার'-এর গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ, 'উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার'-এর গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ আমাকে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা পাঠে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার লেখা টাইপ করে দিয়ে আমাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন 'সান কম্পিউটার'-এর শ্রী দেবাশিষ চন্দ এবং শ্রী অশোক গোস্বামী। আর বই বাঁধাইয়ের কাজ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন করে আমাকে চিন্তামুক্ত করেছেন লক্ষ্মী প্রিন্টিং প্রেস-এর কর্ণধার শ্রী পবিত্র কুমার তরফদার মহাশয়। এঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

ইতি
সুবল কান্তি চৌধুরী
৪/২/২০১১

বাড়ইবাড়ি
হেমতাবাদ
উ! দি:

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

প্রথম অধ্যায়	ঃ	বাংলা সাহিত্যে বনফুলের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট।	পৃষ্ঠা— ১-২৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঃ	বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য।	২৭-৫৩
তৃতীয় অধ্যায়	ঃ	বনফুলের ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগ।	৫৫-১০৩
চতুর্থ অধ্যায়	ঃ	বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী।	১০৫-১৭০
পঞ্চম অধ্যায়	ঃ	বনফুলের ছোটগল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার।	১৭২-২২৪
ষষ্ঠ অধ্যায়	ঃ	বনফুলের ছোটগল্পের সামগ্রিক মূল্যায়ন।	২২৬-২৩২
পরিশিষ্ট	ঃ	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী এবং প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা।	২৩৪-২৩৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	বনফুলের ছোটগল্পের সামগ্রিক মূল্যায়ন।	২২৬-২৪৫
পরিশিষ্ট	:	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী এবং প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা।	২৪৭-২৫২

Assistant Librarian
University of North Bengal

প্রথম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে বনফুলের আর্বিভাবের প্রেক্ষাপট

প্রথম অধ্যায়

"বাংলা সাহিত্যে বনফুলের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট"

যে-কোন দেশের, যে-কোন কালের সাহিত্যে পালাবদলের বা নতুন কোন জীবনাদর্শের সূচনা একদিনে বা নির্দিষ্ট কোন এক সময়ে ঘটে না; তার মাহেন্দ্রক্ষণ অনুধাবন করতে হয় সেই যুগচেতনা ও লেখকের জীবনচেতনার সমন্বয়ে। বাংলা গল্পের জগতে বনফুলের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপট অনুধাবন করতে হলে সমসাময়িক যুগচেতনার প্রেক্ষিতে ব্যক্তি–বনফুলের মানস–ধর্মকে বুঝতে হবে। এই অধ্যায়ে বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশের ধারায় বনফুলের আবির্ভাবের সময় যে সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও মানসিক পরিবেশ–পরিস্থিতি বাংলা ছোটগল্পকে প্রভাবিত করেছিল, যুগপ্রবণতা ধরে তার আলোচনা করে বাংলা ছোটগল্প চর্চার ধারায় বনফুলের অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

বনফুলের জন্ম (১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই) থেকে মৃত্যু (১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত— এই সুদীর্ঘ সাতটি দশক ধরে নানা রাজনৈতিক ঘটনা বাংলা তথা ভারত তথা বিশ্বকে নানাভাবে আলোড়িত করেছিল, যা তৎকালীন রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি, সামাজিক জীবন ও ব্যক্তি চরিত্রের মানসিক পরিস্থিতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, আর তার অনিবার্য প্রভাব সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচনায় নানাভাবে পড়েছিল। সেই কালের প্রভাবকে আত্মীকরণের ও প্রকাশের 'ধরন' অনুসারে সাহিত্যিকেরা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর ও মানসপ্রবণতার প্রতিনিধিত্বে পরিচিত হয়েছিলেন। তাই সাহিত্যিকদের মানসপ্রবণতা বিচারে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিস্থিতি আলোচনা অনিবার্য হয়ে ওঠে। তবে তা সমাজচেতনাকে অনুধাবন করার জন্য, ইতিহাস রচনার জন্য নয়।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি বাংলা তথা ভারতের সামাজিক জীবনধারা, বাঙালির মানসলোকে তথা ভাবলোকে নানা উত্থান–পতনময় ভাবসংঘাত সৃষ্টি করেছিল, যা মানুষের জীবনকে, জীবনভাবনাকে ওলোট–পালট করে দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বাঙালির মর্মমূলকে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল, তা হল– 'বঙ্গ–ভঙ্গ আন্দোলন' (১৯০৫–১৯১১)। ঊনবিংশ শতাব্দীর সহজ সরল স্বাভাবিক অখণ্ড জীবনবোধের ভাবনায় তা প্রথম কুঠারাঘাত করল। লর্ড কার্জন সেদিন যে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার কথা বলেছিলেন, সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপামর বাঙালি ঐকবদ্ধ হয়ে অখণ্ড জাতিরূপে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছিল। এই সিদ্ধান্তকে কোনভাবেই সেদিন বাঙালি মনে প্রাণে মেনে নিতে পারে নি। তার প্রতিবাদ স্বরূপ তারা 'স্বদেশী আন্দোলন' শুরু করেছিল–বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকেনি। দুর্মর স্বাদেশিকতা ও বাঙালিত্বের চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে সহিংস হয়ে পড়েছিল। এক কথায়, সমগ্র বাংলাদেশের আপামর মানুষের মনে 'এক নবভাবের প্লাবন' ডাক দিয়েছিল। কিন্তু সেই উজ্জীবিত প্রাণাবেগ স্তব্ধ হয়ে গেল, যখন বঙ্গ–ভঙ্গ রদ হল (ডিসেম্বর, ১৯১১)। দেশের তরুণ সমাজ যে এক নতুন ভাবাদর্শ ও কর্মের সম্ভাবনার দিকে চেয়েছিল, তার সমাধি ঘটল। এর ফলে দেশের যুবসমাজ

তীব্র হতাশার মধ্যে নিমজ্জিত হল। বাঙালি সমাজে প্রাণস্ফূর্তিতে যে ধারা বইতে শুরু করেছিল, তা ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকল। বাঙালি আবার তার চিরাচরিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হতে থাকল যেন। তারপর মানবজীবনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘনিয়ে এল ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সার্বিয়াকে আক্রমণের মধ্য দিয়ে—শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সারা বিশ্ব এক মারণ খেলায় মেতে ওঠে নিজের পেশীশক্তির ক্ষমতা দেখানোর জন্য। বাংলা তথা ভারত প্রত্যক্ষভাবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও এর তীব্র আঁচ থেকে রক্ষা পায় নি। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের যুদ্ধের লেলিহান শিখা বাংলার জনজীবনকেও বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। এই দীর্ঘ চার বছরের বিশ্বব্যাপী সংগ্রামে বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশই কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সাধারণ মানুষের জীবনে এক তীব্র শ্বাসরোধকারী অবস্থার সৃষ্টি করেছিল— ব্যাপক ও তীব্র অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূল্যবোধের অবক্ষয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা, স্বার্থপরতা, কালোবাজারী, মজুতদারী, সনাতন প্রত্যয়গুলির অপমৃত্যু — এককথায়, মানসিক সংকটের প্রবল আবর্তে পড়ে মানুষ সেদিন দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এরই মধ্যে ১৯১৭-য় সমাজতান্ত্রিক রুশ বিপ্লব, ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের নিষ্ঠুর দমনমূলক কালাকানুন 'রাওলাট আইন' প্রয়োগ জনজীবনকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। প্রচণ্ড হতাশায় ও আঘাতে জনজীবন তখন ফুঁসছিল। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের বিশাল সমাবেশে মাইকেল ও' ডায়ারের নেতৃত্বে নিরস্ত্র মানুষের ওপর নৃশংসভাবে গুলি চালানোয় অগণিত নিরীহ মানুষ তাতে প্রাণ হারায়। সারা ভারত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সে দৃশ্য দেখে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন। জাতির দীর্ঘদিনের অবরুদ্ধ ক্ষোভ ফেটে পড়ে চরম বোঝাপড়ার নেশায়। এদের নেতৃত্ব দিলেন গান্ধীজী। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের ১-লা আগষ্ট গান্ধীজীর 'অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন' -এর সূচনা। সমগ্র দেশব্যাপী জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু অহিংস আন্দোলন সেদিন বুভুক্ষু দেশপ্রেমিক মানুষদের চিত্তকে অস্থির করে তুলেছিল। ফলে, আন্দোলন ক্রমেই সহিংস রূপ নিতে থাকে— উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা পুলিশ ফাঁড়িতে ২২ জন পুলিশকর্মীকে আন্দোলনকারীরা পুড়িয়ে মারলে, গান্ধীজী অহিংস আন্দোলন সহিংস রূপ নেওয়ায় ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই আন্দোলন ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল, মধ্যবিত্ত শ্রেণির অংশগ্রহণ না করা। কারণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণি তখন জীবন ধারনের তাগিদে সংসার প্রতিপালনের উপায় অন্বেষণে বাধ্য হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মধ্যবিত্তের আর্থিক সংকট, দারিদ্র ও বেকার সমস্যা, খাদ্য-সংকট, বস্ত্র-সংকট ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এর কারণ হল, মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার পরিকল্পনায় (১৯১৯) অর্থনৈতিক সংস্কারের নিয়মকানুন। এতে নানাভাবে প্রদেশগুলি থেকে যতবেশি সম্ভব অর্থ সংগ্রহের একটা প্রচেষ্টা ছিল। তাতে বাংলাদেশও রেহাই পায়নি। এরপর ১৯২৮-এ মানবেন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে সাম্যবাদী আন্দোলন, ১৯২৯-এ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৩০-এর ফেব্রুয়ারিতে কংগ্রেসের 'আইন-অমান্য

আন্দোলন', ১৯৩১-১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের বাংলার মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের প্রচার ও প্রসার, ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারত শাসন আইন' প্রণয়ন ও প্রয়োগ এবং তার অব্যবহিত পরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, যা ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩-রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। এই ৬ বছর ১দিনের যুদ্ধ সারা পৃথিবীর তথা ভারত তথা বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার ধরন ও মানসিক প্রকৃতিকে একেবারে পাল্টে দিয়েছিল। তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, চারিদিকে সন্দেহ, অবিশ্বাস, সংঘাত, মূল্যবোধর চরম অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতা, জীবন-জিজ্ঞাসা, আত্মসন্ধান মানুষকে এক নতুন জীবন সংগ্রামের পথে ঠেলে দিয়েছিল। এরই মধ্যে ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, ১৯৪৩-এর ভয়াবহ বন্যা, মন্বন্তর বাংলার চিত্রটিই পাল্টে দিয়েছিল। তারপর ১৯৪৬-এর আত্মঘাতী রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা বাঙালির হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল। তারপর এল বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা---১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট। এই স্বাধীনতা অনেক স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল প্রাণে। কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে যে উদ্বাস্তু সমস্যা ও জীবন-সংকট দেখা দিয়েছিল তাও কম বিচলিত করেনি বাংলার সমাজ জীবনকে। আত্ম-জিজ্ঞাসা আর আত্মবিশ্লেষণ এক নতুন মাত্রালাভ করে পঞ্চাশের দশকে। এরপর ষাটের দশকে (১৯৬৭ সালের মে মাসে) উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়িতে নকশাল আন্দোলনের সূচনা এবং সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ক্ষমতা লাভ বাংলায় চরম অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল আর তার ছাপ পড়তে শুরু করেছিল সাহিত্যিকদের রচনায়। ড. বিজিত ঘোষ তাঁর "নির্বাচিত ছোটগল্প ঃ নতুন আলোকে" গ্রন্থে জানিয়েছেন, "১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় পরিপূর্ণ সন্ত্রাসের রাজত্ব চলে। রাষ্ট্র ও জাতির জীবনে তুমুল রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সত্তরের দশকে হিংস্রতার রাজনীতির আক্রমণ ঘটে বার বার। প্রতিক্রিয়াশীলদের সন্ত্রাস সৃষ্টি, '৭২ -এর 'ভৈরবতন্ত্র', 'জরুরি অবস্থা'-র তাণ্ডব---সবকিছুই লেখক-শিল্পীদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।

সমগ্র দেশ তখন ক্ষুধা, ঘৃণা, প্রতিবাদ ও ক্রোধের আগুনে দাউ-দাউ করে জ্বলছে। বুলেট-বেয়নটে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে পথে প্রান্তরে, অরণ্যে বন্দিশালায় অবিরাম রক্ত ঝরাচ্ছে। তখন সেই আতঙ্ক পাণ্ডুর সন্ত্রাসের অবস্থায় রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দর্শন অনুযায়ী সমাজ সচেতন লেখকগণ সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছেন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের গল্প লিখতে।"

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে সত্তরের দশক (অর্থাৎ বনফুলের জীবৎকাল পর্যন্ত) পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন লেখক-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যদিও অনেক লেখক ছিলেন যাঁরা কোন বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন না, বা বলতে পারি, একটি বিশেষ পত্রিকায় নয়, একাধিক পত্রিকায় তাঁরা লিখতেন। সে সময় এক একটি পত্রিকা এক একটি বিশেষ আদর্শ নিয়ে যাত্রাপথ তৈরী করেছিল। 'ভারতী' (১৮৮৭-১৯২৬), 'প্রবাসী' (১৯০১-১৯৬৬), 'ভারতবর্ষ' (১৯১৩-১৯৫৬), 'সবুজ পত্র' (১৯১৪-১৯২৮), 'কল্লোল' (১৯২৩-১৯৩০), 'শনিবারের চিঠি' (১৯২৪-

১৯৬৩), 'উত্তরা' (১৯২৫-১৯৬৩), 'কালি-কলম' (১৯২৬-১৯৩০), 'বিচিত্রা' (১৯২৭-১৯৩৯), 'প্রগতি' (১৯২৭-১৯৩০), 'পরিচয়' (১৯৩১ -), 'কবিতা' (১৯৩৫-১৯৬৫),'চতুষ্কোণ' (১৯৪৮-), 'পূর্ব্বাশা' (১৯৩২-১৯৭৭), 'আত্মশক্তি', 'ধূপছায়া', 'সংহতি', 'দেশ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সেদিন ও বহু সাহিত্যিক তাঁদের নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী অজস্র গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে নব নব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন।

তবে আমরা আলোচনার প্রেক্ষাপটে উক্ত পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে যে বিশেষ লেখক গোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যাসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন (বিশেষতঃ বনফুলের সমসাময়িক কালে) তাঁদের মানস প্রবণতা আলোচনা করে বনফুলের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের চেষ্টা করব।

বনফুলের সমসাময়িককালের উল্লেখযোগ্য গল্পকারদের মধ্যে যাঁদের আমি আলোচনার পরিসরে রেখেছি, তাঁরা হলেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮), রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০), নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪), জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭), দীনেশ রঞ্জন দাস (১৮৮৮-১৯৪১), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০), গোকুল চন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫), মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭-১৯৮৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯), পরিমল গোস্বামী (১৮৯৯-১৯৭৬), সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬), মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭), মণীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯), অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬), সরোজ কুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০), প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮), প্রবোধ কুমার সান্যাল (১৯০৭-১৯৮৩), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৬), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭০), নবেন্দু ঘোষ (১৯১৬-), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) প্রমুখ।

উক্ত সাহিত্যিকেরা কেউ কেউ মধ্যবিত্তের জীবনাশ্রয়ী ভাবালুতা, কেউ কেউ রিরংসার জীবন-কথা, কেউ কেউযৌনচেতনা নির্ভর জীবনকথা, কেউ কেউ প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশ-পরিস্থিতি, কেউ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারী, মজুতদারী, মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংকট, মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় প্রভৃতিকে নিয়ে গল্প লিখেছেন। কিন্তু যিনি বেশ কিছুটা নতুন স্বাদের, নতুন ধাঁচের গল্প লিখে চমক সৃষ্টি করলেন, তিনি হলেন বনফুল ওরফে বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। তবে বনফুলের স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের পূর্বে উক্ত সাহিত্যিকদের মানস প্রবণতাটি অনুধাবনের পথে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ঃ ছোটগল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথের প্রথম

গল্প রচনার প্রচেষ্টা দেখা যায় 'ভারতী' পত্রিকায় 'ভিখারিনী' (১২৮৪) গল্প রচনার মধ্যে। তবে তা সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠেছে কিনা তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধায় ছিলেন। এসম্পর্কে তিনি বলেছেন— **'সেটা যে কি বকুনির বিনুনি তা নিজে যাচাই করবার বয়স ছিল না।'** এরপর ১২৯১ বঙ্গাব্দে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় 'ঘাটের কথা' এবং 'নবজীবন' পত্রিকায় ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'রাজপথের কথা' প্রকাশিত হয়। এরপর একে একে ১৮৯১-১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বহু গল্প লিখেছেন। যেমন— 'দেনাপাওনা' 'পোস্টমাষ্টার' 'গিন্নি' 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' 'ব্যবধান' 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' 'অতিথি' 'সুভা' 'ছুটি' 'আপদ' 'মাল্যদান' 'একরাত্রি' 'সমাপ্তি' 'নষ্টনীড়' 'মণিহারা' 'কঙ্কাল' 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'গুপ্তধন' 'স্ত্রীর পত্র' 'তিনসঙ্গী'-র - 'রবিবার' 'শেষকথা' 'ল্যাবরেটরি'। রবীন্দ্রনাথের এই বিবিধ সৃষ্টি সম্ভারে বাংলা ছোটগল্পের পত্তন, পরিচর্যা ও বিকাশ। আমাদের জগৎ ও জীবনের নানা সমস্যা, অনুভূতি ও উপলব্ধি দিয়ে তিনি গল্প ফেঁদেছেন। তিনিই বাংলা ছোটগল্পে এক নব্য দৃষ্টিদানে পরবর্তীকালের আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের পথটি প্রশস্ত ও মসৃণ করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে নারীর আত্মমর্যাদা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক সম্পর্কের নবমূল্যায়ণ, পুরনো মূল্যবোধকে নতুন আলোকে দেখা ইত্যাদি প্রসঙ্গ রূপায়িত হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নগরকেন্দ্রিক রেনেসাঁসের বোধকে ছাপিয়ে রবীন্দ্র ছোটগল্পে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে ধ্যান-ধারণার ভাঙাগড়া, লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, **'নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার ইতিহাস।'** এই নিজের সঙ্গে নিজের **'বোঝাপড়া'** করতে গিয়ে তাই সবসময়ই তাঁর গল্পে একটি আদর্শবোধ বা **'আইডিয়ালিজম'** পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে, যাতে করে আমাদের মনে হয় তাঁর গল্পগুলিতে বাস্তবতার স্পর্শ থাকলেও মাটির স্পর্শে মলিন হয়নি পুরোপুরি। বিংশ শতাব্দীর দু'টি বিশ্বসমর যেখানে আমাদের সমাজ জীবনের মর্মমূলকে ধরে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল, সেই মহাযুদ্ধের বিভীষিকা ও মানবীয় মূল্যবোধের ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়ে 'সভ্যতার-সংকট' -এ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, **"মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।"**[১] তাঁর এই **'সুদৃঢ় মানব প্রত্যয় ও শাশ্বত জীবনসত্যে'** আস্থা তাঁকে আদর্শবাদের দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে বলে মনে হয়। তবু একথা বলতে কুণ্ঠা নেই যে, তাঁর প্রদর্শিত পথেই বাংলা ছোটগল্পের পথচলা শুরু।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২) ঃ 'ভারতী' গোষ্ঠীর প্রভাতকুমার রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে লালিত এক যোগ্য উত্তরসূরী। **'উত্তরসূরী'** এই অর্থে যে তিনি রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে গল্প লিখে আপন বৈশিষ্ট্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করে বাংলা ছোটগল্পের ধারাকে সমৃদ্ধ করলেও রবীন্দ্র ভাব পরিমণ্ডল থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারেন নি। প্রভাত কুমারের উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল— 'বলবান জামাতা' 'কাশী বাসিনী' 'আদরিণী' 'প্রণয় পরিণাম' 'রসময়ীর রসিকতা' 'দেবী' 'মাষ্টার মশায়' 'বউচুরি' 'লেডি ডাক্তার' 'ফুলের মূল্য' 'মাতৃহীন' ইত্যাদি। তাঁর গল্পগুলি কোনটি নির্মল হাস্যরসের, কোনটি মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজ সমস্যামূলক, কোনটি অলৌকিক, কোনটি বা বিদেশী পটভূমিকায় রচিত। প্রভাতকুমারের গল্পগুলিতে একটি **'মোহের আবরণ'** প্রভাব বিস্তার

করেছিল। তাতে চমকে দেবার মত কোন ফ্যাক্টর কাজ করে নি। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন— **"প্রভাতকুমার যে একেবারে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের গল্প উপহার দিতে পারেন নি, তা তাঁর ত্রুটি নয়, ব্যক্তিত্বের সীমা। এই সীমা কিন্তু এক খড়ির গণ্ডি, যার মধ্যে তিনি প্রধান অর্থে 'good' বা 'minor' গল্পকার। এই ক্ষমতায় বেশ কয়েকটি ভাল গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। পাঠকের মনকে বিলাসের, তৃপ্তির সুখপাঠ্য স্বভাবে মজিয়ে তোলার দুর্লভ ক্ষমতা ছিল। লঘুরস আর সাজানো সমাজের ছবি ধরে তিনি নিপুণ কুশলী গল্প শুনিয়েছেন। মানুষে মানুষে স্নেহের সম্পর্ক, কৌতুকহাস্যের শুভ ও শোভনশালীন রসস্রোত, ঘটনা সাজানোর কৌশল, বিলাস-মুখ্য পরিবেশ রচনা, আপনজনদের মধ্যেকার সহজ পদস্খলনে শান্তি বারি বর্ষণ—এসব নিয়েই গল্পের শিল্পগত সর্বায়ব বন্ধনকে মোহের আবরণে সত্য করেছেন।"**[২] তাই এই 'শুচিবাদী লেখকের' 'ঘটনা সাজানোর স্বাভাবিক কৌশল, পাঠক রুচির ও চিত্তবিনোদনের আনুগত্য— সহজ আনন্দ সুখ দানের লক্ষ্য, এসবেই তাঁর সে সময়ের বিপুল জনপ্রিয়তার শিল্প-ভাগ্য নির্দিষ্ট কবচকুণ্ডল।'[৩] তবু বলা যায় প্রভাতকুমারের গল্পগুলি সে সময়ের বাংলা সাহিত্যে এক নতুন স্বাদ দিয়েছিল, বিশেষতঃ তাঁর হাসির গল্পগুলি। তাঁর গল্পের প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— **"তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।"** গল্পের এই কল্পনাবিলাসিতা ও হাস্যরসোচ্ছলতার মধ্যেও জীবনের অনেক গভীর সত্য রূপায়িত করেছেন প্রভাতকুমার। তবে তাতে সমকালীন যুগ-যন্ত্রণার প্রভাব কম, জীবন অভিজ্ঞতার আলোকে চলমান কিছু ছবি উঠে এসেছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)ঃ 'ভারতী' পর্বের আর এক উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম গল্প 'মন্দির' ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে 'কুন্তলীন' পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিল এবং তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'বড়দিদি' ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যাসরে পদার্পণের সময়টি যুগসন্ধিক্ষণের। একদিকে সাহিত্যে গণতান্ত্রিক চেতনার ধারা অর্থাৎ অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের কথা; অন্যদিকে পুরনো রক্ষণশীল সমাজের ও পরিবারের মানুষের হৃদয়বত্তা ও মনুষ্যত্বের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ লাভ করেছে। নারীর নব মূল্যায়ণ, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ, মানুষের হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রেম-ভালোবাসা-দলাদলি-গালাগালি যে সহানুভূতি রসে শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে তার বিকল্প নেই। শরৎচন্দ্রের জীবন চিত্রণে যে দরদ ও ভাবাবেগের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায় বিংশ শতাব্দীর সংকটকালীন সময়ে সেই হৃদয়াবেগের প্রাচুর্য থেকে সাহিত্য সরে আসতে শুরু করেছিল। তবু তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়ে সেদিন আপামর বাঙালি তৃপ্তি পেয়েছিল। এর কারণ, **"তিনি বাংলাদেশের নিতান্ত পাঁচাপাঁচি সাধারণ নর-নারীর মলিন ও তুচ্ছ জীবনকেই উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাতে**

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কল্পলোকচারী প্রেম ও রোমান্সের বিপুল ঐশ্বর্য নেই বললেই চলে।"[৪] তাঁর 'অভাগীর স্বর্গ' 'গিন্নি' 'পল্লীসমাজ' 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি গল্প-উপন্যাসগুলি পড়লে এ সত্যতা টের পাওয়া যায়।

চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮) ঃ 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'মনের কথা' চারুচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প। 'প্রবাসী'-র সহ-সম্পাদক হিসেবে তিনি কাজও করেছেন কিছুদিন। 'ভারতী'-তেও লিখেছেন চারুচন্দ্র। 'অপরাজিতা' 'প্রেমের নিরিখ' 'চুড়িওয়ালা' 'বন্ধু' 'বায়ু বহে পূরবৈয়া' প্রভৃতি চারুচন্দ্রের বিশিষ্ট গল্প। তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে যৌন আবিলতা, রোমান্টিক ভাবালুতা ও 'কাব্যগন্ধিতা' বেশি প্রকট।

রাজশেখর বসু (১৮৮০-১৯৬০) ঃ বাংলা সাহিত্যে নির্মল হাস্যরসের গল্প যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরাম নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁর আত্মপ্রকাশ গল্পের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। ১৩২৯ সালে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'বিরিঞ্চি বাবা' নামে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। চেষ্টাকৃত নয়, আমাদের চিরপরিচিত সাধারণ নর-নারীর চরিত্রের অসঙ্গতিতে সহজ-সরলভাবে সামান্য অতিরঞ্জনের দ্বারাই এক অনাবিল হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন তিনি। পরশুরামের প্রথম গল্প সংকলন 'গড্ডালিকা' প্রকাশিত হবার পরই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন। 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' 'চিকিৎসা সংকট' 'ভূশণ্ডীর মাঠে' 'লম্বকর্ণ' ইত্যাদি গল্পগুলি 'সৃজন কৌশল বস্তু-বিশ্বের নিখুঁত অভিজ্ঞতার সঙ্গে লেখকের মননশীল মনের 'fantasy'-র বিমিশ্রতায় গড়া'[৫] এক উদ্ভট পরিবেশ আমাদের এক অনাবিল হাসির জগতে নিয়ে যায়। তবে বিংশ শতাব্দীর মানব-জীবনের জটিল জীবন-সংকটের চিত্র তাতে অনুপস্থিত।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪) ঃ বাংলা কথা সাহিত্যে রবীন্দ্র উত্তরণের সচেতন প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছিল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের গল্প-উপন্যাসে। সাহিত্যে 'বাস্তবতা' অর্থাৎ নর-নারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষাকে 'ভারতী' গোষ্ঠীর রচনায় ইতিপূর্বেই রূপলাভ করেছে আংশিক ভাবে। তাতে নতুন সুর যোজনা করলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। তাঁর প্রথম গল্প 'ঠানদিদি' ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর 'পাপের ছাপ' ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি "যৌনভাবাশ্রিত ক্রিমিনাল মনোবৃত্তির"[৬] প্রথম রূপচিত্রণ। তাঁর 'ঠানদিদি' গল্পে 'যৌন অভিলাসের অসংলগ্ন আত্যন্তিকতার প্রতি-ই প্রধান ঝোঁক।'[৭] তাঁর ছোটগল্প সংকলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য — 'দ্বিতীয় পক্ষ' (১৯১৯), 'অগ্নি সংস্কার' (১৯২০), 'গ্রামের কথা' (১৯২৪), 'একা' (১৯২৭), 'তাবিজ' (১৯২৯) প্রভৃতি। তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস 'স্বপ্ন সৌধ' (১৯৬১)। নরেশচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে মানব-জীবন ও সমাজ জীবনের যে চিত্র রূপায়িত হয়েছে তাতে বস্তুতঃ 'বৈনাশিকতার মনস্তত্ব তত নয়, নর-নারীর দেহাসঙ্গের নানা 'আধুনিক' জটিলতার চারপাশে সমকালচলিত সামাজিক সমস্যার দীর্ঘ বিস্তৃত জাল বুনেই এগিয়েছে তাঁর গল্প-উপন্যাস।'[৮]

জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) ঃ জগদীশ গুপ্তের গল্পে প্রকৃতিকতাই অর্থাৎ ন্যাচারালিজম রূপলাভ করেছে। তাঁর প্রথম গল্প 'পেয়িং গেষ্ট' 'বিজলী' পত্রিকায় ২৯-শে ফাল্গুন ১৩৩১-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' ও 'কালি কলমে' তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প সংখ্যা ছিল দু'টি— 'ঘেন্নার কথা' ও 'পুরাতন ভৃত্য'। তিনি বহু গল্প রচনা করেছেন। তাঁর **'জগদীশ গুপ্ত মানবজীবনের শুভ পরিণামে আস্থা স্থাপন করেন নি। মানুষের জীবনব্যাপী সকল শুভ প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায় তাঁর বিশ্বাস। আর এই ব্যর্থতার অন্তরালে তিনি অনুভব করেছেন এক অন্ধ নির্মম শক্তিকে। তার কাছে মানুষ পরাজিত। ব্যক্তির এই অসহায়তা জগদীশ গুপ্তের গল্পপাঠে পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে যায়।'**[৯] জগদীশ চন্দ্রের গল্পে এই দুঃখময়তার চিত্র অঙ্কনে যৌন অভিব্যক্তি বড় প্রকট সেটাও অবশ্য স্বীকার্য। 'কল্লোল'-এর কালের উদ্দাম যৌন বিলাস তাঁর রচনাতেও উপস্থিত। তাঁর গল্প সংকলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'বিনোদিনী' (১৯২৭), 'রূপের বাহিরে' (১৯২৯), 'শ্রীমতি' (১৯৩০), 'উদয় লেখা' (১৯৩২), 'তৃষিত' (১৯৩২), 'সৃক্কনি' (১৯৩২), 'রতি ও বিরতি' (১৯৩৪), 'উপায়ণ' (১৯৩৪), 'শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী' (১৯৩৫), 'মেঘাবৃত্ত অশনি' (১৯৪৭) প্রভৃতি।

দীনেশ রঞ্জন দাস (১৮৮৮-১৯৪১) ঃ 'কল্লোল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক ও 'four arts club'-এর সদস্য দীনেশ রঞ্জন দাসের গল্পে তৎকালীন জীবন যন্ত্রণার চিত্র ও যুগ পরিবর্তনের নানা ছবি ফুটে উঠেছে। তাঁর রোমান্টিক স্বপ্নপ্রবণ মন নর-নারীর জীবন চিত্রনে স্বপ্নমেদুরতা আমদানি করেছে। 'পার্বতী' 'গাঁয়ের মাটি' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। 'মাটির নেশা', 'ভূঁইচাপা' নামে তাঁর দু'টি গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়। তিনি ছিলেন কল্লোলীয় চেতনার ধারক ও বাহক এবং সর্বোপরি 'কল্লোল গোষ্ঠী'র জনক। তিনি ছিলেন **'কল্লোলের সব পেয়েছিল দেশ। সব হারানোর মধ্যমণি।'**[১০]

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯৮৭) ঃ দেশ কাল 'হিসেব ছুট' লেখক বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রথম গল্প 'অবিচার' প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'-তে ১৩২২-এর শ্রাবণ সংখ্যায়। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলনগুলি হল— 'রাণুর প্রথম ভাগ' (১৯৩৭) 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' (১৯৩৮) 'রাণুর তৃতীয় ভাগ' (১৯৪০) 'বর্ষায়' (১৯৪০), 'রাণুর কথামালা' (১৯৪১) 'বসন্তে' (১৯৪১) 'বরযাত্রী' (১৯৪২) 'বাস্তব ও অবাস্তব' (১৯৫৪) 'কন্যা সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী' (১৯৬২) প্রভৃতি। বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে সমকালীন জীবনের জটিল রূপায়ণ নেই, সহজ সরল হাস্যোজ্জ্বল জীবন চিত্রই ফুটে উঠেছে। হাসির গল্পকাররূপে তাঁর পরিচিতি সমধিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কোন উত্তেজনা বা সচেতনতা তাঁর গল্পে নেই বললেই চলে। তাঁর **'কাহিনীতে বর্ণিত জীবনের সুনির্দিষ্ট কোন কাল চরিত্র গড়ে ওঠেনি।'**[১১]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) ঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' ১৩২৮ বঙ্গাব্দের (১৯২১) মাঘ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ২৯ বছর ধরে

বিভূতিভূষণ গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্প গ্রন্থের সংখ্যা ২৯ এবং প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ২২৪। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'মেঘমল্লার' 'মৌরীফুল' 'যাত্রাবদল' 'কিন্নরদল' 'তালনবমী' ইত্যাদি। বিভূতিভূষণের গল্পের প্রধান আকর্ষণ মানুষ। তিনি জীবনপ্রেমী শিল্পী। জীবনের সহজ সরল সাধারণ রূপ অঙ্কনেই তাঁর ঝোঁক প্রবল। তাঁর রচনার বিশেষ আকর্ষণ হল **'মন কেমনের হাওয়া (nostalgia)**।'[১২] তিনি শরৎচন্দ্রের ঘরোয়া রোমান্সকে আরও ঘোরালো ভাবে রূপায়িত করেছেন।

গোকুল চন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) ঃ চারুশিল্প, গান, সাহিত্য এবং কারুশিল্প সমন্বিত **'four arts club'** -এর অন্যতম স্থপতি ও কল্লোলীয় চেতনার পরিবাহক গোকুল চন্দ্র নাগ 'কল্লোল' (১৯২২) পত্রিকা বের করে এক নতুন 'আধুনিকতা' আমদানি করেছিলেন সাহিত্যে। 'কল্লোল' ছাড়াও 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' 'নবভারত' পত্রিকাতেও তাঁর কিছু গল্প বের হয়। 'রূপরেখা' (১৯২৪) 'মায়ামুকুল' (১৯২৭) তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন। 'দেবতার গ্রাস' তাঁর একটি বিশিষ্ট গল্প। তৎকালীন জীবনের আরক্ত কামনা-বাসনা, অতৃপ্ত বেদনা, উদ্মাদনা, উচ্ছলতা তাঁর গল্পগুলিতে নিটোলভাবে রূপায়িত হয়েছে। যদিও সেসব গল্পে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে।

মণীন্দ্রলাল বসু (১৮৯৭-১৯৮৬) ঃ 'কল্লোল' ধারার 'যথার্থ উত্তরসূরী' মণীন্দ্রলাল বসু বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক উচ্ছ্বাস ও প্রকৃতিকতা এবং সমাজের বিরুদ্ধে এক তির্যক বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনা শুরু করেন। 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হবার পূর্বেই 'প্রবাসী' তে তাঁর বেশ কিছু গল্প-উপন্যাস বের হয়, যাতে কল্লোলীয় মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। কল্লোলের পূর্বে যে **'four arts club'** গোকুল নাগ ও দীনেশ রঞ্জন দাস গড়েছিলেন, তার সদস্য ছিলেন তিনি। অবক্ষয়ী যুগের চেতনা যুব সমাজকে যখন উদ্বেলিত করে তুলেছিল, সেই সর্বাত্মক ধ্বংসের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে তিনি **'নর-নারীর দেহমনগত সম্পর্ক নিয়ে নূতন কৌতুহল, নূতন জটিলতা, মধ্যবিত্ত অবনমনের চালচিত্র, ক্ষয়িষ্ণু তারুণ্যের ঝলসে পড়া ভাবোদ্দীপনা ও তার করুণতা'**[১৩]— সমস্ত কিছুই তাঁর রচনায় প্রতিভাত হয়েছে, তবুও সেই জীবন চিত্রণে এক রোমান্টিক স্বপ্নাতুর অনুভূতি জড়িয়ে আছে। 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত তাঁর 'মা' গল্পটি সে সময় অনেকের হৃদয়ে দাগ কেটেছিল। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলনগুলি হল— 'মায়াপুরী' (১৯৩০) 'রক্তকমল' (১৯২৪) 'সোনার হরিণ' (১৯২৪) 'কল্পলতা' (১৯৩৫) 'ঋতুপর্ণ' (১৯৩৭) ইত্যাদি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মাটি ও মানুষের শিল্পী, প্রবৃত্তি ও নিয়তি লীলার রূপকার। সেই সঙ্গে যে জীবন জীবদেহকে অতিক্রম করে মানবধর্মকে খুঁজে পায় তারও শিল্পী। তবে আঞ্চলিক সাহিত্যের স্রষ্টা হিসেবেই তাঁরও সমধিক পরিচিতি। উত্তর রাঢ়ের অর্থাৎ বীরভূম-বাঁকুড়ার অন্তে নিবাসী সমাজ ও জীবন কথাই তাঁর সাহিত্যে প্রধানভাবে রূপ গ্রহণ করেছে। **'এই সমাজের অভিজাত, অনভিজাত, জমিদার লোভী ব্রাহ্মণ, ডাক্তার, কেরানী, ব্যবসায়ী, কাহার, বাগ্দী, সাঁওতাল, চাষী, মাঝি, বাজীকর, বেদেনী খেমটা**

নাচের দল সবই আছে।'[১৪] সেই সঙ্গে আছে সমসাময়িক নানা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনও সংঘর্ষের ছবি। তাঁর গল্প-উপন্যাসে পুরাতন ও নতুন কালের দ্বন্দ্ব একটি বিশেষ মাত্রায় উপস্থাপিত হয়েছে। তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' 'কল্লোল' পত্রিকায় ১৩৩৫ (১৯২৮) ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়। তারপরের গল্প 'হারানো সুর'-ও 'কল্লোল'-এ ১৩৩৫ সালের বৈশাখ (১৯২৮) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল' -এ যাত্রা শুরু করলেও পরে তা থেকে বেরিয়ে আসেন তারাশঙ্কর।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭৯) ঃ উকিল শরদিন্দুও বনফুলের সমসাময়িক একজন বিশিষ্ট লেখক। দু'জনেরই জীবৎকাল সমান। গোয়েন্দা বাহিনীর যাদুকর শরদিন্দু মুখ্যত গোয়েন্দা কাহিনী ও ঐতিহাসিক কাহিনীর রূপকার হিসেবেই পরিচিত। তবে কিছু হাস্যরসাত্মক গল্পও তিনি উপহার দিয়েছেন। ছোটগল্পে যে তির্যকতা, ব্যঞ্জনাধর্মীতা, অতৃপ্তিবোধ জন্মে, যে ধরনের গল্প তিনি লেখেননি। তাঁর গল্পের শেষে স্বাভাবিকভাবেই একটা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে। 'রক্তসন্ধ্যা' শরদিন্দুর প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গল্প। গল্পটি ১৩৩০ বঙ্গাব্দে (১৯২৩) প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্প সংকলনগুলির মধ্যে আছে— 'ব্যুমেরাং' (১৯৩৮), 'বিষকন্যা' (১৯৪০), 'দন্তরুচি' (১৯৪৫) 'কাঁচামিঠে' (১৯৪২) 'কালকূট' (১৯৪৪), 'পঞ্চভূত' (১৯৪৫) প্রভৃতি। তাঁর প্রথম গল্প 'রক্তসন্ধ্যা' প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংঘর্ষের রূপচিত্রণ, তবে তা রোমান্সের মোড়কে আবৃত। 'কানু কহে রাই' (১৯৫৫) গল্প সংগ্রহে ইতিহাস নয়, বাঙালির ঘরের ঘরোয়া কাহিনী, যা রোমান্সের ঠাস-বুনোট। 'মায়াকুরঙ্গী' (১৯৫৮) গল্প সংগ্রহ ভৌতিক গল্পের পসরা। অতএব ভিন্ন আবেদনের, ভিন্ন স্বাদের বেশ কিছু গল্প তিনি রচনা করেছেন। তবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মত তাঁর পাত্র-পাত্রীরাও দেশ-কাল নিরপেক্ষ। কিন্তু মেজাজের দিক থেকে শরদিন্দু বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে অমিশ্র ও একাগ্র।

পরিমল গোস্বামী (১৮৯৯-১৯৭৬) ঃ পরিমল গোস্বামী বনফুলের সমসাময়িক এক বিশিষ্ট লেখক ও বনফুলের সুহৃদ বন্ধু। 'শনিবারের চিঠির' সম্পাদনা সূত্রে তাঁর সাহিত্যে মনোনিবেশ। তাঁর গল্প সরস-কৌতুক চিত্র নির্ভর। তাঁর 'শনিবারের চিঠি' আক্রমণ উত্তেজনা তাঁর শান্ত-স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব ও রচনা কর্মে প্রভাব ফেলেনি। পরিমলবাবুর রচনায় সমকালীন প্রসঙ্গ উঠে এসেছে বারবার। **"তাঁর হাসির গল্পে 'শনিবারের চিঠি'- ধর্মী ঝাঁজালো বিদ্রুপ-প্রবণতা অনুপস্থিত। সমকালীন জীবনের ছোট বড়ো অসংগতি ধরে ছোটো এবং বড়ো আকারের বিবৃতি ছড়ানোর গল্প লিখেছেন পরিমল গোস্বামী নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে। হঠাৎই তার ভেতর হতে দোলা দিয়ে কৌতুকের হিল্লোল উপচে ওঠে। বিক্ষুব্ধ বিদ্রুপের উত্তাপের চেলে তাঁর হাসির গল্পে তীক্ষ্ণ কটাক্ষের স্মিত সৌরভ অনুভবনীয় খুশির আমেজ নিয়ে ঘোরে ফেরে।"**[১৫] মানুষের চরিত্রের অসঙ্গতিকে 'একটু বাড়িয়ে' তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন। তবে সে হাসি সংযত, স্মিত ও বুদ্ধিচকিত। তাঁর গল্প-সংকলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'বুদ্বুদ' (১৯৩৬) 'ট্রামের সেই লোকটি' (১৯৪৪) 'ব্ল্যাক মার্কেট' (১৯৪৫) 'ম্যাজিক লণ্ঠন' (১৯৫৫) ইত্যাদি।

সজনীকান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২) ঃ ব্যঙ্গ ও গভীর রসের গল্পকার সজনীকান্ত দাস

'শনিবারের চিঠি'-র একক প্রতিনিধি। 'কলিকাল' (১৯৪০) তাঁর ব্যঙ্গরসের গল্প সংকলণ, আর 'আকাশ বাসর' (১৯৪৪) তাঁর গভীর রসের বিশিষ্ট গল্প সংকলন। সজনীকান্ত দাস প্যারডি জাতীয় রচনার সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। **'সজনীকান্তের পক্ষপুটাশ্রিত দ্বিতীয় বড়ো লেখক ছিলেন বনফুল।'**[১৬]

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) ঃ শৈলজানন্দের বাস্তবতাবোধ নিবিড় ও গভীর; কারণ, দেশের মাটি ও জনজীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ। আদিম নর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নর-নারীর ভালোবাসা ও যৌনাকর্ষণের তীব্র জটিল রহস্যের নানা দিক উন্মোচিত হয়েছে তাঁর গল্পে। শরৎচন্দ্রের বাস্তব গ্রাম্য জীবন চিত্রণে আছে দরদ ও ভাবাবেগের প্রাচুর্য, শৈলজানন্দের আছে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গি— যা কখনো কখনো নির্মম বলে মনে হয়। **"আমাদের দেশের সমাজের ও সংস্কারের যে সব দৃশ্য রমণীয় নয়, হৃদ্য নয়, যার কোন তাৎপর্য নেই, সুতরাং যা সাহিত্যের পটে ওঠেনি তাই তিনি আঁকতে লাগলেন নির্বিকার মধ্যস্থ অথচ সরল চিত্তে। রবীন্দ্রনাথ সর্ববিধ বাঙালি মানুষকে সর্ব প্রথম ঠাঁই দিয়েছিলেন সাহিত্যের সভায়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি সর্বত্রগামী হয়নি। তিনি কয়লাকুঠীর সাঁওতাল নর-নারীর পরিচয় পান নি। বাঙালীর উচ্চ ও নিম্নবিত্ত ভদ্র সংসারের কলকাতায় মেস-বাসী পড়ুয়া ছাত্রের চাকুরে যুবকের ছবি এঁকে গেছেন কিন্তু নোংরা পাড়ায় জীর্ণ ভাঙা বাড়িতে ও বস্তিতে হতচ্ছাড়া ভবঘুরে বাঙালী সন্তানের হদিশ দেন নি। রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের ত্রুটি সংশোধিত হল শৈলজানন্দের রচনায়। শৈলজানন্দের লেখায় কোন ধর্ম বা রাষ্ট্রঘটিত মতামতের দিকে কোনই ঝোঁক নেই। তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ ও sex রক্তরাগ বিহীন এবং সেই হেতু প্রায়ই অরমনীয় এবং অনেক সময় নিষ্ঠুর। বলতে পারি শৈলজানন্দের সাহিত্য সৃষ্টি মানুষের বিচিত্র জীবন চেষ্টাকে নিরপেক্ষ বাস্তবভাবে দেখেছে। স্ন্যাপশট প্রধান রচনা হওয়ায় শৈলজানন্দের রচনা সবই হয় ছোট, নয় বড়ো গল্প।"**[১৭] কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলজানন্দের মধ্যে কয়লাকুঠির বাস্তবতার চাইতে **'মধ্যবিত্তের রোমান্টিক ভাবাবেগ'**-কে খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর কথায়— **"শৈলজানন্দের গ্রাম্য জীবন ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ— কিন্তু শুধু ছবি-ই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আসে নি। বস্তি জীবন এসেছে কিন্তু বস্তি জীবনের বাস্তবতা আসে নি-বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্য বিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসে নি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয় নি, এই একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।"**[১৮] শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠির গল্প' 'নারীমেধ' 'পোড়ারমুখী' 'বধূবরণ' 'নারীর মন' 'নিরাশ্রয়' 'সত্য-মিথ্যা' 'জীবন সঙ্গিনী' প্রভৃতি গল্পে সেই জীবন চিত্র প্রতিভাত।

মনোজ বসু (১৯০১-১৯৮৭) ঃ মনোজ বসু মনোধর্মে ছিলেন রোমান্টিক। 'কল্লোল-এর

লেখক না হলেও কল্লোলের মনোভঙ্গিমার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের (১৯৩০) কার্তিক সংখ্যায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। নাম— 'পিছনের হাতছানি', যা পরবর্তীকালে 'নতুন ফসল' নামে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায়। মন মানসিকতায় মনোজ বসু তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছাকাছি হলেও, প্রকাশ রীতিতে স্বতন্ত্র। প্রকৃতির মধ্যে এক রোমান্টিক নিবিড় আবেগ সঞ্চারিত করে তাকে মানব জীবনের সঙ্গে একীভূত করে গভীর ব্যঞ্জনা দান করেছেন তিনি। 'বাঘ' 'বন মর্মর' 'নর বাঁধ' গল্পে মনোজ বসুর সেই রোমান্টিক স্বপ্নাতুর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও মনোজ বসু রাজনৈতিক ('সীমান্ত' 'ঘরে আগুন') অলৌকিক ('প্রেতিনী' 'ছায়াময়ী') প্রভৃতির শ্রেণীর গল্প রচনা করেছেন। তিনি প্রায় দেড়শ গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হল— 'বন মর্মর' (১৯৩২) 'নরবাঁধ' (১৯৩৩) 'দেবী কিশোরী' (১৯৩৮) 'একদা নিশীথ কালে' (১৯৪২) 'দুঃখ নিশার শেষে' (১৯৪৪) 'পৃথিবী কাদের' (১৯৪৮) 'উলু' (১৯৪৮) 'খদ্যোত' (১৯৫০) 'কুঙ্কুম' (১৯৫২) ইত্যাদি।

মণীশ ঘটক (১৯০২-১৯৭৯) ঃ যুবনাশ্ব ছদ্মনামে বেশি পরিচিত মণীশ ঘটককে বলা হত 'কল্লোলের প্রথম মশালচি' কারণ, বাস্তববাদী সাহিত্যের যে ব্রত কল্লোলীয় সাহিত্যিকদের অনুপ্রানীত করেছিল প্রথম সচেতনভাবে মণীশ ঘটক তার রূপদান করেন 'পটলডাঙার পাঁচালি'-তে। এই গ্রন্থে ন'টি গল্পে (গোষ্পদ, পটলডাঙার পাঁচালি, 'কালনেমি' 'মনু শেষ' 'মৃত্যুঞ্জয়' 'রাত-বিরেতে' 'ভূখা ভগবান' 'দুর্যোগ' 'স্বাহা') সেই বাস্তবতার আমদানি করেছেন লেখক। তবে **'যুবনাশ্বের রচনায় অভিনবতার চমক যত অপ্রত্যাশিত, অথবা যত উল্লাসেরই হোক, জীবনের স্থূল বস্তুভূমি থেকে তাকে সাহিত্যের নিত্যলোকে'**[১৯] উত্তীর্ণ করতে পারেন নি। ডঃ সুকুমার সেন মণীশ ঘটকের গল্প রচনার প্রয়াসকে **'গল্প চিত্র'** বলে অভিহিত করেছেন।[২০] দারিদ্র ও যৌনতার রূপ চিত্রণে তাঁর অদম্য উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত (১৯০৩-১৯৭৬) ঃ কল্লোলীয় জীবন চেতনার আর এক রূপকার অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। যৌবনের উন্মাদনা, বিদ্রোহ, অস্থিরতা, নিয়ম ভাঙার প্রবণতা ও সর্বোপরি রোমান্টিসিজম তাঁর গল্পে রূপ লাভ করেছে। 'কল্লোল'-এর দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩১) ৪র্থ সংখ্যায় তাঁর 'গুমোট' গল্পটি প্রকাশের পর 'কল্লোল গোষ্ঠীর' লেখক হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু। এক গরীব পরিবারের দাম্পত্য কলহের কাহিনী এটি। তাঁর 'বেদে' গল্পটিও কল্লোলীয় বিপ্লবের প্রথম নিদর্শন। যুদ্ধ, দাঙ্গা, মন্বন্তর, প্রাণান্তকর জীবন সংগ্রাম-সব কিছুই অচিন্ত্যকুমারের গল্পে ফুটে উঠেছে। দরিদ্র মানুষের জীবন সংগ্রামের ও অসহায়তার জ্বলন্ত চিত্র 'ওষুধ' 'কালো রক্ত' 'ডাকাত' 'কেরাসিন' 'কেরামত' 'সারেঙ' প্রভৃতি গল্পে ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় মন্বন্তর ও দাঙ্গার ছবি পাওয়া যায় 'কালো রক্ত' 'যতন বিবি' 'চিতা-বাঘ' 'টান' ইত্যাদি গল্পে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্প সংকলনগুলি হল— 'টুটাফুটা' (১৯২৮) 'ইতি' (১৯৩১) 'অধিবাস' (১৯৩২) 'অকাল বসন্ত' (১৯৩২) 'কালোরক্ত' (১৯৪৫) 'চাষাভূষা' (১৯৪৭) 'সারেঙ' (১৯৪৭) 'হাড়ি-মুচি-ডোম' (১৯৪৮)

'একরাত্রি' (১৯৬১) ইত্যাদি। তাঁর গল্পের প্রধান সুর 'যাযাবর চেতনা'— ভবঘুরে জীবনের বোহেমীয় দৃষ্টি।

সরোজ কুমার রায়চৌধুরী (১৯০৩-১৯৭২) ঃ সরোজ কুমার রায়চৌধুরী 'কল্লোল' সমকালীন আর এক বিশিষ্ট লেখক। সমকালীন উত্তাল যুগপ্রবাহ, যৌবনের উচ্ছ্বলতা, মধ্যবিত্তের জীবন সংকট 'দারিদ্র্যের আস্ফালনের' চিত্র তিনি গভীর সংযমের সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। তিনি তারাশঙ্করের মত গ্রাম্য জীবনের ছবি যেমন তাঁর গল্প-উপন্যাসে বিধৃত করেছেন তেমনি অজস্র ঝঞ্ঝা বিক্ষোভে আলোড়িত সমসাময়িক কালের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-বেদনার চিত্রও এঁকেছেন। তাঁর গল্প-সংকলন গুলি হল— 'মনের গহনে' (১৯৩৩) 'দেহ যমুনা' (১৯৩৩) 'ক্ষণবসন্ত' (১৯৩৪) 'শ্মশানঘাট' (১৯৩৪) 'বুহুৎসব' (১৯৩৭) 'রমণীর মন' (১৯৬০) 'সন্ধ্যা রাগ' (১৯৬১) ইত্যাদি।

শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০) ঃ 'কল্লোলের' কালে আবির্ভূত আর এক হাস্যরসিক লেখক শিবরাম চক্রবর্তী। 'কল্লোলে' ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (১৯২৪) তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'আর এক ফাল্গুনে' নামে। তিনি অনেক কবিতাও লিখেছেন, যাতে রবীন্দ্রোত্তরণের কল্লোলীয় প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 'মানুষের প্রারম্ভ' 'বিধাতার চেয়ে বড়' এধরনের কবিতা। তবে ছোটগল্পে তিনি ছোটদের জন্য হাসিখুশির পসরা সাজিয়েছেন। তাঁর একটি গল্প সংকলন হল— 'বড়দের হাসিখুশি'।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮) ঃ কল্লোলের ভাবধারার ধারক ও বাহক শ্রেণির লেখক হলেও প্রেমেন্দ্র মিত্র 'কল্লোলের' শিল্প নন। কেননা, 'কল্লোলের' পূর্বে 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৩০-এর চৈত্র সংখ্যায় তাঁর 'শুধু কেরানী' গল্পটি বের হয়েছিল। 'বিজলী' পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত লিখতেন। পরে 'কল্লোলের' সংস্পর্শে এলেও তিনি কল্লোল ছেড়ে 'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদনা ও লেখার কাজে নিযুক্ত হন। তিনি একাধারে কবি, বিজ্ঞানী ও গল্পকার। তাই তাঁর গল্পে কবির কাব্যময়তা, বিজ্ঞানীর নিরাসক্তি দৃষ্টিভঙ্গি এবং গল্পকারের সহমর্মিতাবোধ যুক্ত হয়েছে। **'তাঁর মধ্যে একাধারে সংগ্রামীও পলাতক বিজ্ঞান মানস এবং আদিমতা-সংসক্তি'**[২১] প্রকাশিত। নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের নিরুপায় ব্যর্থতা ও আদর্শচ্যুতি, অসহায়তা, বিকৃতি ও নির্মমতার রূপকার প্রেমেন্দ্র মিত্র; সেই সঙ্গে মহানগরের ধূসর অমানবিকতা, জটিলতা, বিষাক্ততার পরিচয়ও তাঁর গল্পে আছে। 'শুধু কেরানী' 'পুন্নাম' 'ভবিষ্যতের ভার' 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে' 'হয়তো' 'মহানগর' 'সংসার সীমান্তে' 'স্টোভ' প্রভৃতি গল্পে এসব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তবে নিষ্ঠুরতার নির্মম রূপায়ণের পাশাপাশি রোমান্টিক প্রেমের স্বপ্নাভিসার ও রয়েছে। প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প সংকলনগুলি হল— 'বেনামী বন্দর' (১৯৩০) 'পুতুল ও প্রতিমা' (১৯৩১) 'অফুরন্ত' (১৯৩২) 'পঞ্চাশর' (১৯৩৪) 'মৃত্তিকা' (১৯৩৫) 'মহানগর' (১৯৩৭) 'ধূলিধূসর' (১৯৩৮) 'কুড়িয়ে ছড়িয়ে' (১৯৪০) 'সামনে চড়াই' (১৯৫০) 'সপ্তপদী' (১৯৫৩) 'জলপায়রা' (১৯৫৭) 'প্রেমই ধন্বন্তরী' (১৯৫৮) 'নানা রঙে বোনা' (১৯৬০) ইত্যাদি।

প্রবোধ কুমার সান্যাল (১৯০৭-১৯৮৩) ঃ 'কল্লোল' ভাবধারার আর এক বিশিষ্ট লেখক প্রবোধ কুমার সান্যাল। ১৯২৩-এর মাঘ সংখ্যায় 'মার্জনা' গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রবোধ কুমারের সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ। কল্লোলের প্রতিবাদী মানসিকতায় বর্ধিত হলেও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ধর্মে তিনি বোহেমিয়ানিজমকে প্রসারিত করে দিয়েছেন। তাই তাঁর গল্প উপন্যাসে সে সব চরিত্র পাই তারা আবেগ উদ্দীপনায় দীপ্ত পোড়খাওয়া মানুষ। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যে তিনি রূপ দিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পে কল্লোলের বিদ্রোহী চেতনা, অবক্ষয়, ব্যর্থতাবোধ, দারিদ্র্যবিলাস যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে রোমান্টিক স্বপ্নমেদুরতা, যাযাবর বৃত্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের জটিল জীবনসংগ্রামের চিত্রও তিনি এঁকেছেন। 'গুহায় নিহিত' 'অবৈধ' 'বনমানুষের হাড়' 'প্রেতিনী' 'নিশিপদ্ম' 'অঙ্গার' 'কল্পান্ত' প্রভৃতি গল্পে এসব চিত্র বিধৃত। তাঁর গল্প সংকলনগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'চেনা-অচেনা' (১৯৩১) 'নিশিপদ্ম' (১৯৩৩) 'অবিকল' (১৯৩৩) 'দিবাস্বপ্ন' (১৯৩৬) 'অন্তরাগ' (১৯৩৭) 'কয়েক ঘন্টা মাত্র' (১৯৩৯) ইত্যাদি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬) ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেছেন 'কল্লোলের কুলবর্ধন'। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন 'belated kollolian।' কিন্তু এসব অভিধা থেকে কিছুটা ভিন্ন গোত্রের মানিক। কারন, তিনি কল্লোলীয় আদর্শকে গ্রহণ করেছেন বটে, তবে তা সংযমের সূত্রে ও চিন্তার গভীরতায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন— **"মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সংশয়, হতাশ, ব্যর্থতাবোধ ও অসহায়তাবোধের কাছে পরাজয় মেনে নেন নি। মানিকের গল্প পাঠককে কুলহারা জীবন রহস্যের দিকে ঠেলে দেয় না, সংগ্রামী সংকল্প কঠিন মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি করিয়ে দেয়। বিজ্ঞানবুদ্ধি, সত্য-এষণা, বস্তুজিজ্ঞাসা মানিকের শিল্পীমানসকে গোড়া থেকেই ভাবালুতার হাত থেকে রক্ষা করেছে।"**[২২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম গল্প 'অতসী মামী' বের হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৯২৮)। দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম, সংকীর্ণতা ও কৃত্রিমতাজনিত স্বপ্নভঙ্গ, হতাশা, বিকার, নিঃসঙ্গতাবোধ মানিক বৈজ্ঞানিক মনন ও বুদ্ধি দিয়ে সমকালীন জীবনের বাস্তব সত্যকে উপস্থাপিত করেছেন। **"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ঔপনিবেশিক সমাজের অন্তেবাসী মানুষেরা যখন বিপন্নতর হচ্ছিল, সময়-মন্থনজাত জীবন-জিজ্ঞাসার নতুন নতুন ধরন"** দেখা গেল বাংলা ছোটগল্পের জগতে। **"চল্লিশের দশকেই সাম্রাজ্যবাদী অপশাসনের অন্ধকার আরো হিংস্র হয়ে ওঠে। এই নিশিছদ্র অন্ধকারের মধ্যে মানুষের চূর্ণ-বিচূর্ণ পরিসর ও অবয়ব ছাড়া আর কিছুই দৃশ্যমান ছিল না। দুঃসহ এই সময়ের গল্প লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।"**[২৩]তবে কল্লোলীয় যৌবনরাগ যৌনচেতনা ও রোমান্টিক মানসিকতাও তাঁর গল্পে স্বতঃ প্রকাশিত। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হল— 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩৫) 'প্রাগৈতিহাসিক' (১৯৩৭) 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (১৯৩৮) 'সরীসৃপ' (১৯৩৯) 'বৌ' (১৯৪৩, মতান্তরে ১৯৪০) 'সমুদ্রের স্বাদ' (১৯৪৩) 'ভেজাল' (১৯৪৪) 'হলুদ

পোড়া' (১৯৪৫) 'আজ-কাল-পরশুর গল্প' (১৯৪৬) 'পরিস্থিতি' (১৯৪৬) 'খতিয়ান' (১৯৪৭) 'মাটির মাশুল' (১৯৪৮) 'ছোটবড়' (১৯৪৮) 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' (১৯৪৯) 'ফেরিওলা' (১৯৫৩) 'লাজুকলতা' (১৯৫৪)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম দিককার গল্পে ন্যাচারালিস্ট লেখকের মানসিকতা ধরা পড়েছে- একেবারে জৈবস্তরের মানুষ (প্রাগৈতিহাসিক), আপাতসভ্য মানুষের মধ্যেও আদিম যৌন ও অর্থ লিপসা (সরীসৃপ) ইত্যাদি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে মার্কসবাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা বিশ্বাসে পরিণত হলে যে গল্পগুলি তিনি লিখেছেন তাতে প্রাধান্য পেয়েছে ধনিক শ্রেণির শোষণ (দুঃশাসনীয়), দুঃস্থ শিল্পীর নির্যাতন (শিল্পী), রাজনৈতিক আন্দোলন ও দিনবদলের ইঙ্গিত (হারানের নাত জামাই) প্রভৃতি। অর্থাৎ এই স্তরের সাহিত্যে একটা দায়বদ্ধতার পরিচয় পরিস্ফূট।

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) ঃ অচিন্ত্যকুমার ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাল্য বন্ধু বুদ্ধদেব বসু যে কল্লোলের নেশায় মদির হয়ে গল্প লিখবেন এটাই স্বাভাবিক। বুদ্ধদেব মূলত কবি, তাই তাঁর গল্পে কবিত্বময় ভাবনা অতিমাত্রায় উপস্থিত। কল্লোলীয় রোমান্টিক মদমত্ততায় তিনি যে বেশ ডুবে ছিলেন, তা তাঁর গল্প পাঠেই বোঝা যায়। তার সঙ্গে যৌবনের উন্মাদনা, যৌনতার প্রতি স্পৃহা, আর নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের তিক্ততা অপেক্ষা প্রেম প্রীতি, আশা-ভালোবাসা, আবেগ-স্মৃতি মেদুরতা। তবে প্রেমের গল্প ছাড়াও বুদ্ধদেব ক্ষোভ, ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, প্রতারণা প্রভৃতি বিষয়ে গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্প সংকলনগুলি হল— 'অভিনয়, অভিনয় নয়' (১৯৩০) 'রেখাচিত্র' (১৯৩১) 'এরা আর ওরা' (১৯৩২) 'অদৃশ্য শত্রু' (১৯৩৩) 'মিসেস গুপ্ত' (১৯৩৪) 'প্রেমের বিচিত্র গতি' (১৯৩৪) 'অসামান্য মেয়ে' (১৯৩৫) 'ঘরেতে ভ্রমর এলো' (১৯৪১) 'ফেরিওয়ালা' (১৯৪১) 'খাতার শেষ পাতা' (১৯৪৩) 'হাওয়াবদল' (১৯৪৪) 'একটি কি দুইটি পাখী' (১৯৫৫) ইত্যাদি।

সুবোধ ঘোষ (১৯০৯-১৯৮০) ঃ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর সুবোধ ঘোষ বাংলা ছোটগল্পের ভূগোলকে বিস্তৃত করেছেন। কলকাতা থেকে হাজারীবাগ, রাঁচি, গিরিডি, পশ্চিম ভারত পর্যন্ত তাঁর গল্পের ভূমি বিস্তৃত। তিনি বাস্তবতার নতুন রূপ চিত্রণ করেছেন তাঁর গল্পে। সামাজিক-অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের নতুন ব্যাখ্যা,মানুষের মনোগহনের জটিলতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, মধ্যবিত্ত মনের দোলাচলতা, দ্বিধা, স্বার্থপরতা নানাভাবে উদঘাটিত হয়েছে তাঁর রচনায়। মোহহীন বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবনকে তিনি দেখেছেন, মানুষের শুভ বুদ্ধি উদয় হবে এ বিশ্বাস তাঁর অটল ছিল। তাঁর প্রথম গল্প 'অযান্ত্রিক' বের হয় ১৯৪০ -এ আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক দোল সংখ্যায়। এ গল্প থেকেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ধরা পড়ে। এছাড়া, 'জগদ্দল', 'সুন্দরম', 'গোত্রান্তর' 'নির্বন্ধ' 'কাঞ্চন সংসর্গাৎ' 'তিন অধ্যায়' 'স্নানযাত্রা' 'বারবধূ' 'জতুগৃহ' 'গরল অমিয় ভেল, প্রভৃতি গল্পে তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত।

আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫) ঃ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' গোষ্ঠীর এক স্বনামধন্যা লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী। বাংলা ছোট গল্পের আসরে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় অবতীর্ণ হন। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় তার প্রথম গল্প ছাপা হয়। নাম— 'পত্নী ও প্রেয়সী'। মধ্যবিত্ত পরিবারের নানা পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মানুষের মনো-দ্বন্দ্ব তাঁর গল্পে রূপায়িত। তবে

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু মেয়েদের জীবনের স্বাধিকারের কথা, নানা ব্যর্থতা বেদনার কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তবে নারীবাদী লেখিকা হলেও নারী সমাজের প্রতি তাঁর পক্ষপাত দেখা যায়নি। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থান, তাদের জীবন সংগ্রামের কথা তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ছোটদের জন্য 'ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা' (১৯৩৮) বড়দের জন্য প্রথম গল্প-সংকলন 'জল আর আগুন' (১৯৪০)। তাঁর ছোটগল্প সংকলন সংখ্যা—তিরিশটি।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী (১৯১২-১৯৮৬) ঃ 'বঙ্গবাণী'-'নবশক্তি'-'পূর্বাশা'-'প্রগতি'-'দেশ'-'চতুরঙ্গ'-'ভারতবর্ষ' গোষ্ঠীর লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী যুগের লেখক। তার প্রথম মুদ্রিত রচনা ঢাকার 'বঙ্গবাণী' সাপ্তাহিক পত্রিকায় বের হয়। গল্পটি মোপাসাঁর অনুদিত গল্প, নাম— 'জার্নালিস্ট'। তিনি মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার। এই সময়ের মধ্যে কালোবাজার, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে সমাজে যে অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল চিরন্তন মূল্যবোধ সমূহের এবং যেখানে কোনমতে টিকে থাকাটাই হয়ে উঠেছিল কাম্য। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে এই বিপর্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু সমাজের মানুষগুলির চিত্র আছে। মনস্তত্ব, মনোবিকলন, প্রকৃতি প্রীতি, সৌন্দর্য পিপাসা, যৌনবিকৃতি প্রভৃতি স্থান পেয়েছে তাঁর গল্পে। 'নদী ও নারী' 'অনাবৃষ্টি' 'রাইচরণের বাবড়ি' 'মঙ্গলগ্রহ' 'পালিশ' 'কমরেড' 'রাধিকা' 'বনানীর প্রেম' 'শালিখ কি চড়ই' 'গিরগিটি' 'সমুদ্র' 'হিংসা' 'গাছ' 'শ্বাপদ' 'পঙ্গু' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গল্প।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র (১৯১৬-১৯৭০) ঃ ১৯৩৬-এ 'দেশ' পত্রিকায় 'মৃত্যু ও জীবন' নামে নরেন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত গল্প বের হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালের লেখক ইনি। ফলে যুদ্ধ, মন্বন্তর, কালোবাজার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা—এসব কিভাবে জীবনকে ভেঙে দিচ্ছে তা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। মূলত মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনচিত্র তাঁর গল্পে বিধৃত। তাঁর নিজের কথায়— **"ঘৃণা, বিদ্বেষ, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করে নি। বরং বিপরীত দিকের প্রীতিপ্রেম, সৌহার্দ্য, স্নেহ, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, পারিবারিক গন্ডীর ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে।"** ১৯৪৫ -এ মুদ্রিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অসমতল'। এরপর একে একে বের হয় 'হলদেবাড়ি' (১৯৪৫), 'উল্টোরথ' (১৯৪৬), 'পতাকা' (১৯৪৭), 'চড়াই-উৎরাই' (১৯৪৯), থেকে 'পালঙ্ক' (১৯৭৫) পর্যন্ত বিভিন্ন গল্প সংকলন। 'সেতার', 'অনধিকারিণী', 'ছদ্মনাম', 'স্বাধিকার', 'কুমারী শুক্লা', 'নাম', 'শাল', 'পালঙ্ক', 'রস', 'চড়াই-উৎরাই' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গল্প।

নবেন্দু ঘোষ (১৯১৬-) ঃ 'শনিবারের চিঠি' (একটি বর্ষার সন্ধ্যা) 'পরিচয়' 'প্রভাতী' কেন্দ্রিক চল্লিশের দশকের ছোটগল্পকার নবেন্দু ঘোষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের আন্দোলন,

পঞ্চাশের মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা, দেশ ভাগ—— সবই ছিল তাঁর গল্পের বিষয়। 'প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘ' এবং 'গণনাট্য সংঘ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। জীবন-মৃত্যুর বৃহত্তর পটভূমিতে জীবনমুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে নানা আকারে। 'এই সীমান্তে' 'মানুষ' 'পোষ্টমর্টেম' 'ইস্পাত' 'কান্না' ১৯৪৬-১৯৪৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত গল্প সংকলন। এছাড়াও আছে 'পঞ্চম রাগ' 'সিঁড়ি' 'রাতের গাড়ি' প্রভৃতি গল্প গ্রন্থ। 'ঈশানপুরের শ্মশান', 'সুখের ঠিকানা', 'প্রমীলার প্রেমিক', 'কল্কি', 'ত্রানকর্তা' ,'কান্না', 'উলুখর', 'জীবিকা', 'কাকভূশণ্ডি কথা' তাঁর বিখ্যাত গল্প।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় যুগচেতনার সঙ্গে ব্যক্তিচেতনা অঙ্কিত। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'নিশীথের মায়া'। তিনি যখন লিখতে শুরু করেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধকালীন বিপর্যস্ত মানবজীবন, কালোবাজারী, মন্বন্তর, দাঙ্গা, সাধারণ মানুষের দুর্দশা ইত্যাদি তাঁর গল্পে চিত্রিত। 'নক্রচরিত', 'পুষ্করা', 'ভাঙাচশমা', 'টোপ', 'বন-জ্যোৎস্না', 'হাড়', 'দুঃশাসন' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গল্প। তাঁর ২১ টি গল্প সংকলন আছে —— 'বীতংস' (১৯৪৫) 'দুঃশাসন' (১৯৪৫) 'ভাঙ্গা বন্দর' (১৯৪৫) থেকে 'আলেয়ার রাত' (১৯৮১) পর্যন্ত।

এরপর সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২), সন্তোষ কুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫), ননী ভৌমিক (১৯২১-১৯৯৭), বিমল কর (১৯২১-২০০৩), রমাপদ চৌধুরী, সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) প্রমুখের 'দেশ' 'পরিচয়' প্রভৃতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা। এঁরা সকলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালের সর্বনাশা ভাঙনের চিত্র, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতা পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা, গভীর জীবন-জিজ্ঞাসা গল্পে রূপায়িত করেছেন আপন আপন বিশিষ্ট ভঙ্গি অনুসারে।

17 DEC 2012

আমার আলোচনার সমকালের (অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা বাংলা ছোটগল্পের আসরে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মানসপ্রবণতা উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে বলে মনে করি। তবে আলোচনার সীমা রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করার কারণ হলো বনফুলের সাহিত্য রচনার সমকালে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। আমি আমার আলোচনার প্রেক্ষাপট ততদূর বিস্তৃত করেছি, বনফুল যতদিন পর্যন্ত লিখেছেন। এই দীর্ঘকাল পরিক্রমায় বিশিষ্ট লেখকদের বিশেষ মানসপ্রবণতা ও যুগ সংকটের অর্ন্তগূঢ় আলোচনা করে তাঁর বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য নিরূপণ করাই আমার অভীপ্সিত।

"সমাজের খণ্ডিত ও বিভিন্ন অংশের জীবন সত্যই হোক, আর সমাজের বৃহত্তর জীবনসত্যই হোক, সে সত্য কতটুকু রূপায়িত হবে তা নির্ভর করবে জীবনের খণ্ডগুলি বেছে নেওয়ার উপর। .....জীবনের খণ্ডাংশগুলি স্বভাবতই বাছাই হবে লেখকের চেতনা ও অভিজ্ঞতা অর্থাৎ জীবন-দর্শন অনুসারে।"[২৪] ছোটগল্প যেহেতু জীবনের খণ্ডাংশে পূর্ণ জীবনের দ্যোতনা সৃষ্টি করে সেহেতু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত মন্তব্য সর্বৈবভাবে সত্য। কেননা, এই

241096

'চেতনা' ও 'অভিজ্ঞতার' রূপায়ণে এক লেখক অন্য লেখক থেকে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে ভাববাদও বস্তুবাদের দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আকাশবিহারী কল্পনা, রোমান্টিক স্বপ্নাভিসার সেদিনকার গল্পলেখকদের কাছে তেমন আপত্তিকর কিছু ছিল না, বরং বহুল পরিমাণে গ্রহণীয়ই ছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে মানুষের জীবনযাত্রার মান পাল্টে যাওয়ায় সামাজিক পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ায় তাঁদের আর তখন ভাববাদ নয় বস্তুবাদ প্রধান হয়ে উঠল। অবশ্য এর পেছনে এমিল জোলার ন্যাচারালিজমের প্রচার ও প্রসার একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এছাড়া, ফ্রয়েডের মনস্তত্ব বিষয়ক গ্রন্থ 'The Interpretation of Dreams'(১৯১৩),'The psychology of everyday life'(১৯১৪), 'On Dreams'-এর ইংরেজি অনুবাদ, ইয়ুং ও অ্যাডলার হ্যাভলক এলিসের রচনার অনুবাদ, উলফ্, প্রুস্ত, ন্যুটহ্যামসুন, লরেন্স গোর্কি, হকিন্স—প্রমুখের রচনা বিশেষ প্রেরণা যুগিয়েছিল। আসলে বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ। তাই সাহিত্য বিজ্ঞান নির্ভর হয়ে পড়তে থাকল। এর ফলে জীবনকে আর আবেগের সাহায্যে বিচার বিশ্লেষণ নয়, যুক্তিবাদের মধ্য দিয়ে গৃহীত হতে লাগল। স্বভাবতই তথাকথিত রাবীন্দ্রিক রোমান্টিক ভাবালুতা থেকে বিংশ শতাব্দীর তরুণ লেখকেরা সরে আসতে চাইলেন যতটা সম্ভব। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে 'কল্লোল'- 'কালিকলম'- 'প্রগতি' গোষ্ঠীর আবির্ভাব। আসলে ১৯০৫-১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সামাজিক রাষ্ট্রীয় অস্থিরতাই 'কল্লোল'-কালিকলম-প্রগতি'-র মত পত্রিকাকে জন্ম দিতে উদ্বোধিত করেছিল, যতটা না রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। কারণ, ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ পরিবর্তনের চাইতে সার্বিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীক অস্থির পরিস্থিতির প্রভাব তাঁদের মনকে বিচলিত করেছিল বেশি। কারণ এমন কোন জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি সেদিন বাঙালিকে দাঁড়াতে হয় নি, যতটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে হয়েছে। কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে 'কল্লোলের' চেতনা ও মতাদর্শ জন্ম নিয়েছিল। তাই সেদিন তরুণ লেখক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে 'বিদ্রোহ' করে বেড়িয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তাঁদের বিদ্রোহটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। এবিষয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন— **"যাকে 'কল্লোল' যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"**[২৫] কিন্তু এসব তরুণ লেখক বাইরে বিরোধিতা করলেও ভেতরে ভেতরে ঠিকই বুঝেছিলেন, প্রতিভার বিশাল মহীরূহ রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে যাওয়া অত সহজ ব্যাপার নয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাই লিখেছিলেন—

"সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর,
আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ম আলো
যুগ-সূর্য ম্লান তার কাছে। মোর পথ আরো দূর।"[২৬]

—'উদ্ধত কণ্ঠে' উচ্চারিত এই 'বিদ্রোহ বাণী' অচিন্ত্যকুমার সেদিন ঘোষণা করেছিলেন। বলাবাহুল্য তিরিশের দশকের গল্পকারেরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যদর্শকে পরিত্যাগ করতে প্রতিশ্রুত

হয়েছিলেন বা বলতে পারি বাধ্য হয়েছিলেন। যদিও এখানে একটি কথা বলার যে, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের গল্পে তৎকালীন যুগজীবনের ছায়া কিন্তু খানিকটা হলেও উপস্থিত। 'হালদার গোষ্ঠী' 'নষ্ট নীড়' 'নামঞ্জুর' 'স্ত্রীর পত্র' 'তিন সঙ্গী-র' 'রবিবার'-'শেষকথা'-'ল্যাবরেটরি' ও অন্যান্য গল্পে তা রূপায়িত। কিন্তু 'কল্লোল' যুগ যে 'বাস্তবতা' চাইছিল তা রবীন্দ্রসাহিত্য পূরণ করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর মনোভাব— **"রবীন্দ্রনাথের পাত্রপাত্রীরা প্রায় সকলেই দ্বিরায়তনিক; যথাযোগ্য শরীরের অভাবে ঈষৎ পাণ্ডুর। .....এইসব মানুষ তাদের স্রষ্টার দ্বারা আরোপিত অসামান্যতার ভার বইতে গিয়ে ঠিক যেন মানুষ হয়ে উঠতে পারে না।"**[২৭] একথা যেন শুধু বুদ্ধদেবের নয়, 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সকল তরুণ লেখক গোষ্ঠীর। কারণ সেদিনের তরুণ লেখকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে 'বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা', 'সংরাগের তীব্রতা', 'জীবনের জ্বালা যন্ত্রণার চিহ্ন' খুঁজে পায়নি। তাঁদের চোখে **'জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসও Classical আবার রবীন্দ্রনাথও Classical'**। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কল্লোল গোষ্ঠীর এই উদ্ধত যৌবনধর্মী লেখা আর দারিদ্র্যের আস্ফালনের প্রকাশ তেমন মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেন নি।

যেটা বলছিলাম, বস্তুবাদ আর ভাববাদের দ্বন্দ্বে বিংশ শতাব্দী বস্তুবাদকেই তার সাহিত্যের প্রকাশমাধ্যম হিসেবেগ্রহণ করল। বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ, বিশ্বায়ণের যুগ। তাই এযুগে স্বভাবতই বস্তুবাদ প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। অবশ্য এর পেছনে পাশ্চাত্য সাহিত্য ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তরুর লেখকগণ যে 'বাস্তবতা'- র অন্বেষণ করছিলেন, তা তাঁরা খুঁজে পেলেন পাশ্চাত্য লেখকদের রচনায়। তাঁরা সেই সব সাহিত্য 'গলাধঃকরণ' করে তৃপ্ত হলেন। ফ্রয়েডের ও এলিসের মনস্তত্ব, যৌনচেতনা, যৌনতত্ত্ব, মনোবিকলনতত্ত্ব, লরেন্সের আদিম দেহচেতনা ন্যুট হ্যামসুনের (১৮৫৯-১৯৫২) দারিদ্র্যের চিত্র সেদিন তাঁদের উন্মত্ত করে দিয়েছিল। 'Age of Interrogation'-এর যুগে এইসব তরুণ লেখক বিদেশী সাহিত্যই যেন তাঁদের সবচেয়ে বেশী প্রেরণা দিয়েছিল। কারণ, তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, সামাজিক পরিস্থিতি আমাদের বাংলার চাইতে কোন অংশে কম ছিল না, বরং বেশীই ছিল। ১৩৩৩ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ঘাটশিলা থেকে একটি পত্রে তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন **'..... জীবনকে দেখবার পাঠ নিতে যদি হ্যামসুন গোর্কির পাঠশালায় গিয়ে থাকি তাতে দোষ কি.....'** 'বাস্তবতা'র উপকরণ আহরণে তাই কল্লোলীয় লেখকগণ বিদেশী সাহিত্য পাঠ করেছিলেন। অবশ্য সে সময় বিদেশী সাহিত্য পাঠ একটি 'ফ্যাশান'-এরও অঙ্গ ছিল। এই বিদেশী সাহিত্য পাঠের ফলে ইউরোপীয় সাহিত্যের উদগ্র বস্তুবাদ বাংলার অঙ্গনে উগ্রমূর্তি নিয়ে প্রবেশ করতে লাগল। এবং সেই প্রবণতা 'কল্লোল' 'কালি-কলম'- 'প্রগতি'- 'উত্তরা' পর্যন্ত প্রবাহিত। বস্তুতঃ পক্ষে 'কল্লোল' বলতে শুধু 'কল্লোল' পত্রিকা নয়, তার সঙ্গে 'কালি কলম'-'প্রগতি'-'উত্তরা'-'ধূপছায়া'-'পূর্ব্বাশা' পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীকেও বোঝায়। এমনকি 'সবুজপত্র' (১৯১৪) যুগের 'নারায়ণ' (অগ্রহায়ণ, ১৩২১) পত্রিকাও এর মধ্যে পড়ে মনোভাবের দিক থেকে। কারণ 'নারায়ণ' পত্রিকা থেকেই রবীন্দ্র বিরোধিতা এক অন্যমাত্রা পায়। তবে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে

কল্লোলীয় সাহিত্য ছিল 'রিয়ালিটির কারি পাউডার।' তিনি কল্লোলীয় লেখকদের অসংযত উন্মাদনাকে সমর্থন করতে পারেন নি। যৌবনের ধর্ম আবেগ প্রবণতা, রোমান্টিক প্রবণতা। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় এর পরিচয় পাওয়া যায়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবিসয়ে বলেছেন—

" 'কল্লোলের' সে যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো।"[২৮]

যেটা বলছিলাম, বস্তুবাদী বিজ্ঞান চেতনা বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের একটি বিশেষ আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। তবে কল্লোলীয় তরুণ লেখকবৃন্দ পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'বাস্তবতা' বাংলা সাহিত্যে আমদানী করতে গিয়ে জীবনের পঙ্কিল, ঘৃণ্য কদর্য দিকটাকেই 'বাস্তব সত্য' বলে মনে করেছেন। সে কারণে তাঁদের সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রে একপেশে হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'কল্লোল' যে 'বাস্তবতার' কথা বলেছে সে বাস্তবতা যে পূর্বে একেবারেই সাহিত্যে ছিল না তা নয়, কল্লোল যুগে সে বাস্তবতা আরো তীক্ষ্ণ-তীব্রভাবে প্রকাশ পেল। এইভাবে 'বাস্তবতা'র দোহাই দিয়ে 'কল্লোল গোষ্ঠী'র লেখকরা যৌন চেতনাকে সাহিত্যে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছিলেন দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ের মানুষের ভাঙাচোরা জীবনের রূপ চিত্রণে।

কিন্তু তথাকথিত আধুনিকতার ধাক্কা 'কল্লোল' -এর যুগের বনফুলের লেখায় লাগে নি। তিনি কল্লোলীয় যুগের সাহিত্যের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সাহিত্য রচনার প্রকৃত পথ বলে মনে করতেন না, তিনি ছিলেন সমস্ত গোষ্ঠী ও মতবাদের উর্দ্ধে। তবে তাঁর কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, কি মনস্তাত্বিক, কি আধ্যাত্মিক, কি অলৌকিক-সমস্ত বিষয়ে সমান কৌতূহল ছিল। তাঁর প্রথম ছোট গল্প 'চোখ গেল' কল্লোল(১৯২৩) পূর্ব 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২৯ বঙ্গাব্দের (১৯২২) আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী' ছাড়াও বনফুল 'শনিবারের চিঠি' 'ভারতী' 'ভারতবর্ষ' 'মাসিক বসুমতী' 'বিচিত্রা' 'যুগান্তর' 'কথাসাহিত্য' 'অলকা' 'বঙ্গলক্ষ্মী' 'বিজলী' প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তিনি মনে করতেন, সাহিত্যিকদের নীলকণ্ঠ হতে হয়, তাঁদের গরল গলাধঃকরণ করে অমৃতই পরিবেশন করতে হয়। বাংলা সাহিত্যকে তিনি সেই অমৃতই দিয়েছেন, যা আস্বাদনে, বৈচিত্র্যে, প্রকাশভঙ্গিতে, শিল্পপ্রকরণে অভিনব। বাংলা সাহিত্যে তিনিই একটি জগৎ সৃষ্টি করলেন, কিম্বা বলতে পারি তাঁর রচিত সাহিত্যে আপনা-আপনি একটি জগৎ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। যা তাঁকে এক ব্যতিক্রমী শিল্পী হিসেবে পরিচিতি দান করেছিল।

বনফুল জীবনকে কখনো রোমান্টিসিজমের মোহে ভাববিলাসের দৃষ্টিতে দেখেন নি। জীবন তাঁর কাছে স্বপ্নিল কল্পনামাত্র ছিল না। জীবন তাঁর কাছে এক শাশ্বত সত্যে উদ্ভাসিত হয়েছিল। সে কারণে আপাত তুচ্ছ সাধারণ নগণ্য মানুষের জীবনকথা তাঁর গল্পসাহিত্যে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে। আপাত তুচ্ছ এই মধ্যবিত্ত নর-নারীর ধূলিমলিন জীবন তাঁর সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিভাত, যা তৎকালীন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার উত্তপ্ত উচ্ছ্বসিত পরিবেশে এক নতুন স্বাদ পাঠককে দিয়েছিল।

বনফুলের গল্পে তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উত্তাল বিক্ষুব্ধ সময় স্রোতের প্রত্যক্ষ চিত্র

যতটা না ফুটে উঠেছে, তার চেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে সেই সময়ের তরঙ্গাঘাতে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের অন্তর্লীন জীবন-জিজ্ঞাসা। তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা বনফুলের যে একেবারে 'নতুন কিছু' আমদানি তা নয়, ইতিমধ্যে তা অনেকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। তবে সে জীবনকে একজন বিজ্ঞান নিষ্ঠ সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করার প্রবণতা 'একেবারে নতুন'। বনফুল তাঁর গল্পের চরিত্র-চিত্রের উপর যে নির্মোহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ করেছেন, তাতে তিনি যথার্থই 'আধুনিক' ও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। কারণ কথা সাহিত্যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ একেবারে আধুনিককালের ঘটনা। **"বাংলা কথা সাহিত্যে এই বিজ্ঞানচেতনা দেখা দিয়েছে বিশ শতকে। বিশেষভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে- ফ্রয়েড হ্যাভলক এলিস প্রমুখ পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীদের প্রভাবে— নর-নারীর মনোজীবনের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মধ্যে। সেই বিজ্ঞান চেতনা এক সুপরিস্ফুট অভিনব রূপলাভ করেছে বনফুলের রচনায়।"**[২৯]

বনফুল তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিকে নির্মোহ সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন বলেই অপক্ষপাত চরম জীবনসত্য তাতে রূপায়িত হয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি মানবিক অনুভূতিরও প্রকাশ সেখানে একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে, যে কারনে তাঁর গল্পগুলি এত অনুভূতির গাঢ়তায় ঋদ্ধ। তাঁর প্রগার অনুভূতিশীল মন ও বিজ্ঞাননিষ্ঠ মনোভঙ্গির প্রতিনিয়ত একটা বৈপরীত্যজনিত দ্বন্দ্ব দেখা যায়, যা তাঁর গল্পগুলিকে এক বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। তবে এদু'য়ের দ্বন্দ্বে মানবসত্যই জয়লাভ করেছে তাঁর গল্পে। বনফুল তাঁর গল্পের চরিত্রগুলিকে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে ফেলে তাঁদের গূঢ় মানস প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছেন। চরিত্রগুলির মানস প্রতিক্রিয়া আমাদের কখনো হাসিয়েছে, কখনো ভাবিয়েছে, কখনো হতবাক করেছে অবাক বিস্ময়ে। তবে তাঁর গল্পের মধ্যে যে হাস্যরস ফুটে উঠেছে মানবচরিত্র ও মানব জীবন সম্পর্কে তা কখনো শ্লেষবোধক, কখনো তির্যক, কখনো বা ব্যঞ্জনাধর্মী। **"কিন্তু বনফুলের ব্যঙ্গ তীক্ষ্ম ধারালো হলেও বনফুল হৃদয়হীন নন। মানুষকে নিয়ে পরিহাস করেছেন, তার ত্রুটি দুর্বলতা কিংবা হীনতা, নীচতা ও কৃত্রিমতা নিয়ে কঠিন ব্যঙ্গও করেছেন। কিন্তু সেই ব্যঙ্গের অন্তরালে মানুষের অসহায়তার প্রতি তাঁর সহৃদয় কারুণ্যমিশ্রিত মমত্ববোধ আশ্চর্য রসব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।"**[৩০]

জীবন রসিক বনফুলের গল্পে আমরা প্রাণোজ্জ্বল জীবন কথাকেই খুঁজে পাই। তাঁর গল্পে দুই বিশ্বযুদ্ধোত্তর মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের চিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে এক চলমান জীবনের অনুভূতি— যে জীবন অখণ্ড জীবন স্রোতের সঙ্গে যুক্ত। বনফুলের গল্পে তাই হাজারো বিপর্যয়ের মধ্যে জীবনে চলার কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। জীবনে চলার ও জীবনকথা বলিষ্ঠরূপে প্রকাশ করার প্রবণতায় বনফুল বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন।

সমকালীন সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সাহিত্যে পড়বেই। সমকালকে সাহিত্যে

রূপ না দিলে সাহিত্য যেমন বাঁচে না, আবার সমকালকে আঁকড়ে ধরলেও সাহিত্য বাঁচে না, তার জন্য সাহিত্যে সার্বজনীন সত্যের সম্পূর্ণ প্রকাশ একান্ত প্রয়োজন। বনফুল সমকালকে ধরে, সমকালকে অতিক্রম করে এক চিরন্তন বিশ্বজনীন সত্যকে রূপ দিয়েছে তাঁর গল্পে। এখানেই তিনি জীবনের যথার্থ রূপকার। তাই তাঁর গল্প এত সত্য-সুন্দর সরল অথচ বলিষ্ঠ জীবন প্রত্যয়ে বিশ্বাসী বলে মনে হয়। জীবনের প্রতি এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রূপায়ণে বনফুলকে সমকালীন সাহিত্যিকদের চেয়ে বিশিষ্ট করে তুলেছে। বনফুলের প্রথম গল্প 'চোখ গেল' থেকে শুরু করে 'বনফুলের শেষ লেখা'-র গল্পগুলি পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে উক্ত কথাগুলির সত্যতা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। যা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমার আলোচনার অভিষ্ঠ।

খণ্ড জীবন নয়, সমগ্র জীবন অন্বেষাই বনফুলের শিল্পীমনের অন্তর্গূঢ় এষণা। তাই জীবন অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে তিনি যা কিছু দেখেছেন, যা কিছু তাঁর 'পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শ' বলে মনে হয়েছে তাকে তিনি সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। তিনি সমগ্র জীবন জুড়ে যে বিচিত্র মানুষ দেখেছেন, মানুষের যে বিচিত্র প্রবণতা দেখেছেন তাকে অপক্ষপাতহীন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে অনুভূতির রসে জাড়িত করে সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। মানব জীবনের বৈচিত্র্যই বনফুলকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। তিনি 'শনিবারের চিঠি' (১৩৫৬, ভাদ্র) -তে এক জায়গায় বলেছেন— **"জীবনের নানা বিচিত্র আবেষ্টনীতে পড়ে নানা রকম মানুষ দেখেছি আমি। .....মানব জীবনের বৈচিত্র্যই সবচেয়ে বেশী ইন্‌সপায়ার করে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের আদর্শই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সাহিত্যে তারই বিচিত্র বিভিন্ন বলিষ্ঠ রূপ আঁকতে চেষ্টা করেছি আমি। উচ্চ-নীচ ধনী-দরিদ্র বিদ্বান-মূর্খ, পাপী-পুণ্যবান, সক্ষম-অক্ষম, সবাই আমার কাছে শিল্পসৃষ্টির উপকরণ মাত্র।"**

বনফুলের অভিজ্ঞতার এই বিশাল ব্যাপ্তি তাঁর গল্পে **'মহাকাব্যিক'** বিস্তার দিয়েছে।[৩১] জীবনকে দেখা এবং তাকে রূপ দেওয়ার মধ্যে এক অদ্ভুত সংযম লক্ষ্য করা যায় বনফুলের গল্পে। বনফুল তাঁর সুদীর্ঘ চিকিৎসক জীবনে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মানুষের জীবনের কাছে এসে তার উত্তাপ গ্রহণ করেছেন এবং তারপর 'গোলকুঠি' বাড়ির চার দেয়ালে মধ্যে বসে রাতের পর রাত দার্শনিকের মত মানুষের বিচিত্র জীবন নিয়ে ভেবেছেন বৈজ্ঞানিকদের বস্তুনিষ্ঠা দিয়ে বক্তব্যকে বিন্যস্ত করেছেন এবং সবার শেষে মানবিকবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্যিকের রসবোধ দিয়ে তা প্রকাশ করেছেন। নিজস্ব **'ঢঙে'** বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মানব জীবনের যে বিচিত্র চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তা আমাদের বিস্মিত করে। কি আঙ্গিকে, কি ভাষাশৈলী নির্মাণে, কি রূপরীতিতে, কি জীবন দর্শন ব্যাখ্যায় তিনি সিদ্ধকাম পুরুষ। তাঁর গল্পগুলি জলের মতো একা একা আমাদের মনে, চিন্তায়, চেতনায় ঘুরে ঘুরে কথা বলে এবং শেষে এক বচনাতীতের অনুভতি নিয়ে আসে।

'কল্লোল' যুগের উদ্দামতা, উচ্ছৃলতা, লাগামছাড়া যৌনধর্মী উন্মাদনাপূর্ণ লেখা তিরিশের

দশকে থিতু হয়ে আসতে থাকে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ও তার পরবর্তীকালে অর্থাৎ চল্লিশের দশকের গল্পে তা খুব একটা দেখা যায় না। এসময় **'বাস্তুহারা আর বঞ্চিতের কান্না, গৃহহারা আর ধর্ষিতার কান্না'**[৩২] মানুষের জীবনসংগ্রাম, কালোবাজারি, মন্বন্তর, রেশনিং সমস্যা, ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা— সবকিছু মিলে বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, এমন কি শৈল্পিক জীবনেও চরম অবক্ষয় নিয়ে আসে। সমস্ত নৈতিক আদর্শের বিনষ্টি হয়, আত্ম সংগ্রাম, আত্ম সমীক্ষা, জীবন জিজ্ঞাসা, বেকার সমস্যা রূপ পেতে থাকে ছোটগল্পে। তবে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকের গল্পকারদের বিষয় এক হলেও বক্তব্য আলাদা। যেমন— রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' আর বিমল করের 'নিষাদ'; রবীন্দ্রনাথের 'একরাত্রি' আর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'একরাত্রি'-র বক্তব্য এক নয়। আসলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সাহিত্যিকেরা ইম্প্রেশনের বদলে এক্সপ্রেশনকে রূপ দিলেন তাঁদের গল্পে। বাইরের আপাত দৃশ্য রূপ নয়, মানুষের ভিতরের সত্যকে দেখাতে প্রয়াসী হলেন তাঁরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত সেই জীবন রূপায়ণ আরো নির্মম, অকুণ্ঠ ও নিরাসক্ত হয়ে উঠল। বিষাদ, বিচ্ছিন্নতাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, সংশয়, হতাশা, আশা, আত্মবিরোধ ও আত্মানুসন্ধান প্রধান হয়ে উঠল। মানুষের জীবনের সেই সংঘর্ষ, নীচতা, ভণ্ডামি, চরিত্রহীনতা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, আদর্শহীনতার নির্মম বিশ্লেষণ **'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'** বনফুল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্পর্শপাতে এমনভাবে রূপ দিলেন, যা আমাদের এক বিশেষ অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে যায়, এই আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার বিশেষ রূপ নির্মাণে বনফুল সত্যই বিশিষ্ট।

-ঃ উল্লেখপঞ্জী ঃ-

১। 'কালান্তর'— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পুনর্মুদ্রণচৈত্র ১৪০৩। পৃ.-৪১৫।

২। 'বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ'— বীরেন্দ্র দত্ত। প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ: ২০০৩ মার্চ -২০০৪ এপ্রিল। পৃ. - ৫২।

৩। ঐ

৪। 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'— ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ - ১৯৯৫। পৃ.- ৫৪৯।

৫। ''বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'— শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৬-২০০৭, পৃ.- ২৪৬।

৬। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'— সুকুমার সেন। আনন্দ । পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে, ২০০২, পৃ.- ৩৪০।

৭। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'— শ্রী ভূদেব চৌধুরী, চতুর্থ পর্যায়, (রবীন্দ্র যুগ: দ্বিতীয় পর্ব)। দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০০৩, আষাঢ় ১৪১০। পৃ.- ২৫৭।

৮। ঐ।

৯। 'সাহিত্য সন্ধান'— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য বিহার। দ্বিতীয় সংস্করণ: মার্চ ১৯৮৮। পৃ.-২৬১।

১০। 'কল্লোল যুগ'— অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। দশম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৬। পৃ.-৩৩।

১১। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'— শ্রী ভূদেব চৌধুরী, চতুর্থ পর্যায়, (রবীন্দ্র যুগ: দ্বিতীয় পর্ব)। দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০০৩, আষাঢ় ১৪১০। পৃ.- ৩৭৪।

১২। 'বনফুলের ফুলবন'— ড. সুকুমার সেন। সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ: দোলপূর্ণিমা ১৩৯০। পৃ.- ১৭।

১৩। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'— শ্রী ভূদেব চৌধুরী, চতুর্থ পর্যায়, (রবীন্দ্র যুগ: দ্বিতীয় পর্ব)। দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০০৩, আষাঢ় ১৪১০। পৃ.- ২৬৯।

১৪। 'বাংলায় গল্প ও ছোট গল্প'— ড. সরোজমোহন মিত্র। তুলসী প্রকাশনী। প্রথম সংস্করণ: আগষ্ট ১৯৯৭, পৃ. - ২২২।

১৫। 'ছোটগল্পের কথা'—ভূদেব চৌধুরী। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারী ২০০০। পৃ.-৮৯।

১৬। 'বনফুলের ফুলবন'— ড. সুকুমার সেন। সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ: দোলপূর্ণিমা ১৩৯০। পৃ.- ১৮।

১৭। ঐ, পৃ.- ১৬।

১৮। 'লেখকের কথা'— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭। 'সাহিত্য কড়ার আগে' প্রবন্ধ। পৃ. - ৩০।

১৯। ''বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'— শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৬-২০০৭, পৃ.- ৩৬৫।

২০।'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'— সুকুমার সেন। আনন্দ । পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে, ২০০২, পৃ.- ৩৫৩।

২১। 'বাংলা গল্প বিচিত্রা'— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশ ভবন। পঞ্চম মুদ্রণ: আশ্বিন ১৪১০। পৃ.– ৫১।

২২। 'কালের পুত্তলিকা'— অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং। তৃতীয় সংস্করণ: বৈশাখ ১৪১১, এপ্রিল ২০০৪। পৃ.– ৩৩৯।

২৩। 'ছোটগল্পের বিনির্মাণ'— তপোধীর ভট্টাচার্য। অঞ্জলি পাবলিশার্স। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ:জুলাই, ২০০৬। পৃ. ১৪।

২৪। 'লেখকের কথা'— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭। 'সাহিত্য সমালোচনা প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ। পৃ. – ৮৫।

২৫। 'প্রবন্ধ সংকলন'— বুদ্ধদেব বসু, 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধ। দে'জ পাবলিশিং। ষষ্ঠ সংস্করণ: আগষ্ট ২০০৮। পৃ.–৭৩।

২৬। 'কল্লোল যুগ'— অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। দশম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৬। পৃ.–৮৪।

২৭। 'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য'—বুদ্ধদেব বসু। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চতুর্থ মুদ্রণ: জানুয়ারী ১৯৮৩। পৃ.১২৫।

২৮। 'কল্লোল যুগ'— অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। দশম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৬। পৃ.–১৩৫।

২৯। 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য'— গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ: আষাঢ় ১৪০৭/জুন২০০০। পৃ.– ৩১০।

৩০। ঐ, পৃ. – ৩১২।

৩১। 'কথাসূত্র'— পবিত্র সরকার। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১০। পৃ. – ১১৪।

৩২। 'বাংলা কথা সাহিত্য–জিজ্ঞাসা'— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ: জুন ২০০৪। পৃ. ১৩৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

"বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য "

প্রাক্-রবীন্দ্র-গল্পধারায় তেমন বিশেষ বৈচিত্র্য ছিল না। **"বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই বাংলা ছোটগল্প জীবনের বিচিত্র রস প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছিল। এই সময় থেকে ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য প্রচুর। লেখকেরা এই শিল্পরূপটিকে নিয়ে নানা পরীক্ষা করছিলেন। জীবনের বহু সমস্যা, সমাজের নানা সমস্যা তখন ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পানপাত্রে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল।"**[১] বনফুল বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য। তিনি বিষয়-বৈচিত্র্য পিয়াসী শিল্পী। তাঁর গল্পের সংখ্যা প্রায় ছ'শ। সর্বসাকুল্যে ৫৮৬ টি গল্পের সন্ধান এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৫৭৮টি বনফুলের সম্পূর্ণ রচনাবলীতে পাওয়া যায়; বাকী ৮টি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই মুদ্রিত হয়ে থেকে গেছে। তবে **'বাণীশিল্প'** থেকে বনফুলের পুত্র চিরন্তন মুখোপাধ্যায় দু'খণ্ডে **'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র'** প্রকাশ করেছেন। তাতে প্রথম খণ্ডে ২৬৭টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ২৯৩টি গল্প রয়েছে। অর্থাৎ দু'খণ্ডে ৫৬০টি গল্প মুদ্রিত। তা সে যতগুলি গল্প পাওয়া গেছে তাদের বিষয়-বৈচিত্র্যে প্রত্যেকটি আলাদা। বনফুলের ছোটগল্পে কোন একটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটে নি। এই বিষয়-বৈচিত্র্য তাঁর জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতারই বিচিত্র প্রকাশ। অভিজ্ঞতাবাদ (empericism) -এর সত্যের ভিত্তিতেই তিনি তাঁর ছোটগল্পের বিষয়ের বিচিত্রতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। জীবনকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যতটুকু জেনেছেন, যেভাবে জেনেছে, সেভাবেই সেই লব্ধ অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছেন গল্পে নিজস্ব জীবনদর্শন অনুযায়ী। তাই অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র দিন দিন যত বিস্তৃত, প্রসারিত হয়েছে, জীবনের যত বিচিত্র ঢেউ এসে লেগেছে তাঁর মনের কিনারায় জীবন সত্যও তত নব নব রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর গল্পে। ফলতঃ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গল্প বিচিত্রস্বাদী হয়েছে। তাই 'ফুল, পশু-পাখি, জনমানুষ থেকে শুরু করে 'আগাছা' পর্যন্ত তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। ড. সুকুমার সেন গল্প শতকের ভূমিকায় লিখেছেন (২২.৭, '৬৬)— **"বাংলা সাহিত্য ছোটগল্পে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, ভালোগল্প লিখেছেন ও লেখেন এমন সাহিত্যিকের খুব অভাব নেই। বলা যায় তাঁদের অনেকেরই গল্পে নিজস্বতা আছে। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে ছোটগল্পে সুস্বাদের ও সুবাসের বৈচিত্র্য কম। তাঁদের কেউ কেউ জলের মতো ঘুরে ঘুরে অথবা দক্ষিণা হাওয়ার মতো ফিরে ফিরে চমৎকারভাবে একই কথা কন। সেই এককথার একতারা - দোতারাতেই তাদের বিশেষ মহিমা। বনফুলের একতারা, দোতারা বাজেনি, বেজেছে বহুস্বর কলকণ্ঠ।....**

বনফুলের গল্পে কারিগরের দিকে ঝোঁক নেই, ঝোঁক আছে আস্ত জীবনের দিকে, যে জীবন বহু - বিচিত্র বহু বিসর্পিত। নিজের দৃষ্টি, নিজের অনুভব কল্পনার তাঁতে আত্মভাবনার জাল বুনে বুনে তাঁর গল্প গড়া নয়। এঁর গল্প প্রচণ্ড, হয়তো স্থানে স্থানে মোলায়েম নয়, কিন্তু সর্বদা হৃদ্য এবং পরিতৃপ্তিকর। বনফুলের গল্পে যে সব নরনারী উপস্থাপিত হয়েছে তাদের অভিজ্ঞতার ভূমিতে হয়তো তাদের কেউই কখনো দেখা দেয় নি, অথচ মনে হয় তারা যে

অপরিচিতি নয়, তাদের মতো কাউকে যেন কোথাও দেখে থাকব, তাদের কথা শুনে থাকব। বনফুলের গল্পে জীবনের ছবি ফুটেছে— ফোটোগ্রাফ ওঠেনি। এও তাঁর গল্পের এক বিশিষ্টতা। বহুদিন পূর্বে প্রভাবকুমারের গল্পের এই রকম আস্বাদ কিছু পাওয়া গিয়েছিল। তবে প্রভাতবাবুর গল্পের ছবিতে খুশির উজ্জ্বল আলো পড়েছে বনফুলের গল্পে খুশি - অখুশির আলোছায়ার আলপনা আঁকা হয়েছে।"[২] ড. সেনের এই বিদগ্ধ মত যথার্থ।

বনফুল জীবন সমুদ্রের অনন্ত ভাণ্ডার থেকে চয়ন করেছেন তাঁর বিচিত্রস্বাদী গল্পের বিষয়। সে কারণে গল্পগুলি পড়তে আমাদের কখনো একঘেয়েমি আসে না। ড. সুকুমার সেন সাহিত্যিকদের দু -দলে ভাগ করেছেন—এক. গুটি পোকার দল, দুই. বাবুই পাখির দল। দু জাতেরই এই দুরকম প্রাণীই বাসা তৈরী করে, তবে বাসার ধরন প্রকৃতি ও নির্মাণে দু - দলের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। গুটি পোকা জাতের সাহিত্যিকেরা একই কথা নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেন। তাঁদের গানের যন্ত্র একতারা। তা সে একই সুরের না হোক একই তানের। কিন্তু বাবুই জাতীয় সাহিত্যিকেরা কখনো এক বিষয়ে আবদ্ধ থাকেন না; নিত্য নতুনতার দিকে তাঁর অন্বেষা, অভিসার। তাই বাবুই জাতের সাহিত্যিকেরা আমাদের কখনো কখনো এক উদার উন্মুক্ত আকাশের নানা রঙের রামধনুর সৌন্দর্য্যে মোহিত করেন। **"গুটি পোকা সাহিত্যিক খোঁজেন ভাবের বৈচিত্র্য, বাবুই-সাহিত্যিক খোঁজেন বিষয়ের ভিন্নতা। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) বাবুই জাতের লেখক।... তাঁর চোখ ছিল সজাগ - বাইরের দিকে, অতন্দ্রিতভাবে শুধু অন্তরের দিকে নয়। ...**

বলাইবাবু কাহিনী লিখেছেন। দেখেশুনে ভেবে-চিন্তে যথাসাধ্য নতুনতর করে। তিনি পঠিক মোহন সিরিজ পাকাবার জন্যে ঢেরি ঘোরান নি। তাই বনফুলের রচনায় যে বিচিত্রতার সম্ভার পাই তা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো বাঙালী সাহিত্যিকের রচনায় পাইনা।"[৩]

বনফুল ছোটোবেলা থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে পরিচিতি হবার সুযোগ পেয়েছিলেন পারিবারিক সূত্রে এবং বাল্য কৈশোর-যৌবন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে পরিচিত হবার, মানুষের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখার, তার উত্তাপ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিলেন শিক্ষাগ্রহণ ও পেশার সূত্রে। শুধু পেশা কেন, তাঁর অন্তরের একটি অদম্য কৌতূহল মানুষের জীবন অন্বেষণে সদা ব্যাপৃত ছিল। ফলে ৮০ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁর বিচিত্র শ্রেণীর বিভিন্ন গোত্রের মানুষ, মানুষের স্বভাব চরিত্র কোন না কোনভাবে জান্তে অজান্তে তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। এই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের রূপচিত্রণে তাই তাঁর গল্পও বিষয়-বৈচিত্র্যে মনোহারী হয়েছে। বনফুল **"দেখেছেন অজস্র চরিত্র, উপলব্ধি করেছেন অজস্র চরিত্র, বলেছেনও অজস্র চরিত্রের কথা এবং কল্পনাও করেছেন অজস্র চরিত্র। এই অজস্র চরিত্রের অন্তর্জগৎ ও মনের ইতিহাস বলে গিয়েছেন তিনি।"**[৪] স্বাভাবিকভাবেই তাতে মানব জীবনের ভালো-মন্দ, হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের কথা, মানব চরিত্রের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসঙ্গতির কথা ,

অদৃষ্টের কাছে মানব জীবনের অসহায়তার কথা, ভণ্ডামি, দারিদ্র্য ও মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের কথা, আদিম জৈব প্রবৃত্তির কাছে মানবজীবনের অসহায়তা ইত্যাদি বিষয় উঠে এসেছে। বৈচিত্র্যের অভিলাষী বনফুল সচেতনভাবেই এই বিষয়-বৈচিত্র্য চর্চা করতেন। শুধু বিষয়-বস্তুতে কেন, আঙ্গিক-প্রকরণে, রচনা পরিকল্পনায়ও সচেতন প্রয়াস করেছেন। বনফুল নিজেই বলেছেন— **"আমি আমার খেয়াল-খুশি-মত যখন যাহা ইচ্ছা, তাহাই লিখিয়াছি। আমি চেষ্টা করিতাম, যাহাতে আমার দুইটি বই যেন এক স্বাদের না হয়।"**[৫] বস্তুতঃপক্ষে দুটি বই কেন, বনফুলের দুটি গল্প একরকম নয়। তাঁর এই বিশেষত্বকে বন্ধু পরিমল গোস্বামী বলেছেন **'একটা বৈপ্লবিক স্বাতন্ত্র্য'**। বনফুলের এই চরিত্রগত বিশিষ্টতা তাঁর গল্পেও প্রতিফলিত। কেননা, সাহিত্য স্রষ্টা-নিরপেক্ষ নয়।

আগেই বলেছি, বনফুলের এই বিষয়-বৈচিত্র্যের পেছনে যে প্রভাবটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল, তা হল তাঁর প্রতিদিনের দেখা অজস্র মানুষের চরিত্র, জীবন। বনফুলের জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে বিহারে। এবিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন **"আমার জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে বিহারে।"**[৬] বনফুলের জন্ম গঙ্গা ও কোশী নদের সঙ্গমস্থল মরিহারী গ্রামে। সেই গ্রাম্য ও অরণ্য পরিবেশেই বনফুলের জীবন-চেতনার উন্মেষ। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ বনফুলের কাছে ছিল চিররহস্যাবৃত ও চিরআকাঙ্ক্ষিত। গ্রামের পথে-ঘাটে, বনে-বাদারে ঘুরে বেড়াতেন তিনি তাদের বাড়ির মুসলমান চাকর চামরুর স্ত্রীর সঙ্গে। জঙ্গলে ঘুরতে ভালবাসতেন বলে তাঁর ডাকনাম 'জংলী বাবু' রাখা হয়েছিল। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ছাড়াও বনফুলের উপর তাঁর নিজস্ব পরিবারের উদার অন্তরঙ্গ আবহাওয়া প্রভাব ফেলেছিল। পিতা সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সেই গ্রামের এক বিখ্যাত ডাক্তার ও জনপ্রিয় মানুষ। মাতা মৃণালিনী দেবী রক্ষণশীল প্রকৃতির হলেও যথেষ্ট প্রগতিবাদী মহিলা ছিলেন। পিতা সত্যচরণ ছিলেন উদার মতাবলম্বী, সর্বসংস্কারমুক্ত, আশ্রিত বন্ধুবৎসল, গুণগ্রাহী পরার্থপর ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সনাতন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য হয়েও তাই সত্যচরণ রক্ষণশীলতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেন নি। স্বভাবতই তাঁর গৃহ জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের অবারিত দ্বার ছিল। তাঁর নিজস্ব আত্মীয়-কুটুম্ব ছাড়াও পরিচারকগণ, পরিচিত-অপরিচিত নানা ব্যক্তি, মজুর, রাঁধুনি, প্ল্যাটফর্মের যাত্রী— এক কথায় সকল শ্রেণীর মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল সত্যচরণের বাড়ি। এছাড়া তাঁদের চাষের কিছু জমি-জমাও ছিল। তার জন্য দশ-বারো জন কৃষক-মজুরও থাকতেন বাড়িতে, তাছাড়া নানা রকম গৃহপালিত পশু, যেমন গরু, কুকুর, খরগোস, গিনিপিগ, অনেক পাখি, দু'টি বড় জাতের পাহাড়ী ঘোড়া ছিল, আর সেগুলি দেখা-শোনা ছিল করার জন্য ছিল আরো কিছু পরিচারক ও একজন সহিস। বর্ণহিন্দু, নিম্নবর্ণের হিন্দু এমনকি মুসলমানও সত্যচরণের বাড়িতে প্রতিপালিত হতেন। পরিবারের লোকজন ছাড়াও অতিথি-অভ্যাগতদের প্রতিনিয়ত আনাগোনা ছিল দৈনন্দিন ঘটনা। কারণ, সত্যচরণের বাড়ি ছিল রেল ষ্টেশনের পাশেই। পিতার চরিত্রের এই উদার আন্তরিক

আতিথেয়তা সম্পর্কে বনফুল লিখেছেন— "আমাদের বাড়ি তখন অনেক লোকের আশ্রয়স্থল। বাবার অনেক রোগীদের আত্মীয়-স্বজন মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসিয়া থাকিতেন। অনেক চাকুরী প্রার্থী আসিয়া জুটিতেন। বাবাদের একটা থিয়েটার পার্টী ছিল। সে পার্টীর অনেক লোকের আস্তানা ছিল আমাদের বাড়িতে। তাছাড়া আমাদের বাড়ীর কাছে রেলওয়ে ষ্টেশন থাকাতে অনেক লোক আমাদের বাড়িতে আসিয়া একবেলা খাইয়া তাহার পর ট্রেন ধরিতেন। ও অঞ্চলের জমিদারদের আমলা গোমস্তারা প্রায়ই মোকদ্দমা উপলক্ষে কাটিহার কিংবা পূর্ণিয়া যাইতেন। বাবা সকলেরই ডাক্তার ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা অসংকোচে আমাদের বাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া যাইতেন এক-আধবেলা। গঙ্গার ঘাটও ছিল আমাদের বাড়ীর নিকটে। সুতরাং গঙ্গাস্নান উপলক্ষে আমাদের বাড়ীতে বেশ জনসমাগম হইত। ও অঞ্চলে কোনও হোটেল ছিল না, ডাকবাংলো তখনও হয় নাই, সুতরাং অনেক গভর্নমেন্ট অফিসাররা আসিয়াও আমাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। শিকার করিবার জন্য অনেক পক্ষীলোলুপ শিকারীও মাঝে মাঝে পদার্পণ করিতেন আমাদের বাড়ীতে। আমাদের বাড়ীতে প্রত্যহ দশ - বারোজন বাহিরের লোক আহারাদি করিতেন তখন।"[৭] — এই বিশাল পারিবারিক পরিধির মধ্যে বনফুল বড় হয়েছিলেন। পিতার এই উদার, মহৎ চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে বালক বনফুলের চরিত্রের ভিত তৈরী হয়েছিল— গড়ে উঠেছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বাস। তাঁর সঙ্গে পিতার সাহিত্যানুরাগী মন, যা বনফুলকে প্রভাবিত করেছিল। তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকা যেমন 'বসুমতি', 'বান্ধব', 'সুপ্রভাত', 'প্রবাসী', 'হিতবাদী', 'সাহিত্য', 'প্রদীপ', 'বঙ্গবাণী' তাঁদের বাড়িতে রীতিমত আসতো। এছাড়া মাতা মৃণালিনীর নির্লোভ, নিঃস্বার্থপরতা, ধার্মিক, তেজস্বিনী মূর্তির অসাধারণ ধৈর্য্য ও নৈপুণ্য বনফুলকে প্রভাবিত করেছিল। এইভাবে পিতার উদারতাপূর্ণ মানসিকতা এবং মাতার শাণিত উজ্জ্বলতা, বলতে পারি বিপরীতমুখী দুই জীবনাদর্শের মধ্যে বনফুলের চরিত্র তৈরী হতে থাকে। তাছাড়া কঠোর রক্ষণশীল কাকা চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর জীবনভূমি তৈরীতে প্রভাব ফেলেছিল। এভাবে শৈশব-কৈশোর থেকে উন্মুখ যৌবনাবধি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অস্থির পরিস্থিতির স্খলিত জীবনযাত্রার সমন্বয় অন্বেষণ করতে করতে বনফুলের এক নতুন জীবন দৃষ্টি তৈরী হতে থাকে নিজস্ব জীবন ভাবনার মধ্য দিয়ে, যা তাঁর পরবর্তী সৃজনকর্মে লক্ষ্য করা যায়।

পূর্ণিয়া জেলার মাইনর শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে বনফুল সাহেবগঞ্জের রেলওয়ে হাইস্কুলে ভর্তি হন। সেই বছরই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু, বনফুল তখন ফোর্থ ক্লাসের ছাত্র। বনফুলের মনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বিশেষ প্রভাব ফেলেনি। কারণ, বালক বনফুলের চেতনায় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা তখনও ধরা দেয়নি। তবু এই সাহেবগঞ্জের বনফুলের সাহিত্য-জীবনের সূচনা ও প্রেরণাস্থল হিসেবে কম ভূমিকা ছিল না। তাঁর নিজের কথায়— "সাহেবগঞ্জে আমার কৈশোর জীবন কাটিয়াছে। বলিতে গেলে আমার জীবনের প্রস্তুতিপর্ব — এই সাহেবগঞ্জ।.

. . . বহুকাল পূর্বে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু সাহেবগঞ্জকে এখনও ভুলি নাই। . . . . সাহেবগঞ্জের পাহাড়তলী, পাহাড়ের ঝর্ণা, সাহেবগঞ্জের ধারে নীলকুঠি, সেখানে বটুদার নাইট স্কুল — এসব ভোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"[৮] ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাটিকুলেশন বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে বনফুল হাজারীবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজে I.S.C. পড়ার জন্য ভর্তি হন। হাজারীবাগের পাদরিদের কলেজে পড়ে তাঁর মনের পরিধি অনেকটা ছড়িয়ে পড়ে। বলে রাখা প্রয়োজন, হাজারীবাগেই থাকাকালীন বনফুল মাতৃভাষা ছাড়াও বিদেশী ভাষার ডিকেন্স, থ্যাকারে, স্কট, লরেন্স, মিল্টন, শেক্সপীয়ার, টলস্টয়, হুগো প্রমুখের সাহিত্য পাঠ করেন এবং নৃতাত্ত্বিক বিষয়েও পড়াশোনা করেন।

এর পর ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে হাজারীবাগ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ডাক্তারী পড়ার উদ্দেশ্যে বনফুল কলকাতায় আসেন। মফঃস্বলের ছেলের এই প্রথম নগর দর্শন হল। এতে শুধু দেখা নয়, বাংলা দেশের বৃহৎ নাগরিক জীবনযাত্রা ও তার চরিত্র সম্পর্কে প্রথম পরিচয়। প্রথমে বনফুল বাবার মামার বাড়ী শেওড়াফুলী থেকে কলেজে ডেলী প্যসেঞ্জারী করতেন। তারপর তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে ও পরে মেডিক্যাল কলেজের পাশে ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডিংয়ে এবং তারও পরে বৌবাজারের ডায়মণ্ড বোর্ডিং হাউসে থেকে পড়াশোনা করেছেন। বনফুল কলকাতার সঙ্গে পরিচয়ের কথা প্রসঙ্গে স্মৃতি কথায় চলেছেন— **"আমার বিহারে জন্ম। বাংলাদেশের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। শেওড়াফুলী হইতে কলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করিতে করিতে আমার সে পরিচয় হইয়া গেল।"**[৯] এই অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে নতুন পরিচয়ের মধ্য দিয়ে বনফুলের অভিজ্ঞতার পরিধি আরো বিস্তৃত হতে থাকে। বনফুলের বয়স তখন ২১ বছর। উন্মুখ যৌবনের অদম্য আগ্রহ ও কৌতূহল বশে বনফুল তীব্র পারিপার্শ্বিক সচেতন হয়ে যে জীবনের রূপ দেখলেন, তা তাঁর মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করেছিল। তিনি স্মৃতি কথায় লিখেছেন— **"সমস্ত মিলাইয়া মনে সেদিন যে ছবি আঁকা হইয়াছিল তাহাতে নানা রং। স্বার্থপরতার রং, নীচুতার রং, কলহ - প্রবণতার রং, রসিকতার রং, ভাব প্রবণতার রং, ছ্যাবলামির রং, অসভ্যতার রং, ভদ্রতার রং — অনেক রঙের বিচিত্র ছবি সেটি।"**[১০] বস্তুতঃপক্ষে এই বিচিত্র বর্ণের মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁর গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য অনিবার্যভাবে আপনা আপনি রূপগ্রহণ করেছে। তবে তাতে বনফুলের সচেতন প্রয়াসও ছিল। এছাড়া বাবার মামার বাড়ি শেওড়াফুলী থেকে কোলকাতায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করার জন্য ট্রেনের নানা শ্রেণীর মানুষের জীবন চিত্রও তিনি দেখেছেন, যা তাঁর ছোটগল্পে একটি বড় পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে।

বনফুল কোলকাতায় ছিলেন তিন-চার বছর। কিন্তু এই তিন চার বছরের জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে শিল্পীর ভিত্তিভূমি তৈরীতে সহায়তা করেছিল। মানব জীবনের বাস্তব জীবন সংগ্রামের প্রত্যক্ষচিত্র তাঁর হৃদয়ে দাগ কাটতে থাকল। তখন সময়টা ছিল ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের হতাশা, নৈরাশ্য, সংশয়াহত ভঙ্গুর জীবন, মূল্যবোধের অবক্ষয়, বেকার সমস্যা,

আর্থিক অনটনে বিপর্যস্ত মানব জীবন প্রভৃতিতে তখন মহানাগরিক জীবন ভরপুর। মহানগরের এই বিচিত্র জীবনের স্রোত চির-কৌতূহলী বনফুলের মনে জীবনকে আরো গভীর ভাবে, প্রত্যক্ষভাবে জানার আগ্রহ বাড়িয়েদিল। সে সময় অবসর পেলেই বনফুল মহানগরীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন মানব জীবনের সরাসরি উত্তাপ নেওয়ার জন্য—**"আমি সে সময় অবসর পাইলেই রাস্তায় ঘুরিতাম।. . . . কলিকাতার রাস্তায় ফুটপাথে তখন হাঁটা অসম্ভব ছিল না। কলিকাতা শহরকে এবং সদাচঞ্চল জীবনধারাকে আমি যেন মনে মনে গ্রাস করিতাম।"**[১১]

কোলকাতায় থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় পরিমল গোস্বামী, শিবদাস বসুমল্লিক, সজনীকান্ত দাস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের সঙ্গে। কোলকাতায় তিন-চার বছর পড়ার পর বনফুলকে চলে যেতে হয় পাটনায়। কারণ ১৯২৬ সাল নাগাদ পাটনায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী বনফুলকে কে কোলকাতা ছেড়ে পাটনা মেডিকেল কলেজে পাঠ নিতে হয়। পাটনা মেডিকেল কলেজে প্রসূতি বিভাগ বা মেটারনিটি ওয়ার্ড না থাকায় বিহার সরকার ব্যাঙ্গালোরের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে ছাত্রদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। এই সূত্রে এক মাসের জন্য দক্ষিণ ভারতের হাসপাতালের ও জনজীবনের অভিজ্ঞতাও হয় বনফুলের।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বনফুল ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ করেন। ডাক্তারী পাশ করার কিছুদিন পরেই পাটনা মেডিকেল কলেজে জুনিয়ার -হাউস -সার্জেন রূপে মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার আত্মসম্মান হানিকর প্রথার জন্য সে চাকুরী গ্রহণ করেন নি। পরে কোলকাতায় ফিরে মেডিকেল কলেজের ফিজিওলজির ডেমস্ট্রেটর ডাক্তার চারুব্রত রায়ের কাছে একবছর ক্লিনিক্যাল প্যাথলজির ট্রেনিং নেন। ট্রেনিং সমাপ্ত করে বনফুল আনুমানিক ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের মিউনিসিপালিটির হাসপাতালে মেডিকেল অফিসারের চাকরি গ্রহণ করেন। ল্যাবরেটরীর চাকরি গ্রহণ করার কারণ হল— সাহিত্য রচনা করার প্রবল আগ্রহ। এতে ডাক্তারীও করা চলল, সাহিত্য রচনারও সময় পাওয়া গেল। এবিষয়ে ড. বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে তিনি বলেছিলেন— **"আমি সাহিত্য চর্চা করিতে চাই। ল্যাবরেটারি প্র্যাকটিশ করলে তার জন্য সময় পাবো। চাকরী করলে তা পাবো না। জেনারেল প্র্যাকটিশ করলেও তা সম্ভব নয়।"**[১২] তাই বনবিহারীর সহায়তায় চারুব্রতের কাছে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান বনফুল। আজিমগঞ্জে বছর খানেক ছিলেন বনফুল। এ অল্প সময়ের বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র স্বভাবের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছিলেন তিনি। তার পর ভাগলপুরে গিয়ে 'খালিফাবাগ' -এ নিজস্ব ল্যাবরেটরী স্থাপন করেন **'The Sero Bactro Clinic'** নামে। এই ভাবে ডাক্তারীর সঙ্গে যে টুকু যোগাযোগ রইল তা সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান যোগাতে লাগল। কারণ বিচিত্র শ্রেণীর মানুষের যাতায়াত ছিল এই ল্যাবরেটরীতে। **"সমাজের নীচুস্তরের ব্যক্তির সঙ্গে অন্যথা তাঁর এমন যোগাযোগ ঘটতে পারত না। বনফুল তাঁর রচনায় টাটকা বিষয়বস্তু এইভাবেই সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। আমাদের খুব কম সাহিত্যিকেরই এমন সুবিধা সৌভাগ্য হয়েছিল।"**[১৩]

এইভাবে সাহেবগঞ্জের স্কুল থেকে হাজারীবাগের কলেজ হাজারীবাগ থেকে কোলকাতা, কোলকাতা থেকে পাটনা, পাটনা থেকে ব্যাঙ্গালোর, ব্যঙ্গালোর থেকে আবার পাটনা, পাটনা থেকে কোলকাতা ও পরে মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জ তারপরে ভাগলপুর ঘুরে বনফুলের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার সঙ্গে ছিল তাঁর ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব ও আরো বহু বিষয়ের গভীর অধ্যয়ন। অভিজ্ঞতার এই বিশাল - বিস্তৃত পরিধি তাঁর ছোটগল্পে বিষয় - বৈচিত্র্যে পরিস্ফুট। এর পরেও আবার একান্তভাবে সাহিত্য রচনার জন্য ১৯৬৮ সালের জুন মাসে বনফুল কোলকাতায় চলে আসেন। কোলকাতার লেকটাউনে বাসাভাড়া নেন। জীবনের শেষ দিন অবধি তিনি এখানেই ছিলেন।

বস্তুতপক্ষে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী বনফুলের ব্যক্তিত্বেই ছিল বৈচিত্র্যের আকাঙ্ক্ষা। জীবনমর্মে এক দুঃসাহসিক কৌতূহলের বশেই তাঁর এই বৈচিত্র্যলিপ্সা গড়ে উঠেছিল। **'খেয়ালী ও ওরিজিন্যাল'** বনফুল প্রাণধর্মের স্বাতন্ত্র্যে বিচিত্রকর্মা শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। জীবন ভাবনায় বৈচিত্র্যের অন্বেষণই ছিল তাঁর সহজাত প্রবণতা। বস্তুতঃ জগৎ ও জীবনের প্রতি অদম্য কৌতূহল ও আগ্রহে জন্ম দিয়েছে বৈচিত্র্যের পিপাসা। বনফুলের এই বিষয় - বৈচিত্র্যের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রখ্যাত সমালোচক বলেছেন— **" বনফুল মূলতঃ জীবন সম্পর্কে অশ্রান্ত কৌতূহলী। তাঁর কৌতূহল জীবনের সকল ক্ষেত্রে -- ইহলৌকিক পারলৌকিক, স্বপ্নলোক,বস্তুলোক, বিজ্ঞান দর্শন, কাব্য ইতিহাস নরনারীর বাস্তবজীবন ও অন্তরলোক -- সর্বত্রই তাঁর সমান কৌতূহল।"**[১৪]

বনফুলের এই সদা কৌতূহলী দীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতা তাঁকে একটি জীবনাদর্শে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। **'আনন্দ, আদর্শ এবং নির্ভীকতা'**র সঙ্গে অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তিনি মানব জীবনে একটি সামগ্রিক ঐক্যের রূপ তুলে ধরেছেন, যা তাঁর জীবনবাদ তথা জীবনবেদও বলতে পারে। তিনি জীবনকে কখনো খণ্ড, বিচ্ছিন্নভাবে দেখেন নি, তিনি জীবনের এক সামগ্রিক ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাঁর গল্পে সত্য-শিব-সুন্দরের রূপ পাই। বনফুল মনে প্রাণে জানতেন বাস্তবকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, কারণ বাস্তবের ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে সাহিত্যিকদের সত্য -শিব - সুন্দরের আরাধনা করতে হয়। এই **'বাস্তবের ভিত্তিভূমি'** বা অভিজ্ঞতা বনফুলের গল্পে যে বিচিত্রতার আমদানী করেছে তাতে তাঁকে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতাবাদী লেখক বলা চলে না, তিনি সেই জীবন অভিজ্ঞতার যেমন রূপকার, তেমনি ব্যাখ্যাকারও বটে।

অতঃপর আমরা বনফুলের জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার সৃষ্টিসম্ভার থেকে চয়ন করে কিছু গল্প আলোচনা করে তাঁর বিষয় -বৈচিত্র্যের স্বরূপ তুলে ধরার চেষ্ট করতে পারি।

সমগ্র জীবনব্যাপী বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সংগ্রহের মধ্য দিয়ে বনফুল তাঁর নিজস্ব একটি আদর্শের জগৎ তৈরী করে নিয়েছিলেন, যে আদর্শ জীবনের পূর্ণতার কথা বলে, সৌন্দর্য্যের কথা বলে, আনন্দের কথা বলে, ঐক্যের কথা বলে, অখণ্ড জীবনপ্রবাহের কথা বলে। আসলে বনফুল

অমৃত পিপাসু। সমস্ত কুৎসিত, অন্ধকার, হতাশা, খণ্ড -বিচ্ছিন্নের মধ্যে অমৃতময় এক জীবনানুভূতিতে উত্তীর্ণ হওয়া বনফুলের মনোধর্ম। কেননা তিনি মনে করতেন — **"সুখের সন্ধানে যখন আমরা চতুর্দিক তোলপাড় করিয়া বেড়াই, জ্ঞান -বিজ্ঞান, গুরু-বন্ধু, অর্থ -সম্পদ কেহই যখন আমাদের সুখের সন্ধান দিতে পারে না, তখন কবির কাছেই আমরা কেবল সুখের সন্ধান পাই।. . . . চতুর্দিকে যখন হতাশা, চতুর্দিকে যখন অন্ধকার, তখন একমাত্র কবিই বলিতে পারেন— অন্ধকার সত্য নয়, অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।"**[১৫] জীবনের সেই পূর্ণতার কথা বনফুল বলেছেন তাঁর ছোটগল্পের মধ্যে।

দেহ খণ্ড ক্ষণস্থায়ী কিন্তু দেহপিণ্ডে অনুভূত প্রেম চিরন্তন, চিরজীবী অবিনশ্বর। মানব জীবনে প্রেমের বিচিত্র লীলাখেলা প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে , সেই প্রেমেরই এক অদ্ভুত রূপ অঙ্কিত হয়েছে বনফুলের প্রথম গল্পে **"চোখ গেল"** - তে। যে প্রেম বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি নিয়ে আসে না, নিয়ে আসে এক সীমাহীন অনন্ত অমৃতময় অনুভূতি। গল্পের নায়ক তথা কথক মিনি নামে এক দুষ্টু মেয়ের কথা বলেছেন, যে **'সাধারণের চোখে হয়তো সুশ্রী ছিল না'**, বক্তাও তাকে **'খুব সুন্দরী'** বলে মনে করতেন না, কিন্তু তাকে ভালোবাসতেন। কারণ মিনির চোখ দুটোতে কি এক অদ্ভুত আকর্ষণীয় শক্তি বক্তাকে আকৃষ্ট করেছিল। মিনির সেই চোখ দেখে বক্তা **'মুগ্ধ'** হয়েছিলেন এবং তারপর **'একদিন নিভৃতে আদর'** করে তাকে বলেছিলেন— **'ইচ্ছে করে তোমার চোখ দু'টো কেড়ে রাখি।'**

'কেন?'

"ওই দুটোই তো আমাকে পাগল করেছে। আমি সবচেয়ে ওই দুটোকেই ভালোবাসি।"

এত ভালোবাসা সত্ত্বেও বক্তা তথা গল্পের নায়ক মিনিকে পায় নি। **'অজ্ঞাত পরিচিত আর একজন আসিয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল'**। নিয়ে যাওয়ারই কথা, কেননা, বক্তা মিনির চোখকেই শুধু ভালোবেসেছিল, **'সমগ্র মিনির জন্য তার প্রাণ নিবেদিত হয় নি'**। এরূপ যে ঘটবে এটা খুব স্বাভাবিক, কেননা খণ্ডিত প্রেমকে বনফুল কখনো জীবনাদর্শ বলে মনে করেন নি। মিনির বিয়ে অন্যের সঙ্গে হওয়াতে বক্তার 'প্রাণে বড় বাজিল।'

কিন্তু যে বেদনা হয়তো কালের নিয়মে সময়ের সাথে সাথে মুছে যেত, **'যদি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মর্মান্তিক ঘটনা না ঘটিত।'**

বিবাহের পর মিনি বাপের বাড়ি এলে পরে বক্তা দেখলেন, **"তাহার দুইটি চক্ষুই অন্ধ। কারণ হিসেবে শোনা গেল যে, চোখে গোলাপ জল দিতে গিয়া যে ভুলক্রমে আর একটা ঔষধ দিয়া ফেলিয়াছে।"** বক্তার সঙ্গে একদিন মিনির দেখা হলে বক্তা বললেন—**'অসাবধানতার জন্যে অমন দু'টি চোখ গেল।'**

মিনি উত্তর দিল, **'কেন যে গেল তা যদি না বুঝতে পেরে থাক, তা হলে না জানাই**

ভালো।'

এ এক অদ্ভুত অবিশ্বাস্য সেন্টিমেন্টালপূর্ণ নির্বুদ্ধিতা হলেও প্রেমের এক মহান রূপ অঙ্কন করেছেন বনফুল এখানে। গল্পের নায়ক খণ্ডিত ভাবে প্রেমকে অনুভব করতে, পেতে চেয়েছিল, তাই সে মিনিকে পায় নি। কিন্তু মিনি বক্তাকে যে মনের অন্তঃস্তল থেকে পেতে চেয়েছিল তা তার কথা থেকেই বোঝা যায়। বক্তা ভেবেছিলেন অসাবধানতার জন্যেই হয়তো মিনি চোখ দু'টি গিয়েছে। কিন্তু মিনি শেষ কথা থেকে তা স্পষ্ট যে সে বক্তাকে কতটা মনে প্রাণে চাইতো। 'কেন যে গেল'— তার কারণ যদি বক্তা একটু তলিয়ে ভাবেন তাহলেই যে তার উত্তর পাবেন কিম্বা আমরাও পেয়ে যাই, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। মিনিও যে বক্তাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছিল এবং চাইত তা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না, আর এও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, যে চোখ দিয়ে সে তার প্রাণ-পুরুষকে দেখেছিল, সে চোখ দিয়ে সে অন্য কাউকে আর মনের মানুষরূপে দেখতে চায় না। পুরুষের হৃদয় হয়তো এই নির্বোধ ভালোবাসা কোন অর্থ খুঁজে পায় না। কিন্তু যে নারী সর্বস্ব হৃদয় দিয়ে তার ভালোবাসাকে উপলব্ধি করতে চায়, তার কাছে এ প্রেম এক সীমাহীন ব্যঞ্জনার অনুভূতি নিয়ে আসে। তাই সে নারীর চোখে বাহ্যিক জগৎ লুপ্ত হয়ে গেলেও অন্তরে অন্তহীন প্রেমের বিশুদ্ধ শিখা প্রজ্জ্বলিত থেকেছে। গল্পের কথক তথা নায়ক মিনির চোখ দু'টির সৌন্দর্যই শুধু দেখেছিল, কিন্তু সে চোখের ভেতরে যে মিনির মনের কত কথা লুক্কায়িত ছিল তা কথক বুঝতে পারেন নি বা বোঝার চেষ্টাও করেন নি। মিনি এত ছোট নয় যে সে ভুল করে গোলাপ জলের পরিবর্তে অন্য চোখ নষ্টকারী ঔষধ দেবে। এ মিনির সচেতন মনের কর্ম। যদিও গল্পকার মিনির চঞ্চল চরিত্রের কথা বলেছেন, তবুও সেই চঞ্চলতার মধ্যেও মিনির যে একটি স্থিরতা ছিল তা বোঝা যায়। তাই অসাবধানতা নয়, মিনি সচেতনভাবেই গোলাপ জলের পরিবর্তে অন্য ঔষধ দিয়ে চোখ দুটিকে নষ্ট করে দিয়েছিল। মিনির শেষ কথাগুলিতে সে সত্য প্রকটিত হয়। গল্পের শেষের মিনির সেই 'কেন' শব্দেই কথকের প্রতি গভীর ভালোবাসার ইঙ্গিত রয়েছে। মিনির আত্মক্ষয়কারী এই প্রেম কথকের প্রতি আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়েই তার মহনীয়তাকে প্রকাশ করেছে। এভাবে মিনি বক্তাকে কখনো কোন কিছু না বললেও যেন অনেককিছু বলে গিয়েছে। বক্তা মিনিকে 'নিভৃতে আদর করিয়া' তার প্রেম নিবেদন করেছিল। 'আড়ালে' ডেকে মিনির সঙ্গে যে কথাও বলত তার ইঙ্গিত রয়েছে গল্পে। এমন নির্ভীকভাবে যে পুরুষ প্রেম নিবেদন করে তা সে আংশিকই হোক না কেন তার প্রতিই তো নারী হৃদয় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে। তাই গল্পে কথক মিনির শুধু চোখ দু'টোকে ভালবাসলেও মিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসর্গ করে। মিনি যেন তার চোখ দু'টো নষ্ট করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে গল্পের নায়ক তথা কথককে একথাই বোঝাতে চেয়েছে যে, প্রেম কখনও দু'টি চোখ দিয়ে আংশিক রূপে অনুভবের বস্তু নয়, তা অন্তর দিয়ে সমগ্রভাবে উপলব্ধির বিষয়।

"বাড়তি মাশুল" গল্পে বনফুল নিষ্ঠুর নির্মম অদৃষ্টের হাতে মানুষের চরম 'বিড়ম্বনা'র

কথা রূপায়িত করেছেন। গল্পের বক্তা একজন **'ডেলি প্যাসেঞ্জার'**। **'সমস্ত দিন আপিসে কলম পিষে উর্ধ্বশাসে হাওড়ায় এসে লোকাল ট্রেনের একখানি থার্ড ক্লাসে বসে'** হাপাচ্ছেন - এমন সময় সামনের প্ল্যাটফর্মে **'বোম্বে মেল ছাড়ছে'**, আর তারই একটি কামরায় এমন একখানি মুখ' তার চোখে পড়ল, যাতে তাঁর বুক আনন্দে ভরে উঠল। এই আনন্দের কারণ হল বহুদিন পূর্বে তার এক ছেলে তারকেশ্বরে মেলা দেখতে গিয়ে ভিড়ে হারিয়ে যায়। অনেক খোঁজখবর করেও আর তাকে পাওয়া যায় নি। কিন্তু আজ সেই পুত্রের মতই, **'হ্যাঁ সে মুখটি বোম্বে মেলের একটি কামরায় দেখতে'** পেলেন।

এরপর তড়িঘড়ি করে বক্তা গিয়ে উঠলেন বম্বে মেলে, সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও ছেড়ে দিল, ট্রেনে উঠে বক্তা আশ্বস্ত হলেন, মনে হল **'হ্যাঁ, ঠিক সেই।'** পাশে এক বৃদ্ধ বসে ছিলেন, ভয়ে ভয়ে রুদ্ধশ্বাসে বক্তা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন **"এতদিন কোথায় ছিলি? আমাকে চিনতে পারিস?"** কিন্তু তারপর যা ঘটল তাতে বক্তা হতবম্ব হয়ে গেলেন। ছেলেটি হিন্দিতে উত্তর দিল- **"হামারা নাম পুঁছতে হেঁ? কেঁও? হামরা নাম মহাদেও মিসর, ঘর ছাপরা জিলা।"** বক্তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার! দ্বিতীয় বার পুত্র হারা হয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ফিরতে হল **'Excess Fair'** — **'বাড়তি মাশুল'** দিয়ে।

আসলে মানব জীবনে হারানোকে পাওয়ার যে সুখ তা অনির্বচনীয়। বক্তা তার প্রাণের সন্তানকে ফিরে পাবেন বলে এমন করে হয়তো কতবার বাড়তি মাশুল চুকিয়েছেন। জীবন সংগ্রামে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্তের জীবনে অদৃষ্টের পীড়ন আরও এক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত করেছিল সে সময়। তাই সারাদিন কলম পিষে উর্দ্ধশ্বাসে জীবনের পেছনে দৌঁড়তে দৌঁড়তে বক্তা যখন হাপাচ্ছিলেন, তখন তাঁর চোখের সামনে তাঁর সন্তানকে দেখতে পেয়ে **'সমস্ত বুক আশা আনন্দে দুলে'** উঠলেও কিন্তু পরক্ষণেই সে আশা-আনন্দ চরম - হতাশা, **'বিড়ম্বনা'**র মধ্যে ডুবে গেল।

"অজান্তে" গল্পে রূপলাভ করেছে আমাদের সমাজের আত্মকেন্দ্রিক ভালোবাসার এক নিষ্ঠুর রূপ — যে ভালোবাসা বস্তু কেন্দ্রিকতার আবরণে মানবিক বোধ সমূহকে আচ্ছন্ন করে, মানুষ যার জন্য যথার্থই অমানুষে পরিণত হয়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। গল্পের নায়ক যেখানে তাঁর স্ত্রীর একখণ্ড **'বডিস'** অর্থাৎ অন্তর্বাস নিয়ে বিপর্যস্ত বর্ষার দিনে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বাড়ি গিয়ে কতক্ষণে পৌঁছবেন আর প্রেম নিবেদন করবেন তার স্ত্রীকে। যার জন্য অন্ধকার গলিতে অন্ধ ভিখারীকে না জেনে-শুনে লাথি মারতে ও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতে তার বাধে না। গল্পটি এরকম — গল্পের নায়ক অফিসে মাইনে পেয়েছেন, তাই বাড়ি ফেরার পথে ভাবলেন, **"ওর জন্যে একটা বডিস্ কিনে নিয়ে যাই। বেচারী অনেক দিন থেকেই বলছে। এ-দোকান সে দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল।"** জামাটি কিনে বেরিয়েছেন, অমনি বৃষ্টি আরম্ভ হল। তাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। বৃষ্টি একটু থামাতে জামাটি বগলে

করে ছাতাটি মাথায় দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন।বড় রাস্তা পেরিয়ে এলেন, তারপর এক অন্ধকার গলিতে। **'গলিতে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে'** চলেছেন, সে কত ভাবনা! মনের রঙিন নেশায় যখন ডুবে হেঁটে চলেছেন **'এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল'** বক্তার। সেও পড়ে গেল, গল্পের নায়কও পড়ে গিয়ে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল জামাটি। গল্পের নায়ক উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু **'লোকটা তখনও ওঠেনি — উঠবার উপক্রম করছে।'** রাগে গল্পের নায়কের সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে উঠল। সে লোকটিকে এক লাথি মেরে বসলেন আর বললেন - **"রাস্তা দেখে চলতে পার না শুয়ার?" "মারের চোটে সে আবার পড়ে গেল, কিন্তু কোনও জবাব করলে না।"** এতে গল্পের নায়কের **'আরও রাগ হল'** এবং আরো মারতে লাগলেন লোকটিকে। **"গোলমাল শুনে পাশের বাড়ির এক দুয়ার খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন — "ব্যাপার কি মশাই?"** গল্পের নায়ক তখন বললেন— **"দেখুন দিকি মশাই - রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি করে দিলে! কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। পথ চলতে জানে না, ঘাড়ে এসে পড়ল —"** তার পর সেই আগন্তুক ভদ্রলোক গল্পের নায়ককে বললেন — **"কে - ও? ওঃ থাক্ মশাই, মাপ করুন, ওকে আর মারবেন না। ও বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী, এই গলিতেই থাকে — "** তার পর গল্পের নায়ক দেখলেন **"মারের চোটে সে বেচারা কাঁপছে — গা-ময় কাঁদা"** আর গল্পের নায়কের **"দিকে কাতর মুখে অন্ধ দৃষ্টি তুলে হাত দু'টি জোড় করে আছে।"**

গল্পের **'বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী'**র কাতরমুখে অন্ধ দৃষ্টি তুলে হাত দু'টি জোড় করে গল্পের নায়ককে আর না মারার যে প্রার্থনা করেছে তাতে গল্পের নায়কের মতো আমরাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। গল্পের নায়ক অন্ধ ভিখারীটিকে যে মুহূর্তে লাথি মেরেছে তা যে কোন স্বপ্নাচ্ছন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু অন্ধ দেহ, সর্বস্ব ভালোবাসার টানে সে যে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, আত্মকেন্দ্রিক ঠুনকো ভালোবাসার সেই রূপ চিত্রণ আমাদের ভাবিয়ে তোলে। বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করার সহনশীলতা যে ভালবাসার থাকে না, তা নিতান্তই এক বাতিকগ্রস্থ বিভ্রান্তিকর মানসিকতাজাত, ব্যর্থতাই যার চূড়ান্ত পরিণাম। মানবিক মূল্যবোধের এই চরম অবক্ষয় বনফুলকেও চঞ্চল করে তুলেছিল, এই আত্মসুখ পরায়ণ ভালোবাসার, না স্বার্থপরতার আর এক নামান্তর, তার চরম পরিণাম কি? এ প্রশ্ন বারবার বনফুলের মনে জেগেছিল। যার এক নেতিবাদী উত্তরই খুঁজে পেয়েছিলেন বনফুল। বিমূঢ় বিভ্রান্ত যুগের আত্মসর্বস্ব তথা আত্মক্ষয়কারী ভালোবাসার রূঢ় বাস্তব চিত্রণ আর কি হতে পারে?

এই আত্মসুখপরায়ণ ভালোবাসার একেবারে বিপরীত চিত্র প্রকাশ পেয়েছে **'তাজমহল'** গল্পে। যেখানে হৃদয়-ঐশ্বর্যে ভালোবাসা মহিমান্বিত। মুঘল সম্রাট শাজাহান বহুপত্নীক হলেও মমতাজ ছিলেন তার হৃদয়েশ্বরী। তাই মমতাজের মৃত্যুর পর তার প্রেমানুভূতিকে অক্ষয় অমর করে রাখার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে বহু দেশী-বিদেশী সুদক্ষ কারিগর দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন

আগ্রার সুরম্য বৈভব-ঐশ্বর্যে-সৌন্দর্যের স্থাপত্য তাজমহল। ইতিহাসের পাতায় ও মানুষের হৃদয়ে তা আজও অম্লান। তাজমহল আজ শুধু মমতাজের প্রতি শাজাহানের একনিষ্ঠ প্রেমের নিদর্শন মাত্র নয়, তা সর্বযুগের, সর্ব কালের মানব মানবীর একনিষ্ঠ প্রেম-ভালোবাসার প্রতীক। মুঘল বাদশার নির্মিত এই তাজমহলের পাশাপাশি বনফুল আর এক মনের তাজমহল তৈরীর গল্প বলেছেন, যা কোন সম্রাট - বাদশার নয়, ফকির শা-জাহানের, যে তাজমহলের ভিত্তি **'কতগুলো ভাঙ্গা ইঁট আর কাঁদা'**। যেখানে অর্থের দম্ভ নেই, মর্মরের বৈভব নেই, ঐশ্বর্য নেই, আছে শুধু হৃদয়ের অন্তর্লীন একনিষ্ঠ ভালোবাসা।

গল্পের আখ্যান বস্তুটি বড় চমৎকার ও হৃদয়স্পর্শী। গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। গল্পের কথক-নায়ক একজন ডাক্তার, যিনি **'আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে'** এসেছেন। বক্তা প্রথম যখন আগ্রা এসেছিলেন এবং তাজমহল দেখেছিলেন, তখন দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহলকে দেখে মনে হয়েছিল **'চুনকাম করা সাধারণ একটি মসজিদ'**। তবু তিনি নির্নিমেষে চেয়েছিলেন তাজমহলের দিকে কারণ হাজার হোক তা শা-জাহানের তাজমহল, যাতে বহু প্রেমকথার, ইতিহাস স্মৃতি বিজরিত। একে একে মনে, আলমগীর, দারাসেকোর নানা কথা মানস পটে ভেসে ওঠে বক্তার। এরপর পূর্ণিমার পরদিন, যখন চাঁদ ঠিকমত ওঠে নি, জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস সবে মাত্র দেখা দিয়েছে, তখন দ্বিতীয়বার তাজমহল দর্শন করতে গিয়েছেন কথক, গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই কথকের মানসপটে যেন অতীতের চাপা কান্না ভেসে এলো, তার পর যখন চাঁদ উঠল তখন **'জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজরাজেশ্বরী শাজাহান-মহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন'** কথককে। তারপর বহুদিন কেটেছে, তাজমহলকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের ব্যবসাদারদের নোংরা ব্যবসা দেখে দেখে কথকের তাজমহলের প্রতি যেন আর আকর্ষণই নেই, **'পাশ দিয়ে গেলেও'** না। **'অন্ধকারে জ্যোৎস্নালোকে, সন্ধ্যায় ঊষায়, শীত-গ্রীষ্মে, বর্ষা- শরতে বহুবার বহুরূপে'** কথক দেখেছেন তাজমহলকে। তাই তাজমহলকে **'আর চোখে লাগে না, চোখেই পড়ে না'**।

এই অভ্যস্ত প্রাত্যহিক জীবন -যাপনের মধ্যে একদিন কথকের আউটডোর সেরে বারান্দা থেকে নামার পথে এক বৃদ্ধ মুসলমান ব্যক্তির সঙ্গে দেখা। পিঠে তার প্রকাণ্ড একটা ঝুড়ি বাঁধা, ঝুড়ির ভারে তার মেরুদণ্ড যেন বেঁকে গেছে। ঝুড়িটি নামাতেই কথক দেখলেন ঝুড়ির ভেতর এক বোরখা পরা মহিলা বসে আছে, বাড়িতে 'ফি' দিয়ে দেখাবার সামর্থ্য না থাকায় হাসপাতালের আউটডোরে দেখাতে নিয়ে এসেছে। বোরখা খুলতেই কথক দেখলেন দূরারোগ্য **'ক্যাংক্রাম অরিস'**-এ **'মুখের আধখানা পচে গেছে। ডানদিকের গালটা নেই। দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধে কাছে দাঁড়ানো যায় না।'** দূর থেকে বয়ে এনে এরোগের চিকিৎসা সম্ভব নয় ভেবে কথক অগত্যা হাসপাতালের বারান্দাতেই তাদের থাকতে বললেন, কিন্তু দুর্গন্ধে কম্পাউণ্ডার, ড্রেসার এমনকি মেথর পর্যন্ত কাছে যেতে না চাওয়ায় হাসপাতালের কাছে একটি

বড় গাছের তলায় রেখে চিকিৎসা করতে লাগলেন। **"বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার। দিবারাত্র সেবা করে চলেছে।"** বৃদ্ধ রোজ হাসপাতাল থেকে ওষুধ নিয়ে যেত আর কথক মাঝে মাঝে ইন্‌জেকশন্ দিয়ে আসতেন। এভাবেই চলছিল। তারপর একদিন মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে কথক **'কল'** থেকে ফিরছেন, তখন হঠাৎ দেখলেন **'বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে। একটা চাদরের দুটো খুঁট গাছের ডালে বেঁধেছে আর দুটো খুঁট নিজে দুহাতে ধরে দাঁড়িয়ে ভিজছে'**। সঙ্গে বেগম সাহেবাও আপাদমস্তক ভিজে গেছে আর **'কাঁপছে ঠক ঠক করে। আধখানা মুখে বীভৎস হাসি।'** জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। কথক হাসপাতালের বারান্দাতেই আপাতত নিয়ে যেতে বললেন, এরপর বৃদ্ধ হঠাৎ প্রশ্ন করলো যে তার স্ত্রীর বাঁচার কোন আশা আছে কিনা। কথক সোজাসুজি জবাব দেন **'না'**। বৃদ্ধ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দিনকতক পরে কথক দেখলেন **'গাছতলা খালি। কেউ নেই।'** আরও কয়েকদিন পরে কথক 'কল' থেকে ফিরছেন একটা মাঠের ভিতর দিয়ে আসতে আসতে সেই ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের রোদে বৃদ্ধকে দেখতে পেলেন মাঠের মাঝে **'কতগুলো ভাঙা ইঁট আর কাদা দিয়ে বুড়ো কি যেন গাঁথছে।'** কথক প্রশ্ন করাতে বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে সেলাম জানিয়ে বললেন— **'বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।'** কথক স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, **'খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর'** কথক তার বাসস্থান ও নাম জানতে চাইলে বৃদ্ধ বলে, সে আগ্রার আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়ায়, নাম— **'ফকির -শাজাহান।'** কথক তখন **'নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে'** রইলেন। এই হল গল্পের আখ্যান বস্তু।

গল্পের আখ্যান বস্তু পড়ে আমাদের মনে তাই একটি প্রশ্ন জাগে, সম্রাট শাজাহানের নির্মিত বহুমূল্যবান রত্নের নির্মিত তাজমহল আর ফকির শাজাহানের ভাঙা ইঁট আর কাঁদা দিয়ে গড়া সমাধির মধ্যে ভাবগত দিক থেকে কোন পার্থক্য আছে কি? না, নেই। সম্রাট শাজাহান সম্রাট হওয়ায় তার বৈভবময় প্রকাশ আগ্রার সেই সৌন্দর্যময় সৌধ নির্মাণে, যা পত্নীপ্রেমের একনিষ্ঠতায় সমুজ্জ্বল, আর ফকির শাজাহান ফকির হতে পারেন, কিন্তু তার প্রিয়তমার প্রেম নিবেদনে তিনিও সম্রাট শাজাহানের চাইতে কোন অংশে কম নয়, প্রেম ভাবনার দিক থেকে তাই সম্রাট শাজাহান, আর ফকির শাজাহানের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, প্রেমের মৌলিকতায় উভয়ে এক। বাহ্যিক দিক থেকে দেখলে তাদের মধ্যে বিস্তর ফাঁরাক মনে হবে, কিন্তু অন্তরধর্মে তাঁরা উভয়ে একনিষ্ঠ হৃদয়সর্বস্ব প্রেমিক। উভয়ে যেন এই কথাই বলে— **'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।'** আসলে প্রেমতো কোন টাকা -পয়সা, বৈভব -ঐশ্বর্য দিয়ে পরিমাপ করা যায় না! প্রেম অন্তরের অনন্ত ঐশ্বর্য, যা জীবনকে সুন্দর, মধুময়, অবিস্মরণীয় করে রাখে। যিনি প্রকৃত প্রেমিক তার কাছে ইঁট ও দামী মর্মরের অনুভূতি নিয়ে আসে, সামান্যও সীমাহীন আনন্দের অনুভূতি নিয়ে আসে। ফকির শাজাহান তাঁর প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি যে প্রেমের একনিষ্ঠতা দেখিয়েছেন তা তুলনাহীন। স্ত্রীর দুরারোগ্য ব্যাধির গন্ধে যেখানে সকলেই অতিষ্ট, অথচ যেখানে নির্বিকার চিত্তে **'বৃদ্ধ মুমূর্ষু স্ত্রীর সেবা করে চলেছে।'** এতো সেবা নয়, এযেন প্রেমের পূজা। আর্থিক

অনটনের মধ্যেও নিজের শরীরের শেষ সামর্থ দিয়ে বৃদ্ধ স্ত্রীর সেবা করেছে। মনে প্রাণে চেয়েছে তার প্রিয়তমা যেন সেরে ওঠে। আসলে ফকির শাজাহান ভালোবেসেছিল তার স্ত্রীর আত্মাকে। তাই পরলোকগতা স্ত্রীর আত্মার প্রতি প্রেম নিবেদন করেছে ভাঙ্গা ইঁট আর কাঁদার গাঁথুনি দিয়ে, হয়তো তা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু অন্তরে পত্নীর প্রতি যে প্রেমের অমরাবতী তৈরী করেছে তা আজীবন থাকবে তার হৃদয়ে। প্রেমের এমন আন্তর্জাতিক শাশ্বতরূপ বনফুল ছাড়া আর কে অঙ্কন করতে পারে? বনফুল যেভাবে সম্রাট শাজাহানের ঐশ্বর্যময় প্রেমের পাশে ফকির শা-জাহানের তাজমহল নির্মাণ করেছেন, তা যেন এক বলিষ্ঠ চিরন্তন প্রেমের অভিজ্ঞান। বৈভব - ঐশ্বর্য -সৌন্দর্যের পুঁজি দিয়ে নয়, ফকির শাজাহান স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ সেবাতে, স্ত্রীর প্রতি ঐকান্তিক প্রেম নিবেদনে গড়ে তুলেছিল তাঁর ভালবাসার সৌধ, হোক না তা **'ভাঙা ইঁট আর কাদা'** র। অন্তরের ঐশ্বর্যে সম্রাট শাজাহান কিছুটা যেন ম্লান করে দেয় ফকির শাজাহান। ফকির শাজাহানের তাজমহল তাই দর্শনীয় মনোহর কোন স্থাপত্য নয়, তা সম্পূর্ণ অনুভবের বস্তু। বনফুল তাজমহলের এই দুই বিপরীতধর্মী চিত্র রচনা করে প্রেমের এক শাশ্বত রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

ছোটগল্পের খণ্ড জীবনের রূপায়নে অখণ্ড, বৃহতের, মহতের ব্যঞ্জনা কিভাবে সৃষ্টি করা যায়, বনফুল তা খুব ভালোভাবেই জানতেন। যে খণ্ডজীবনের পরিচয় আমরা হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, লোকালয়ে, নির্জনে, উৎসবে-আনন্দে -বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে পাই। বনফুলে **"এক ফোঁটা গল্প"** -টিতে মানব চরিত্রের আর একটি বিশেষ দিক ফুটে উঠেছে। যেখানে মানব ও পশুতে একাকার হয়ে গেছে। আমরা সাধারণত জন্মদাত্রী মাতাকেই প্রকৃত মাতা হিসেবে মানি, পালিত মাকে নয়, কিন্তু বনফুল জন্মদাত্রী মাতার চেয়ে পালনকর্ত্রী মাতাকেও কোন অংশে কম মনে করেন নি। যার পরিচয় আমরা **'এক ফোঁটা গল্প'** -টিতে পাই। অবশ্য এগল্পের পেছনে বনফুলের ব্যক্তিগত জীবনের ছায়াপাত পরোক্ষভাবে থাকলেও থাকতে পারে। কেননা, বনফুল ছোটবেলা তাদের বাড়ির মুসলমান চাষি চামরুর স্ত্রীর স্তনপান করে পুষ্ট ও বড় হয়েছিলেন।

গল্পের আখ্যানটি সংক্ষেপে এরকম— রামগঞ্জের জমিদার শ্যামবাবু একটু খেয়ালী ও খাপছাড়া লোক ছিলেন। তিনি তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে গল্প -কথককে নিমন্ত্রণ করেছেন, গল্পের কথক ভাবলেন **'শ্যামবাবুর মায়ের অসুখ হল অথচ আমি একটা খবর পেলাম না!'** কারণ তিনিই হলেন সেখানকার একমাত্র ডাক্তার। দ্বিধান্বিত চিত্তে গল্প-কথক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন **"শ্যামবাবু গলায় কাচা নিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন। তাঁর মুখে একটা গভীর শোকের ছায়া।"** বক্তা এরপর শ্যামবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, **"আপনার মায়ের হয়েছিল কি?"** শ্যামবাবু একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন— **"ও আপনি শোনেন নি বুঝি? আমার মা তো আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন, তাঁকে আমার মনেও নেই। ইনি আমার আর এক মা— সত্যিকারের মা ছিলেন।"** শ্যামবাবু কথাগুলি বলতে বলতে আবেগান্বিত হয়ে

পড়ছিলেন। গল্প-কথক তখন বললেন— **"কি রকম? কে তিনি?"** শ্যামবাবু বললেন— **"আমার মঙ্গলা গাই। আমার মা কবে ছেলেবেলায় মারা গেছেন মনে নেই, সেই থেকে ওই গাইটিই তো দুধ খাইয়ে আমাকে এতবড় করেছে। ওরই দুধে আমার দেহমন পুষ্ট। আমার সেই মা আমায় এতদিন পরে ছেড়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।"** এই বলে তিনি হু হু করে কাঁদতে শুরু করলেন। তা দেখে গল্প-কথকের **"বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।"**

বস্তুতঃপক্ষে সত্যি-ই আমাদের মনে তখন একটি প্রশ্ন জাগে, সত্যিকারের মা কে? জন্মদাত্রী মা, নাকি পালনকর্ত্রী মা। আসলে জন্মদাত্রী মাতার চাইতে পালনকর্ত্রী কোন অংশে ছোট নয় বরং তার ভূমিকা ও মূল্য একটু বেশী। তাই শ্যামবাবুর কাছে জন্মদাত্রী মাতা ও মঙ্গলাগাই একই। কারণ মঙ্গলা গাইয়ের দুধেই তার দেহ মন পুষ্ট এবং তিনি এতবড় হয়েছেন। গল্পটিতে শ্যামবাবুকে আমাদের হয়তো একটু অদ্ভুত মনে হবে। কিন্তু চরিত্রটির সেই অদ্ভুত খেয়ালীপনার মধ্যে একটি অন্য জীবনবোধ ফুটে উঠেছে। **'এক ফোঁটা গল্প'** তাই তার একফোঁটা হয়ে থাকেননি, তাতে বৃহতের ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে।

সমাজের চরম অত্যাচারের যুগেও মানুষের চরিত্রের সনাতন মূল্যবোধের উদ্বোধনে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন বনফুল। তাই সর্বনাশা সামাজিক ভাঙন ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের যুগে এক সমাজ-সন্ধানী মানবিক বোধের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়েছেন **"দুধের দাম"** গল্পে।যখন মধ্যবিত্ত সমাজ তার মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলছে, হয়ে উঠছে ক্রমশ অমানবিক, সেই অবক্ষয়ী মূল্যবোধের যুগেও মানুষের মধ্যে যে মানবিক অনুভূতি একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায়নি তার এক আশ্চর্যরূপ ফুটে উঠেছে **"দুধের দাম"** গল্পে।

গল্পটির কেন্দ্রে আছেন এক বৃদ্ধা, যার কপালে সারাক্ষণ অবহেলা, অপমান, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ,ঘৃণা জুটেছে। কিন্তু সেই বৃদ্ধাই অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছেন শেষে। যিনি উপকারের মূল্যস্বরূপ রেলের এক কুলিকে দুধ খাওয়ার জন্য দু'টি টাকা দিয়েছেন ছেলে সম্বোধন করে। তখন সেই দু'টাকার অর্থমূল্য এক দু'টাকার সীমা ছাড়িয়ে বহুমূল্যবান জীবনদ্যোতনা নিয়ে আসে।

গল্পটি সংক্ষেপে এরকম—ট্রেনে ওঠার হুড়োহুড়িতে এক যাত্রীর হোল্ডঅল -এর স্ট্র্যাপে পা আটকে পড়ে গিয়ে বৃদ্ধার পা মচকে যায়। ক্ষমাপ্রার্থনা বা সহানুভূতি দেখানো তো দূরের কথা, যার ব্যাগে পা আটকে গিয়েছিল, সে ব্যক্তি বৃদ্ধাকে না দেখে-শুনে পথচলার জন্য ভর্ৎসিত করে। বৃদ্ধা বহুকষ্টে ট্রেনে ওঠে বসার জায়গা না পেয়ে মেঝেতেই বসলেন। ইতিমধ্যে পা ফুলে প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। বৃদ্ধা বুঝলেন একা তার পক্ষে নামা সম্ভব নয়। বৃদ্ধার পাশে তার ছেলে ও নাতির বয়সি বহু বাঙালি ছিল। বৃদ্ধা তাদের করুণভাবে অনুরোধ জানালেন তাঁকে একটু নামিয়ে দেওয়ার জন্য। সকলেই শুনল, কিন্তু না শোনার ভান করল, কিন্তু উপরন্তু তাঁকে নানা জনে নানা কটূক্তি করল। শেষে এক অবাঙালী কুলি বৃদ্ধার অসহায়তার কথা জানতে পেরে বৃদ্ধাকে দু'হাতে

বুকের কাছে তুলে ওয়েটিং রুমের মেঝেতে বসিয়ে রেখে আসে। কুলিটি বৃদ্ধাকে জানিয়ে যায়, 'গয়া প্যাসেঞ্জার' এলে সে আবার আসবে। সেখানে দু'টি ইজিচেয়ারের হাতলে পা তুলে দুই শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে একজন খবরের কাগজ, অন্যজন ইংরেজি বই পড়ছিল। তারা বৃদ্ধাকে ভিখারী ভেবে একজন পকেট থেকে পয়সা বের করে বৃদ্ধার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'পয়সা ওঠালেও, তুম হি কো দিয়া।' উত্তরে বৃদ্ধা পরিষ্কার বাংলায় বললেন— **'আমি ভিখারী নই বাবা, আমি আপনাদের মতো এক প্যাসেঞ্জার।'** শিক্ষিত বাঙালি দু'টি আরো নানা অপমানকর কথা বলতে লাগল। ইতিমধ্যে কুলিটি এসে বৃদ্ধাকে জানালেন যে, **'মাইজি গয়া প্যাসেঞ্জার** আগিয়া'। কুলিটি বৃদ্ধাকে **'তাহার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা পুনরায় বৃদ্ধাকে শিশুর মতো বুকে তুলিয়া** লইয়া বাহির হইয়া গেল' এবং কামরার মধ্যে এক বেঞ্চের এক কোনে বসিয়ে দিল। তারপর **'বৃদ্ধা তাহাকে দুইটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।'** কিন্তু কুলিটি জানায় তার মজুরী আট আনা। সে কিছুতেই ধর্ম বিক্রি করে বেশী টাকা নিতে রাজী হয় না। শেষে বৃদ্ধা তাকে বলে **"তুমি আমার ছেলে বাবা, ছেলের কাজই করেছ। আমি তো তোমাকে দুধ খাওয়াইনি, সামান্য যা দিচ্ছি তা দুধের দাম মনে করেই নাও বাবা।"** বলতে বলতে **"বৃদ্ধার বলার স্বর কাঁপিয়া গেল। চোখের কোনে জল টলমল করিতে লাগিল।"** এরপর কুলিটি বৃদ্ধাকে প্রণাম করে বিদায় নেয়।

গোটা গল্পটিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের পাশে কুলিটি এক বলিষ্ঠ জীবনবোধের প্রতীক। কুলিটি শুধু কুলি হয়ে থাকেনি। বৃদ্ধার কাছে সন্তান তুল্য হয়ে উঠেছে। কারণ, বৃদ্ধাকে ট্রেন থেকে নামানো এবং যথাসময়ে আবার ট্রেনে উঠিয়ে জায়গা করে বসিয়ে দেওয়া একজন ছেলের পক্ষেই সম্ভব। কুলিটি বৃদ্ধার কেউ নয়, অথচ বৃদ্ধার সে অশেষ উপকার করেছে, যা ট্রেনের অন্যরা করেনি বা করার কথাও ভাবেননি। তাই বৃদ্ধা কুলিটিকে সন্তানরূপে সম্বোধন করেছে। বৃদ্ধা বুকের দুধ খাইয়ে তাকে বড়ো তোলেনি ঠিক, কিন্তু সন্তানের মতো কাজ করেছে। যে সমাজে **'শিভাল্‌রি'**-র **'প্রকাশ কেবল যুবতি মেয়েদের বেলা'**, সেখানে কুলিটি এক বিশেষ সামাজিক মূল্যবোধকে তুলে ধরেছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ যখন তার মূল্যবোধ, মানবিকতাবোধ হারিয়ে ফেলছে, সেই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে বনফুল এক বলিষ্ঠ জীবনবোধের রূপ দিয়েছেন এ গল্পে, যা আমাদের চেতনার মূল ধরে ঝাঁকিয়ে দেয়।

মহৎ, চরিত্রবান মানুষের জীবন চিত্রণের পাশাপাশি বনফুল ভণ্ড মানুষের চরিত্রস্বরূপ উন্মোচনেও সিদ্ধহস্ত। **"পরিবর্তন"** গল্পে দাম্পত্য জীবনের চরম ট্রাজেডির নিষ্ঠুর বর্ণনা দিয়ে ভণ্ড পুরুষের ঠুনকো দাম্পত্য প্রেমের চিত্র নির্মম দৃষ্টিতে রূপায়িত করেছেন। গল্পটি এরকম—

হরিমোহনের স্ত্রী সরমা পতিব্রতা নারী। হরিমোহনের যক্ষ্মা হয়েছে জেনে তার পতি সেবার কোন ত্রুটি রাখে না। দিনরাত পতিসেবা সত্ত্বেও হরিমোহন মৃত্যুর দিকে ধীরগতিতে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে চলেছে। সরমা যেদিন বুঝতে পারল যে তার স্বামীর বাঁচার সম্ভাবনা কম, তখন সরমা চরিত্রের এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। **'সরমা হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট দুধ'** পান করে।

যক্ষ্মা রোগীর এঁটো খাওয়া বিপজ্জনক ভেবে গল্প-কথক ডাক্তার সরমাকে সতর্ক করে দেয়। সবকথা শোনার পর সরমা গল্প-কথক ডাক্তারবাবুকে বলে— **"উনি যদি না বাঁচেন আমার বেঁচে লাভ আছে কোনও? ছেলে-মেয়েও একটা যদি থাকত তা হলেও বা কথা ছিল।"** হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট খেতে খেতে একসময় সরমার দু'টো লাংসই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলো এবং তার মৃত্যু হল। অথচ হরিমোহন কিন্তু মরল না। ধনী হরিমোহন সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে রোগমুক্ত হল। হরিমোহন দেশে ফিরে আবার একটি বিবাহ করে। হরিমোহন অবশ্য প্রথম স্ত্রীকে ভোলেনি, ততটা হৃদয়হীন সে নয়! তাই অনেক **'খুঁজে খুঁজে সরমা নামেরই আর একজনকে'** বিয়ে করে।

পতিব্রতা স্ত্রীর জীবনদানের কি অসাধারণ প্রতিদান! যে স্ত্রী নিজের জীবন স্বেচ্ছায় বিপন্ন করে ঐকান্তিক প্রেমে স্বামীর দিন - রাত সেবা করেছে, নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে, সেই স্বামী সবকিছু ভুলে স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ করে বসল! যার মরার কথা ছিল সে বেঁচে গেল, যাঁর বেঁচে থাকার কথা ছিল সেই মরে গেল। হরিমোহনের জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে, সে আবার বিবাহ করেছে, পাত্রী পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু নাম পরিবর্তন হয়নি। আর পরিবর্তন হয়নি হরিমোহনের চরিত্র। আমাদের সমাজে এমন হরিমোহনের অভাব নেই। বনফুল হরিমোহনের জীবনচিত্রে সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। বনফুল ছিলেন সুস্থবোধ সম্পন্ন জীবন-শিল্পী। তাই তাঁর গল্পে অন্তহীন জীবন বৈচিত্র্য যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি ফুটে উঠেছে তার অন্তঃ প্রবেশী নিরপেক্ষ দৃষ্টি, যাতে গল্পগুলি আরো অনুভবতায় গভীর হয়ে উঠেছে। বনফুলের গল্পভাবনার বলিষ্ঠ অভিজ্ঞান সেখানেই। আসলে জীবনে বাঁচার তো একটা অবলম্বন চাই। সরমার সেই অবলম্বন ছিল তার স্বামী, কারণ তাদের কোন সন্তান ছিল না। তার জীবনের এই নিঃসঙ্গতাবোধ থেকে সরমা হরিমোহনের উচ্ছিষ্ট খায় আর হরিমোহন বাঁচার জন্য, জীবন উপভোগ করার জন্য সুইজার ল্যাণ্ডে পাড়ি দেয় অসুখ সারাতে, সারিয়ে জীবনের অবলম্বন হিসেবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করে সরমা নামের অন্য এক নারীকে। হরিমোহনের পত্নীপ্রেম নেই, আছে আত্মপ্রেম, আর সরমা প্রেম তা ছিল না, যখন বুঝেছিল তার স্বামীর বাঁচার সম্ভাবনার কম। সরমার পতিপ্রেম ছিল নিখাঁদ। হরিমোহনের ছিল ভণ্ড পত্নিপ্রেম। হরিমোহন আত্মসুখপরায়ণ স্বার্থপর শ্রেণীর মানুষ।

বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের সংকট কত জটিল আকার ধারণ করেছিল তার পরিচয় আছে **"বেচারামবাবু"** গল্পে। নিজের জীবন যেখানে টেকানো দায়, সেখানে সংসারের চাহিদা পূরণ করা যে সে সময় কত অসাধ্য ব্যাপার ছিল তা বেচারামবাবুর জীবন চিত্রে বুঝে নিতে পারি।

নিম্নমধ্যবিত্ত বেচারামবাবু সংসারের সকলের চাহিদা মেটাতে গিয়ে ঋণে জর্জরিত। দু'দণ্ডেন্ডর শান্তি নেই তার মনে। উপরন্তু রয়েছে তার স্ত্রীর কটাক্ষপূর্ণ অবুঝ মন্তব্য। সংসারে দায়িত্ব কর্তব্য থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়নি বেচারাম, নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছে যতটা

সম্ভব সংসারের সকলের চাহিদা মেটাতে। পাঁচকন্যা, দুই পুত্র নিয়ে মোট সাতজনের সংসার। মুদিখানার দোকানে দেনা, বিবাহিতা কন্যার শ্বশুর বাড়ির দাবি, আরেক কন্যার পণের জন্য বিয়ে দিতে পারছেন না। স্ত্রী হরিমতিরও নানা সাংসারিক চাহিদা মেটাতে মেটাতে সর্বশান্ত বেচারামবাবু। সংসারের হাজারো অভাবের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে বন্ধু - বান্ধবদের সঙ্গে গল্পের আসরে নিজেকে ডুবিয়ে দেন। কিন্তু তবুও পরিত্রাণ আছে কী? রাতে শুতে গিয়ে দেখলেন **'ছেলে-মেয়েরা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতেছে'**। কারণ জানতে চাইলে স্ত্রী বললেন— **"শীত পড়ে গেছে কারো গায়ে একটা জামা নেই। লেপটাও ছিঁড়ে গেছে। সেই পাঁচ বছর আগে করানো হয়েছিল, ছিঁড়বে না আর! তোমাকে তো বলে বলে হার মেনেছি। কি আর করব বল?"** বেচারা বেচারাম কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। **"শুধু টেবিলের উপর আলোটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মোমবাতিটা পুড়িয়ে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।"**

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই মোমবাতির মত কেরাণী বেচারামের জীবনীশক্তিটাও নিঃশেষিত হয়ে চলেছে প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামে। অর্থনৈতিক নিগ্রহে বেচারাম বাবুর জীবন বিপর্যস্ত। সংসারের হাজারো অভাব মেটাতে গিয়ে দিশেহারা বেচারামের তাই গল্পের আসরে ডুব দিতেই হবে। নচেৎ সংসারের হাজারো প্রশ্নের মুখে কোন উত্তর খুঁজে না পেতে পেতে একদিন বেচারাম যে হারিয়ে যাবে!

"বুধ্‌নী" গল্পে রূপায়িত হয়েছে প্রেমোন্মত্ততার এক বিকৃত রূপ, যা জীবনের এক বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রকটিত হয়েছে। আপাত ভালো মানুষের অন্তরালে এক বন্য মানুষের আত্মপ্রকাশ। মানুষ আর পশুতে পার্থক্য বিচার বুদ্ধিতে, চেতনায়, সংস্কৃতিতে, উন্নততর জীবনভাবনায়, নিঃস্বার্থ প্রেম প্রীতিতে। কিন্তু জৈব প্রবৃত্তিতে মানুষ আর পশুতে কোন প্রভেদ নেই। **'বুধ্‌নী'** গল্পে বর্বর জীবনের এক বিচিত্র প্রণয়লীলা রূপায়িত হয়েছে, যা জৈবপ্রবৃত্তি তাড়িত।

গল্পটি সংক্ষেপে এরকম— হাজারীবাগের পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসী সাঁওতাল বিল্টু ভালোবেসে বিয়ে করেছিল **'নিকষ কালো কৃশাঙ্গী কিশোরী'** বুধ্‌নীকে। অবশ্য তার জন্য কঠিন জীবন সংগ্রামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় বিল্টুকে। প্রাণ সংশয় করে জিতে নিতে হয় বুধনীকে। সহজ স্বাভাবিক ছন্দে তাদের বিবাহিত জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল। সেখানে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার কোন কমতি ছিল না। **"বিবাহের পর বিল্টু বুধ্‌নিকে একদণ্ড ছাড়ে নাই। এক দণ্ডও নয়। বনে, জঙ্গলে, পর্বতে, গুহায় এই বর্বর দম্পতি অর্ধনগ্ন দেহে অবিচ্ছিন্নভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইতো।" "কিন্তু সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। বুধ্‌নী এক সন্তান প্রসব করিল। অসহায় ক্ষুদ্র এক মানব শিশু। বুধ্‌নীর সে কি আনন্দ! বর্বর জননীরও মাতৃত্ব আছে, তাহারও অন্তরের লিপ্সা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধ্‌নী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল। বিল্টু দেখিল— একি! বুধনীকে দখল করিয়া বসিয়াছে শিশুটা! বুধনীতো তাহার আর একার নাই। অসহ্য!"** এর পরেই বিল্টু হত্যা করে শিশুটিকে,

যার জন্য তার ফাঁসির আদেশ হয়। কিন্তু **"সে মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত চিৎকার করিয়া গেল— বুধ্‌নী— বুধ্‌নী— বুধ্‌নী! ভগবানের নামটা পর্যন্ত করিল না।"**

সাধারণ সভ্য সমাজের দৃষ্টিতে বিল্টুর এই আচরণ কিন্তু অস্বাভাবিক, বিকৃত মস্তিষ্কজাত মনে হতে পারে, কিন্তু বিল্টুর প্রেমের মহত্ব সেখানেই প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের চোখে বিল্টু খুনী বলে মনে হলেও প্রেম নিষ্ঠায় সে একক অপরাজেয় সত্তা। তাই সে বুধনীর মাঝখানে দ্বিতীয় কাউকে সহ্য করতে পারেনি। এমনকি তার নিজের সন্তানকেও না। ভালোবাসার গভীরতা কখনো কখনো অসহিষ্ণু অধিকার বোধে পরিণত হয়। বিল্টুর ভালোবাসা সেই গোত্রের। অধিকার স্পৃহার নিমর্ম উন্মত্ততায় বুধ্‌নীকে একান্ত নিজের করে ধরে রাখতে চায় বিল্টু। তাই সেই অপ্রতিরোধ্য একরৈখিক প্রেমের মধ্যে অন্য কেউ এসে স্থান দখল করে বসুক, তা বিল্টু মেনে নিতে পারেনি। তাই হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হয়ে সে নিজের সন্তানকে বিনা দ্বিধায় হত্যা করে বসে। এতে তার কোন আত্ম -অনুশোচনা নেই, গ্লানি নেই, অন্যায় বোধ নেই, পাপ-পুণ্য বোধ নেই। কারণ তার কাছে বুধনী ছাড়া আর সবকিছু তুচ্ছ। প্রাণ সংশয় বাজিতে জিতে সে বুধ্‌নীকে পেয়েছে। বিল্টু বুঝেছে যতদিন ঐ শিশু বুধ্‌নীর কোল জুড়ে থাকবে, ততদিন বুধনীকে ফিরে পাবার আশা তার নেই। তাই আত্মজনকে হত্যা করতেও এতটুকু মনে বাধে নি তার। এ মানসিকতা সভ্য সমাজে পাগলামি বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু জঙ্গলের এই- ই নিয়ম। জংলী বিল্টু সেই নিয়মকে অনুসরণ করেছে মাত্র। ফাঁসির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিল্টু শুধু বুধ্‌নী বুধ্‌নী বলে চিৎকার করে গেছে। আসলে **"নারীও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ যুগ, সমাজ, সময় ভেদে এক ও অবিচ্ছিন্ন। কিশোরী বুধ্‌নীকে দেখে ধনুকধারী বিল্টুর কামনা ও তাকে তাড়া করার পেছনে নিকৃষ্ট ধরনের আদিরস ও অশ্লীলতা ফুটে উঠলেও বিশ্বজনীন প্রেম কথার এটাই মূল কাঠামো। সভ্য সমাজে উপকরণ ও পদ্ধতির প্রভেদ আছে কিন্তু স্থূল মৌল আবেদনের কোন প্রকার নেই।"**[১৬] নিষ্ঠুর নিয়তি সভ্যতার হাত ধরে বিল্টুর চিৎকার স্তব্ধ করে দিলেও সহৃদয় পাঠক আজও যেন দেখতে পান তীব্র হাহাকার, শুনতে পান বিল্টুর করুণ আর্তনাদ।

বনফুল সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন-ভাবনা অনুসারী ছিলেন, উচ্ছলতাকে তিনি মনে প্রাণে মেনে দিতে পারেন নি। যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মে বনফুল আস্থাশীল। যৌবনের উচ্ছলতা, উদ্দামতা, সীমালঙ্ঘন, বিড়ম্বনা, গতিপ্রাণতার প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল, কিন্তু যে যৌবনের আচরণ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, সেই অসংযমী যৌবনধর্মকে বনফুল সমর্থন করেননি কোনদিন। তীব্র কশাঘাত হেনেছেন সেই অসংযমী আচরণের প্রতি। যার নিদর্শন মেলে **"জৈবিক নিয়ম"** গল্পে।

রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে রোগা গোছের একটি উনিশ -কুড়ি বছরের ছেলে যৌবনের সনাতন মনোবৃত্তির তাড়নাতে এমন সব আচরণ করছিল যাতে লেখকের প্রথমে মনে হয়েছে জৈবিক নিয়ম অনুসারে যৌবনের ধর্মই এই। **"প্ল্যাটফর্মে সর্বসুদ্ধ জনচারেক যাত্রী ছিল। তার মধ্যে দু'জন সাঁওতাল, একজন ঐ ছোকরা আর একটি মেয়ে। ছেলেটি প্ল্যাটফর্মে এমন সব আচরণ**

করছিল যাতে মেয়েটি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়।" ট্রেনে মোট বইবার ভাড়া এত বেশী কেন, ট্রেন এত লেট কেন, এনিয়ে এত জোড়ে জোড়ে ছেলেটি কথা বলছিল, যাতে তরুণীর দৃষ্টি তার প্রতি নিবদ্ধ হয়। ছোকরাটি মেয়েটির সামনে খানিকক্ষণ পদচারণা করল। তারপর শিশ্ দিতে দিতে সোডা ওয়ালাকে ডাকল, সোডাটি এমনভাবে পান করছিল, যে সোডা পান করাটাও যেন একটা বীরত্ব। তারপর চানাচুরওয়ালাকেও অকারণে কটূক্তি করল, যদিও চানাচুর কিছু কিনল। এসব বাহাদুরীর লক্ষ্য ওই তরুণী। বলা বাহুল্য, সেই তরুণীও সেই ছোকরাকে দেখছিল, চোখাচোখিও হতে লাগল। চানাচুর কিনে ছোকরাটি মেয়েটিকে খেতে অনুনয় করল, মেয়েটি লজ্জিত হলেও খেল। কথাবার্তায় মেয়েটি পরের ট্রেনে যাবে জেনে ছোকরাটি আবার তার সামনে **'বুক চিতাইয়া উন্নত মস্তকে অকারণ পুলকে বেশ খানিকক্ষণ পদচারণা করিল।'** তারপর ছোকরাটি অকারণে গায়ের পেশীগুলো ফুলোতে লাগল, একটু শিস্ দিল, প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুল পারার চেষ্টা করতে লাগল, কিছু ফুল পেরে মেয়েটির কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে ট্রেন চলে এসেছে প্ল্যাটফর্মে। ছোকরা গাড়িতে উঠে জিনিসগুলো ঠিকঠাক রেখে আবার নেমে আসল, তরুণীটির পানে একবার চেয়ে দেখল, **'দেখিল তরুণীও তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।' "ট্রেন ধীরে ধীরে চলিতে শুরু করিল। তখনও ছোকরা ট্রেনে উঠে না। ট্রেনের গতিবেগ যখন বেশী বাড়িয়াছে তখন সে শেষ বাহাদুরিটা দেখাইবার জন্য হাস্যমুখে মেয়েটিকে নমস্কার করিয়া চলন্ত ট্রেনে লাফাইয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষনাৎ পা ফসকাইয়া একেবারে নীচে—চাকার নীচে পড়িয়া গেল। আর কিছু করিবার সুযোগ পাইল না।"**

ছোকরাটির যাবতীয় বাহাদুরী দেখানোর পেছনে ছিল ঐ মেয়েটি। ছোকরাটি নিজের পৌরুষ প্রতিপন্ন করতে চাইছিল মেয়েটির সামনে। ছোকরাটির অসংযত যৌবনই তাকে এসব করতে যেন অস্থির করে তুলেছিল। তাই বেহিসাবী যৌবন উন্মাদনা তার করুণ পরিণাম ডেকে আনল। **'বাহুল্য ও আতিশয্যে'** যৌবনের ধর্মের সহজ প্রকাশ ঘটলেও তার নিয়ন্ত্রণও প্রয়োজন, নচেৎ তা জীবনহানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যেমনটি ছোকরাটির হয়েছে। বনফুল যৌবনের এই অনিয়ন্ত্রিত উদ্দামতাকে কোন দিনই সমর্থন করেননি। আসলে যে বয়সের ধর্ম তা অনুধাবন ও নিয়ন্ত্রিত করার মত ক্ষমতাও তাদের থাকে না সবার, যাদের থাকে তারা সঠিকপথে জীবনকে পরিচালিত করতে পারে, আর যাদের তা থাকে না তারা ঐ ছোকরার মত **'পা ফসকাইয়া'** ধ্বংসের মুখে, মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

অন্ধ বিশ্বাস আর কুসংস্কারের বশে মানবজীবনের চরম দুর্ভোগের কথা রূপায়িত হয়েছে **"দিবা-দ্বিপ্রহর"** গল্পে। গল্পটিতে সাপের ওঝার প্রতি মানুষের মূঢ় আস্থাকে বনফুল হাস্যরসিকতার মধ্য দিয়ে ধিক্কার দিয়েছেন।

দিবা-দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রোদের মধ্যে লোকের ভীষণ ভীড় কারণ হারু ঘোষের মেজ ছেলে ন্যাপলাকে যে গোখুরে সাপটি সকালে কামড়েছিল, তাকে ইঁটের গাঁদা থেকে বের করে বিশুবাগ্‌দী

বল্লমের আগায় বিঁধে রেখেছে। দূরে এক ব্যক্তি গাছতলায় বসে ছাতু খাচ্ছিল। সে ভিড়ে যোগদান করেনি। খানিক পরে সেই আগন্তুক এমন আচরণ করে এবং কথাবার্তা বলে যাতে সকলের ধারণা হয়, ঐ ব্যক্তি যথার্থ গুণী ওঝা। আগন্তুক বলল, **'পায়ের বাঁধন খুলে দাও।'** পায়ের বাঁধন খোলা হল। তারপর বলল, **'সাপটাকে ছেড়ে দাও।'** বিশুবাগদী বলল, **'ফের যদি ছটে গিয়ে কামড়ায় কাউকে?'** আগন্তুক বলে, **"কামড়াবে? আচ্ছা আমি ধরছি, খুলে নাও তুমি বল্লম। কামড়াবে? চালাকি নাকি?"** নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়ে আগন্তুক সাপটিকে ধরল, **'ধরিবামাত্র সাপটি সগর্জনে তাহার ডান হাতে একটা ছোবল বসাইয়া দিল।'** এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে আগন্তুক বাম হাতে সাপটিকে ধরে গর্জন করে উঠল, তারপর বল্লম খুলে নেওয়া হল। সাপটি আগন্তুকের বাম হাতেও কামড়ে দিল। তখন আগন্তুকের মুখে অদ্ভুত হাসি। অট্টহাস্যে চতুর্দিকে কাঁপিয়ে তুলল। সাপটিকে আগন্তুক বলল, **'রাগ করছ কেন, চাঁদ, চুমু দাও একটা আমাকে।'** সাপটি তৎখণাৎ ওঝার গণ্ডদেশে দংশন করল। সন্ধ্যার পূর্বে দেখা গেল, **"হারু ঘোষের মেজ ছেলে এবং আগন্তুক উভয়েরই মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া রহিয়াছে। সাপটা নাই।"** তারপর দারোগা এস আগন্তুককে চিনতে পেরে বললেন **'একেই তো আমরা খুঁজছি।'** শোকার্ত হারু ঘোষ দারোগার কাছে আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাইলে দারোগা বলেন— **"এ একটা পাগল। পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে।"**

প্রকৃত পরিচয় না জেনে অন্ধ বিশ্বাসের বশে জীবনে কতবড় সাংঘাতিক অঘটন ঘটতে পারে **'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'** তা এ গল্পে দেখিয়েছেন। যাকে এতক্ষণ সকলে ভেবেছিল মস্তবড় ওঝা, পরে জানতে পারল যে, সে পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে আসা একটি পাগল।

বনফুল সুস্থ -শুদ্ধ জীবন -প্রত্যয়বাদী শিল্পী। তাই জটিল সংগ্রামের আবর্তে মানুষের জীবন যখন হাঁসফাস করছিল, সেই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে এক আদর্শ জীবনবোধকে অন্বেষণ করেছেন তাঁর গল্পে । তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ আদর্শ জীবনবোধের সঙ্গে রূঢ় বাস্তবের সংঘাত সৃষ্টি হলেও তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রত্যয়বাদী শুদ্ধ আদর্শ জীবনবোধকেই শেষ পর্যন্ত জয়ী করেছেন। সমকালীন বৈনাশিকতার কাছে তাঁর শিল্পীমন কখনো পরাজয় স্বীকার করেনি, আত্মসমর্পণ করেনি। বনফুলে সেই সুস্থ -বলিষ্ঠ জীবন বোধের এক শিল্পীত রূপলাভ করেছে **"খুড়ো"** গল্পে।

'খুড়ো' গল্পের কাহিনীটি সংক্ষেপে এরকম— নানা সদগুণের অধিকারী খুড়োর সংসারে নিত্য অভাব -অনটন। কারণ, নবাব গঞ্জের জমিদার বাবু যতদিন বেঁচেছিল ততদিন তাঁর নানা সদগুণের জন্য তাঁকে যথেষ্ট খাতির করতেন। জমিদার প্রদত্ত পাঁচবিঘা লাখেরাজ জমি চাষ করে খুড়োর গ্রাসাচ্ছাদন চলত, এমনকি অন্যান্য অভাবও মিটত। কিন্ত জমিদার বাবুর মৃত্যু হওয়ায় তার আধুনিক পুত্রের এ জাতীয় বাজে খরচ পছন্দ না হওয়ায় আত্মসম্মানী খুড়ো জমিদার বাড়ি যাতায়াত বন্ধ করে দিল। অভাব তার সংসারে এখনো নিত্যসঙ্গী। শত অভাবের মধ্যেও খুড়োর

মধ্যে এমনকি একটি ছেলেমানুষি স্বভাব ছিল, যার জন্য বৃদ্ধ খুড়ো গ্রামের সকলেরই প্রিয় ছিল। সংসারে সীমাহীন অভাব সত্ত্বেও খুড়োর মনে কখনো প্রফুল্লতার অভাব ঘটেনি। মুখে এক টুকরো অদ্ভুত হাসি নিয়ে সে খুড়িমার সমস্ত সাংসারিক অভিযোগকে অদ্ভুত উদাসীনতায় উড়িয়ে দিত। সংসারের অভাব মেটানোর চেয়ে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে **'মহা উৎসাহে'** গুলি খেলতে খুড়োর বেশী আনন্দ। ঘরে একখানা ভাল লেপ-তোষক নেই সে সামনের শীত কাটবে। তিন বছর যাবৎ বলতে বললে। **'লেপ-তোষক সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ঘুচাইতে পারেন নাই'** খুড়িমা। খুড়িমার তীব্র ভর্ৎসনা, অভিযোগ-অনুযোগ শোনার পর পাড়ার কিছু হিতেষী ছেলে কুড়ি টাকা চাঁদা তুলে খুড়োকে শহরে পাঠালেন লেপ-তোষক কিনে আনার জন্য। কিন্তু শহর থেকে খুড়ো ফিরে আসার পর গল্পকথক ভাবলেন কিরকম লেপ-তোষক কিনেছে তা দেখে আসা যাক। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই গল্পকথক শুনতে পেলেন, **'খুড়িমা তারস্বরে চিৎকার করিতেছেন।'** আগ্রহ সহকারে গল্পকথক খুড়োর বাড়ির দিকে এগোলেন। **"বাড়িতে ঢুকিতেই খুড়ো হাসিয়া বলিলেন—দেখ তো ভাই— জিনিসটা ভালো হয় নি? আঠারো টাকায় এমন জিনিস কি পাওয়া যায়, দেখি— খুড়ো সেতার হাতে বসিয়া আছেন।"**

এই খুড়ো আসলে আনন্দবাদী জীবনশিল্পী। যিনি হাজারো অভাব অনটনের মধ্যে মনের সহজ সুন্দর বৃত্তিগুলিকে মেরে ফেলেননি। খুড়ো চরিত্রের এই জীবন পিপাসা যেন বনফুলেরই অন্তরসত্তার একখণ্ড প্রকাশ। আসলে খুড়ো সৌন্দর্য্য সন্ধানী। তাই রূঢ় বাস্তব জীবনের আবর্তে পরে খুড়ো যেখানে লেপ-তোষক বানাতে পারছে না তিন বছর ধরে, পাড়ার হিতৈষীরা লেপ-তোষক বানানোর জন্য টাকা যোগাড় করে দিলেও সেই টাকায় সে কিনে আনে একটি সেতার। যে সেতারের সুরে জীবনের হাজারো অভাবের কথা অনায়াসে ভুলে থাকা যায়, এক সুন্দর অনুভূতির জগতে পাড়ি দেওয়া যায়। খুড়ো আসলে সেই সুস্থ, শুদ্ধ, সুন্দর জীবন-সন্ধানী শিল্পী-মানুষ।

ব্যক্তিমানুষের ভণ্ডামীর প্রতি বনফুল যেমন খড়গহস্ত হয়েছিলেন, তেমনি সমাজের পচনশীল মানসিকতাকে তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। সমাজের দোষত্রুটি, স্বভাব, স্বরূপ তিনি অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। সামাজিক অধঃপতনের তেমনি এক নির্লজ্জ উলঙ্গরূপ **"সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ"** গল্পে উন্মোচিত করেছেন।

গল্পটি এমন — সনাতনপুরের প্রবীণ মোক্তার শৈলেশ্বর বাবু হঠাৎ নিরুদিষ্ট হওয়ায় গ্রাম সুদ্ধ তুমুল উত্তেজনা ও নানা কুৎসিত আলোচনার শুরু হয়েছে। কারণ — **'শ্যামা নাম্নী ধোপানীটিও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিতা হইয়াছেন।'** প্রত্যেকরই ধারণা যে, শৈলেশ্বরবাবুর স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থাকা সত্ত্বেও সেই ধোপানীর সঙ্গে তার কোন অবৈধ সম্পর্ক ছিল, যার দরুণ এই বৃদ্ধ বয়সে শৈলেশ্বরবাবুর এই চরিত্রচ্যুতি। সকলেই যে-যার মতো নানা কৌতুককর কুৎসা রটিয়ে চলল, এমন কি গ্রামসুদ্ধ সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠল। নানা জনে নানা তথ্য সংগ্রহ করতে

লাগল, খোঁড়া মল্লিক মহাশয় কৌশলে খবর নিয়ে জানতে পারলেন, শ্যামা ধোপানীর স্বামী পিরু ধোপার কাছে কাল মার খেয়েছে। পাড়ার লোকজনের আরো সন্দেহ হল, এর পরেই তারা আত্মগোপন করেছে। বৃদ্ধ গোস্বামী মহাশয় তো বলেই ফেললেন, **'পাঁড়-ঘুঘুটি এইবার ফাঁদে পড়েছেন!'** গ্রামের প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরূদ্ধে উত্তেজনার বশে অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়ে পড়লেন এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। **'অচিরকালের মধ্যে শৈলেশ্বরবাবুকে কেন্দ্র করিয়া ভাদুড়ি মহাশয়ের বিরূদ্ধে রায় মহাশয়ের, রায় মহাশয়ের বিরূদ্ধে মুকুজ্জে মহাশয়ের, মুকুজ্জে মহাশয়ের বিরূদ্ধে গাঙ্গুলী মহাশয় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন।'** গ্রামের এমন চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতিতে গ্রামে দু'টি ঘটনা ঘটল — এক. শ্যামা ধোপানী হঠাৎ গ্রামে ফিরে আসল, জানা গেল, সে তার মামার বাড়ি গিয়েছিল, পিরুর সঙ্গেও তার কোন কলহ নেই। দুই. **'শৈলেশ্বর মোক্তার আর ফিরিলেন না। কারণ তিনি মারা গিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া নয়,কূপে পড়িয়া। গ্রামের একটা অব্যবহৃত এঁদো নেড়া কুঁয়া ছিল।"** তাঁর ভিতর থেকে গলিত শবদেহটা আবিস্কার করেছেন মল্লিক মহাশয়।

সমগ্র গল্পটিতে বনফুল গ্রামের মানুষের নগ্ন কলুষিত মানসিকতা, বিকৃত রুচির যে পরিচয় তুলে ধরেছেন তাতে সমাজের কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত - সকল শ্রেণীর মানুষের রুগ্ন মানসিকতাকে চিহ্নিত করে। সমাজের অভ্যন্তরে এই ব্যাধির স্বরূপ রূপায়ণ সত্যিই যেমন উপভোগ্য, তেমনি বাস্তব সম্মত।

বনফুলের সমাজ মনস্কতার আর এক বাস্তবসম্মত রূপ **"উৎসবের ইতিহাস"** গল্পে বিধৃত। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চাকুরী প্রার্থী যুবকের এক বিপর্যস্ত মানসিকতার গল্প এটি। প্রথম শ্রেণীর এম.এ. নরেন মল্লিকের তিরিশ টাকা মাইনের কেরানির চাকরি পাওয়ার জন্য কিভাবে সমাজের খোসামোদ, অনুরোধ করতে হয়েছিল, অর্থাৎ **'তেল মারতে'** হয়েছিল, তার জীবনের সেই অনপনেয় জটিলতার ইতিহাস **'উৎসবের ইতিহাস'**। এই রুগ্ন চিত্র আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তৎকালীন সমাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের রুগ্ন রূপটি।

গল্পটি এরকম — অনন্যোপায় নরেন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সাগ্রহে বিশু সান্যালকে **'তৈলাক্ত করিতেছে'**। বিশু সান্যালকে সুচারু রূপে তৈলাক্ত করার পর নরেন মল্লিক বুঝলেন যে, তার তৈলনিষেক শক্তি নিঃশেষিত হয়নি। এখনও বহু লোককে সে তৈলসুখ দিতে পারে। সুতরাং কালক্ষেপ না করে নরেন মল্লিক পরাণ সিংহের দ্বারস্থ হলেন এবং তাকে যারপরনেই তৈলাক্ত করলেন। ঘুঘু পানু মিত্তিরকেও তৈলাক্ত করলেন। কিন্তু একের পর এক ব্যক্তিকে যথাসাধ্য তৈলাক্ত করার পরও কিন্তু নরেন মল্লিকের সেই কেরানি চাকরি জোটেনি। এর জন্য নরেন মল্লিককে আরো প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। তা হল —**'নরেন মল্লিককে ঘুঘু মিত্তিরের বয়স্থা কুৎসিত কন্যাটির পানি পীড়ন করিতে হইবে।'** প্রতিশ্রুতি মত — **"সেই চাকুরী পাইয়াছে। হউক কেরানিগিরি, হউক বেতন তিরিশটাকা — চাকুরী তো!"** এই তিরিশ টাকার মাইনের শর্তসাপেক্ষ চাকরি পেয়েছে, তাই নরেন মল্লিকের পিতা প্রবীণ মল্লিকের বাড়িতে এই উৎসবের আয়োজন।

এ উৎসবের ইতিহাসের পেছনে যে ইতিহাস নিহিত তা সেকালে যেমন বনফুলকে ভাবিয়েছিল একালেও আমাদের ভাবায়। শিক্ষিত এম.এ. পাশ ছেলের জীবনে এর চেয়ে করুণতম পরিণাম আর কি হতে পারে! এ থেকে যেন পরিত্রাণ নেই বেকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের। জীবনের এমন শাশ্বত রূপ নির্মাণেই বনফুলের শিল্পী মানসের অভিজ্ঞান।

বনফুল শুধু ইহ জগতের রূপচিত্রণই করেননি, পারলৌকিক বা অলৌকিক জগতেরও স্বরূপ তুলে ধরেছেন। এই অলৌকিক রসের গল্পের মধ্যে **"অধরা"** গল্পটিতে এক নির্জন রাত্রির পটভূমিকায় প্রিয়ার সান্নিধ্য অনুভবের কথা থাকলেও শেষে তা ভ্রান্তি বলে মনে হয় গল্প কথকের। গোটাগল্পে এক অলৌকিক পরিবেশ রোমাঞ্চকর অনুভূতি জাগায়।

গল্পটি এইরকম — গল্পকথক অন্ধকারে একটা মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, **"সেও সঙ্গে ছিল না। তার অঙ্গসৌরভ বলয়-নিক্কণ, নিঃশ্বাসের মৃদু শব্দ সমস্তই অনুভব"** করেছিলেন কথক। কথকও তার অশরীরী অনুভূত প্রিয়ার সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা বলে চলেছেন। কথকের মনে হচ্ছিল **'শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাচ্ছে।'** কথক যেন যুগ যুগ চেয়ে ফিরেছেন তাঁর অন্তরে অনুভূত প্রিয়াকে। তাই তার প্রশ্ন —**'এত করে চাইছ যদি নিচ্ছ না কেন?'** কথক উত্তর দিলেন - **'ধরা দিলে কই?'** কথক **'ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকে'** প্রিয়াকে অনুভব করতে চান। কিন্তু তার প্রিয়া সেখানে ধরা দেয় না। এরপর **'দ্রুততর হয়ে উঠল তার নিঃশ্বাস। মনে হল খুব কাছে সরে এসেছে ..... তার চোখের জল গালে পড়ল'** কথকের তা **'বরফের মত ঠাণ্ডা'** মনে হলো। সহসা সচেতন হয়ে কথক দেখলেন বৃষ্টি পড়ছে। কথক বাড়ির দিকে চলেছেন, **"সেও চলেছে। মুষলধারা নামল। ছুটছি..... সেও ছুটছে সঙ্গে সঙ্গে! সহসা অতিশয় কাছে এসে পড়ল যেন..... তার ভিজে শাড়ির স্পর্শ "** পেলেন যেন কথক। পাশাপাশি ছুটে চলেছেন, নির্জন অন্ধকার পথ পেরিয়ে দ্রুতপদে বারান্দায় উঠলেন, **'সেও উঠল।'** কথক ঘরে ঢুকলেন, **'সেও ঢুকল'**। লাইটের সুইচ টিপতেই তীব্র আলোয় চতুর্দিক ভরে উঠল। কথক দেখলেন — **'কেউ নেই'**।

গল্পের এই রহস্যময় পরিবেশ পাঠকের মনে রোমাঞ্চ জাগায়। গল্প কথকের অবচেতন মনের এই বিশেষ অনুভূতি গল্পে অলৌকিক বাতাবরণ তৈরী করেছে। **'সে'** এখানে গল্পকথকের অনুভূত অশরীরী প্রিয়া? না নির্জন প্রকৃতি চেতনতা? না প্রবহমান কালচেতনা? না বনফুলের **'ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়লোকে'** অনুভূত আত্মা? মনে হয়, এ বনফুলের অতীন্দ্রিয় দিয়ে চিরন্তন কাল প্রবাহকে ধরার, অনুভব করার প্রচেষ্টা। যা যুগ-যুগান্তর ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে চলেছে। এই কাল প্রবাহ অখণ্ড, অনন্ত, তাকে ধরা সম্ভব নয়, তা অধরা।

উক্ত গল্পের বিষয়বস্তুগুলি থেকে আমরা একটি কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি — বনফুলের ছোট গল্পের বিষয়বস্তু অফুরান, কোন একটি বিষয়ের অনুবর্তন ঘটেনি। তাঁর গল্পের বিষয় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল – সর্বত্র প্রসারী। এ বিষয়ে বনফুলে অন্তরঙ্গ বন্ধু পরিমল গোস্বামী লিখেছেন

— "তোমার কল্পনা শক্তি বহু বিস্তারী। স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল ঘুরে আসা তোমার এক নিঃশ্বাসের ব্যাপার। তুমি যা দেখেছ ,যা শুনেছ তার মধ্যে যেখানেই চিত্রধর্মীতা আছে তাকে তুমি বেঁধে ফেলেছ গল্পের চেহারায়।" বস্তুতপক্ষে বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়বস্তুর পরিধি কোন একটি বিশেষ মাত্রায় সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয়, তার জন্য তাঁর সমগ্র ছোটগল্পই পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এখানে বনফুলের সেই বিপুল-বিচিত্রস্বাদী ছোটগল্পের কিঞ্চিৎ স্বাদগ্রহণ করা গেল। আসলে বনফুলের মানব জীবন সম্পর্কে প্রতিরোধ্য সদা-অন্বিষ্ট কৌতূহল ছিল। সারা জীবন ব্যাপী তিনি বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন, মানব জীবনের বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন, যা তাঁর গল্পে বিচিত্র স্বাদের অনুভব নিয়ে এসেছে। তাছাড়াও বনফুল নিজেও ছিলেন বৈচিত্র্য লিপ্সু। তিনি সব সময় **'নতুন কিছু'** লেখার তাগিদ অনুভব করতেন। এক সময় তিনি দুই পুত্রের পড়াশোনা, দুই কন্যার বিবাহ ও গাড়ি-বাড়ি কেনার জন্য বিভিন্ন সময় কিছু প্রকাশকের কাছে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন, আর সেই ঋণ পরিশোধের জন্য অবিশ্রান্ত ধারায় তিনি লিখে গেছেন। তবে আবোল-তাবোল কিছু লিখে ঋণশোধের চেষ্টা করেননি। সবসময় **'নতুন কিছু'** লেখার প্রেরণা তাঁর মধ্যে কাজ করেছিল। এ সম্পর্কে বনফুল নিজেই বলেছেন — **"ঋণশোধ করিবার তাড়নায় আমাকে অনেক বই লিখিতে হইয়াছিল- আমি অবশ্য যাতা আবোল-তাবল লিখিয়া আমার ঋণশোধ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা আমি করি নাই। আমি প্রতিটি বইতে নূতন স্বাদ পরিবেশন করিয়া ভালো বই লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি।"**[১৭] বনফুলের লেখার প্রতি এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও বৈচিত্র্য প্রকাশের অভীপ্সা তাঁর রচনাকে বিচিত্রস্বাদী করে তুলেছে। একথা তাঁর ছোটগল্পগুলির ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। মানবজীবন সম্পর্কে সদা কৌতূহলী মনোভাব এবং জীবনব্যাপী বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সদা বৈচিত্র্য লিপ্সু মনোধর্ম তাঁর ছোটগল্পে বিচিত্র রামধনুর রং ছড়িয়েছে। চলমান জীবন স্রোতে বনফুল যা দেখেছেন তার থেকে যে জীবনসত্য অনুধাবন করেছেন, তাকে এক একটি গল্পে রূপ দিয়েছেন। এই বিষয়-বৈচিত্র্যর জন্যই তাঁর ছোটগল্প আমাদের কখনো **'বোরিং'** করে না, বরং গল্প পাঠে আরো আগ্রহ জন্মায়।

তবে শুধু বৈজ্ঞানিক মানসিকতার কারণেই নয়, মানব জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসায়, মমত্ববোধে মানুষের বিচিত্র জীবন সম্পর্কে বনফুল কৌতূহলী হয়ে পড়েছিলেন। এ তাঁর সচেতন অভিপ্রায়। যে কারণে তিনি শৈশবকাল থেকে নানা কীটপতঙ্গ, পাখীদের অনুসরণ করে বিচরণ করেছেন বনে-বাদারে, যৌবনের প্রথম পাদে ঘুরে বেড়িয়েছেন কলকাতার পথে পথে, যে নেশা তাঁর পরিণত বয়সেও অব্যাহত ছিল। এছাড়া সমাজের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে পরিচিতি তাঁর গল্পে এক বৈচিত্র্যের আস্বাদ নিয়ে এসেছে। বনফুলের গল্পের বৈচিত্র্যময় জীবন অন্বেষণ সম্পর্কে বন্ধুবর পরিমল গোস্বামী **'বনফুলের গল্প সংগ্রহের' 'প্রথম শতকের'** ভূমিকায় লিখেছেন — **"মানুষের জীবনকে তুমি চলচ্চিত্রের মতো দেখেছ। জীবনের স্রোত, বিচিত্র মানুষের স্রোত ভেসে চলেছে সম্মুখ দিয়ে, তুমি বসে আছ পাশে — তার এক একটি মুহূর্তকে টেনে তুলে এক**

একটি ছবি রচনা করবে বলে। মাছ রাঙা মাছের আশায় যেমন জল থেকে একটু উঁচু জায়গায় বসে থাকে, তেমনি। তোমার গল্প ধরা আর তার মাছ ধরার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।

তোমার হাতে এই সব জীবন অথবা চরিত্র চিত্রণ বিচিত্র, সংখ্যা অগণিত। নির্দিষ্ট পরিসরে এমন বহু বিচিত্র ছবি দেখা কম শিল্পীর ভাগ্যেই ঘটে।"[১৮]

অবশ্য বনফুল মাছরাঙার মত শুধুমাত্র বিচিত্র জীবনের ছবিই শুধু তুলে ধরেননি, তার স্বরূপ উন্মোচন ও ব্যাখ্যা করেছেন বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহ দৃষ্টি দিয়ে। অনেক সমালোচক অবশ্য বনফুলের বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রশংসা করলেও ভাবের গভীরতার অভাব লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু একথা সর্বোতভাবে ঠিক নয়। বনফুল এমন বহু গল্প লিখেছেন, যা ভাবগভীরতায় সমৃদ্ধ।

–ঃ উল্লেখপঞ্জী ঃ–

১। 'বাংলা ছোটগল্প' — শিশির কুমার দাস। দে'জ পাবলিশিং। পঞ্চম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৭। পৃ. - ১৯১।

২। 'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র' — চিরন্তন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। 'বাণীশিল্প' প্রকাশনা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৫, পৃ. -৭৫৭ - ৭৫৮।

৩। 'বনফুলের ফুলবন' — ড. সুকুমার সেন।সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ: দোল পূর্ণিমা ১৩৯০। পৃ. - ৯।

৪। 'বনফুলের উপন্যাসে পাখসাট শোনা যায়' প্রবন্ধ— মনোজ চাকলাদার। পশ্চিমবঙ্গ। ৬ ও ১৩ আগষ্ট, ১৯৯৯,বনফুল জন্মশতবর্ষ স্মরণ ক্রোড়পত্র। পৃ.-১০২।

৫। 'পশ্চাৎপট' — বনফুল (১৬ - তম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় প্রকাশ: ২রা শ্রাবণ, ১৪০৭/১৮ই জুলাই, ২০০০ পৃ. - ১৯৫।

৬। 'মর্জিমহল'— বনফুল (২৪-তম খণ্ড), তৃতীয় সংস্করণ: ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০০, পৃ. ২৭২।

৭। 'পশ্চাৎপট' — বনফুল (১৬ - তম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় প্রকাশ: ২রা শ্রাবণ, ১৪০৭/১৮ই জুলাই, ২০০০ পৃ. - ১৪।

৮। ঐ, পৃ. - ৪৭।

৯। ঐ, পৃ. - ৭৯।

১০। ঐ, পৃ. - ৭৯।
১১। ঐ, পৃ. - ১১৯।
১২। ঐ, পৃ. - ১৩৫।
১৩। 'বনফুলের ফুলবন' —— ড. সুকুমার সেন।সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ: দোল পূর্ণিমা ১৩৯০। পৃ. - ১৯-২০।
১৪। 'কালের প্রতিমা' —— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং। চতুর্থ সংস্করণ: নভেম্বর ২০০৫। পৃঃ - ১১৮।
১৫। 'কাব্যপ্রসঙ্গ' : 'শিক্ষার ভিত্তি' —— বনফুল (দ্বাদশ খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় প্রকাশ: ২৭শে আশ্বিন ১৪১০/১৪ই অক্টোবর ২০০৩। পৃ. - ৪৭৬-৪৭৭।
১৬। ' বাংলা ছোটোগল্পের ক্রমবিকাশ' —— সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়, প্রজ্ঞাবিকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২৬শে জানুয়ারী ২০০৭। পৃ.- ২৪৬।
১৭। 'পশ্চাৎপট' —— বনফুল (১৬ - তম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় প্রকাশ: ২রা শ্রাবণ, ১৪০৭/১৮ই জুলাই, ২০০০ পৃ. - ২২৫।
১৮। ' বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র'—— চিরন্তন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। দ্বিতীয় খণ্ড, বাণীশিল্প প্রকাশনা, সেপ্টেম্বর, ২০০৫, পৃ.- ৭৫১।

তৃতীয় অধ্যায়

বনফুলের ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগ

তৃতীয় অধ্যায়

"বনফুলের ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগ"

বনফুলের ছোটগল্প বিষয়ের এত বিভিন্নতা ও নিত্য-নতুনতা আছে যে, প্রত্যেকটি গল্পই স্বতন্ত্র মূল্যে বিবেচিত হবার যোগ্য। তাঁর গল্পগুলি প্রত্যেকটি এক-একটি বিভাগ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। তবু স্রষ্টার সেই বিচিত্র সৃষ্টির রূপবন্ধ সমীক্ষায় একই বিষয়ের না হলেও একই রকম প্রবণতার কোঠায় কিছু কিছু গল্পকে ফেলা যায় নিশ্চয়ই। এই অধ্যায়ে বনফুলের ছোটগল্পগুলিকে আকৃতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী ভাগ করে আলোচনা করা হবে। আকৃতি অনুযায়ী অর্থাৎ ছোট, মাঝারি ও বড়— এই তিন পর্যায়ে গল্পগুলিকে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হবে। আর প্রকৃতি অনুযায়ী অর্থাৎ রঙ্গ-ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাস্যরসের গল্প, সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ জীবনবোধের গল্প, হাসির গল্প, শিশু-কিশোরের গল্প, অলৌকিক বা অতিলৌকিক গল্প, প্রভৃতি পর্যায়ে বিন্যস্ত করে কিছু শ্রেষ্ঠ গল্পের আলোচনা করে সেই ধরনের গল্প রচনায় বনফুলের বিশেষত্ব খোঁজার চেষ্টা করা হবে। যদিও বনফুলের বিপুল বিচিত্র বিশাল বিস্তৃত সৃষ্টি সম্ভারের কাছে এ নিছক ছিটে-ফোঁটার আভাসমাত্র। তবুও এর মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পসৃষ্টির প্রবণতা ধরা পড়বে বলে মনে করি। এ পর্যন্ত বনফুলের ৫৮৬টি গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত 'বনফুল রচনাবলী'-তে ৫৭৮টি গল্প পাওয়া যায়। বাকি ৮টি গল্প সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই মুদ্রিত থেকে গেছে।[১] বনফুলের পুত্র চিরন্তন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'বাণীশিল্প' প্রকাশনা (দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৫) বনফুলের 'বিশুদ্ধ ছোটগল্পগুলি' নিয়ে (যদি ও তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে) দু'খণ্ডে 'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র' প্রকাশ করেন, যাতে ৫৬০টি গল্প আছে। আয়তন ভিত্তিক অর্থাৎ 'ছোট' 'মাঝারি' ও 'বড়' মাপের গল্পের যে হিসেব আমি নিয়েছি তা নিম্নরূপ। তবে **'ছোট'** আকৃতির গল্পের মধ্যে সেই গল্পগুলিকে রেখেছি, যেগুলি এক থেকে দুই পৃষ্ঠার মধ্যে। **'মাঝারি'** আকৃতির গল্পের মধ্যে সেইগল্পগুলিকে রেখেছি, যেগুলি দুই পৃষ্ঠা থেকে বেশি পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে। আর **'বড়'** আকৃতির মধ্যে সেই সব গল্পকে রেখেছি যেগুলি পাঁচ পৃষ্ঠা বা তার উপরে। তাতে এক থেকে দু'পৃষ্ঠার মধ্যে অর্থাৎ **'ছোট'** আকৃতির গল্পের সংখ্যা ২৫০ টির মতো, দু'পৃষ্ঠার বেশি আর পাঁচ পৃষ্ঠার কম অর্থাৎ **'মাঝারি'** আকৃতির গল্পের সংখ্যা ২৮৩টির মতো, আর পাঁচ পৃষ্ঠা বা তার উপরের অর্থাৎ **'বড়'** আকৃতির গল্পের সংখ্যা ৪৫টি মতো। **'মতো'** বলার কারণ বনফুলের সমস্ত গল্পের সন্ধান আমরা পাইনি, বিশেষতঃ যেগুলি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত থেকে গেছে। তাই এই হিসেব একটু- আধটু এদিক-ও দিক হতে পারে। আর পৃষ্ঠার হিসেবেও **'ছোট'** আকৃতির গল্পগুলির দু'একটি ক্ষেত্রে দু'পাতা অতিক্রম করে একটি বাক্য তৃতীয় পাতায় পড়লেও সে গল্পগুলি **'ছোট'** আকৃতির গল্পের মধ্যেই রেখেছি। তবে দু'পাতা অতিক্রান্ত হয়ে এক দু লাইনের বেশি আয়তনের গল্পগুলি **'মাঝারি'** আকৃতির গল্প রূপে গণ্য করা হয়েছে। এই আকৃতি মধ্যে আড়াই পাতার গল্প অনেকগুলি আছে।

যাইহোক, উপরে উল্লিখিত হিসেব থেকে আমরা মোটামোটিভাবে বুঝতে পারি কোন আয়তনের গল্পের প্রতি বনফুলের ঝোঁক প্রবল ছিল। তিনি যে **'ছোট'** ও **'মাঝারি'** আকৃতির গল্প লেখায় বেশি আগ্রহী ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। সত্যি যিনি 'স্থাবর' বা 'জঙ্গম' বা 'ডানা'র মতো সুবৃহৎ উপন্যাস লিখেছেন সেখানে বহু চরিত্র, বহু ঘটনা অনায়াসে স্থান লাভ করেছে, তিনি কতটা সংযমী হলে এক পাতার মধ্যে গল্প লিখতে পারেন, তা আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। আসলে বনফুল ঐ আকৃতির গল্পগুলিকে একটি স্বতন্ত্র Art Form হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন।

যদিও এই আকৃতির গল্প রচনার প্রচেষ্টা একেবারেই নতুন নয়, কারণ, ঈশপের পঞ্চ তন্ত্রের নীতিকথামূলক গল্প থেকে শুরু করে পুশকিনের গদ্যময় পদ্য আখ্যানের এবং 'জোকস্' জাতীয় গল্পগুলির (যেগুলি লোককথার অন্তর্ভুক্ত) মধ্যে এই আয়তনের গল্প রচনার প্রয়াস ও প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তবে ঐ বিশেষ ক্ষুদ্রকায় গল্পগুলিকে নিখুঁত শিল্পমূল্যে বনফুল যেভাবে উন্নীত করেছেন; তা আর কেউ পারেন নি। বনফুলের পরেও অনেকে এধরনের অণুগল্প বা গল্পিকা লেখার চেষ্টা করেছেন তবে সেগুলি বনফুলের মতো উৎকৃষ্ট পর্যায়ের হয়ে উঠতে পারেনি। জগদীশ ভট্টাচার্য বনফুলের এই অণুগল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র প্রভাব আছে বলে মনে করেছেন। কারণ 'লিপিকা'-র প্রকাশকাল ১৩২৯ বঙ্গাব্দ (১৯২২), আর বনফুলের গল্প রচনার সূচনা তার পর থেকে। সময়কালের হিসেবে এবং আয়তনের দিক থেকেও অনুমান অসঙ্গত না হলেও আমরা বলতে পারি, রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গি, গল্পের বিষয়, চরিত্র, জীবন জিজ্ঞাসা ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র সঙ্গে বনফুলের রচনার বিস্তর পার্থক্য। বনফুল ছিলেন বন্ধুবিলাসী মানুষ। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার আসরে প্রচলিত খোশগল্প এবং তৎকালীন 'জোকস্' জাতীয় ধারার প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। তবে এ ধরনের সংযমী গল্প রচনার জন্য লেখক চরিত্রের সংযমী মনোভাব সবচেয়ে বেশি সক্রিয় বলে আমার মনে হয়। কারণ, বাইরের প্রভাব সত্ত্বেও ভিতরের শিল্পী সত্তায় যদি সংযম না থাকে, তাহলে কখনোই এ ধরনের ক্ষুদ্রাকায় গল্প রচনা সম্ভব নয়। বনফুলের এই সংযমী চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর পিতা-মাতা পরিবার-পরিজন-শিক্ষক মহাশয় প্রমুখের একটি বড় ভূমিকা ছিল বলা যেতে পারে। কারণ পিতার উদার প্রগতিশীলতার পাশাপাশি মাতার রক্ষণশীল মনোভাব শিক্ষকবৃন্দের সংযমী আচরণ ও উপদেশ একদিকে বাঁধনহারার উল্লাস, অন্যদিকে সেই উল্লাসকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বনফুলের চরিত্রে ছোটবেলা থেকে গড়ে উঠেছিল। বনফুলের এই সংযমী ব্যক্তিত্ব গল্পের কায়াগঠনেও বড় ভূমিকা পালন করেছে। মহাকাব্যোপম সুবৃহৎ বহু উপন্যাস রচনার পাশাপাশি এধরনের এক-আধ পৃষ্ঠার গল্প রচনায় তাঁর সেই চারিত্রিক সুকঠিন সংযম অতিকথনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। অথচ সেই অদ্ভুত সংযম জীবন রহস্য উন্মোচন ও ব্যাখ্যায় এতটুকুও ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি। তাঁর বক্তব্য সঠিক সুচারুরূপে প্রকাশ করার জন্য যতটুকু বলা প্রয়োজন ততটুকুই বলেছেন। অতিকথনের সেখানে অবকাশ নেই। তবে আমার মনে হয় সংযমী ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি তাঁর বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এই অতিকথনের,

আবেগের রাশ টেনেছে।

বনফুলের অভিজ্ঞতার পরিধি বিশাল। তাঁর ডাক্তারী পড়াশোনা, চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতা এবং শেষে প্যাথলজিষ্ট-এর জীবিকা তাঁকে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে এক নিরাসক্তময় অনুভূতিতে পৌঁছতে সাহায্য করেছে। এ প্রসঙ্গে বন্ধু পরিমল গোস্বামীর 'স্মৃতিচিত্রণ'-এর একটি ঘটনার কথা মনে আসে, যেখানে বৌবাজারের খাটের নীচে ফর্মালিনে মানুষের গলার নলি কেটে ভিজিয়ে রেখে পাশেই মাংস রান্না করে খাওয়ার কথা আছে। এই নিরাসক্ত মনোভাবের জন্য তাঁকে মনে হয় যেন তিনি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে চান না, একটা দূরত্ব বজায় রাখতে চান। সমালোচক পবিত্র সরকারের মতে— **"জীবনের প্রতি বিপুল এবং প্রবল আসক্তি সত্ত্বেও এই মহাকাব্যিক অভিজ্ঞতার মধ্যে একটা অনাসক্তি ও দূরত্ব যেন বেশি প্রকট। যেন এটি বনফুলের এক সচেতন অনুশীলন, তাঁর বিশেষ নির্বাচিত এক অবস্থান। এ অবস্থান প্রকাশের জন্য, শিল্পসৃষ্টির জন্য। এতে এই দূরত্বটুকু কখনও ব্যঙ্গের, কখনও কৌতুকের, কখনও আগ্রহকে অনাসক্তির ছদ্মবেশে পড়ানোর। . . .অনাসক্তিময় আবেগপ্রবণতা থেকে তিনি সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারতেন। তিনি যেন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হতে চান না, বিষয় সম্বন্ধে তাঁর কোন উচ্ছ্বাস বা আবেগ নেই, যেমন সমস্ত সম্পর্কের অন্তর্লীন কারুণ্য, নিষ্ঠুরতা, ভয়াবহতা ও বেদনা তাঁর কাছে স্পষ্ট—গল্পের শেষে সাধারণভাবে বিদ্যুৎ চমকের মতো একটি তীব্র সম্মাতে তাকে উদ্ভাসিত করে দেন। বলা দরকার, এই দূরত্বই অনেক সময় বনফুলের গল্পের আয়তনের চরিত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করে।"**[২]

এই অনাসক্তিময় দৃষ্টিভঙ্গি এবং গল্পের মিতায়তনের জন্য ঐ 'দূরত্ব'কে 'দায়ী' মনে করলেও কিন্তু আমার মনে হয় সেই দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টিতে বনফুলের সংযমী ব্যক্তিত্বই দায়ী। যার জন্য তিনি অনায়াসেই বাহুল্যকে বর্জন করতে পারেন, যেটুকু ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ তাঁর ভাব প্রকাশের পক্ষে প্রয়োজন সেইটুকু তিনি বলেন, অতিরিক্ত একটি বাক্য বা শব্দ যেন তিনি খরচ করার পক্ষপাতি নন। বনফুলের ছোটগল্পগুলি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, গল্পগুলি থেকে কোন একটি বাক্য বা শব্দ যেন বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি বাক্যই কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত। **"তাঁর লেখায় যুক্তি প্রতিভাত হয়েছে পরিশীলিত আবেগে। রোমান্টিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানচেতনার মেলবন্ধনে আমরা খুঁজে পেয়েছি এক অন্যতর সাহিত্য, যা একই সঙ্গে মনোগ্রাহী এবং যুক্তিসিদ্ধ"**[৩] বনফুল তাঁর গল্পে এমন কতগুলি বাক্যকে সন্নিবেশিত করেছেন যেগুলি গল্পের মেরুদণ্ডের মতো কাজ করেছে। বনফুলের বেশির ভাগ গল্প তিন থেকে সাড়ে তিন পাতার মধ্যে শেষ। এই মিতায়তন গল্পের ঘটনাগুলি যেন অতিকথন বর্জন করে ধাপের পর ধাপ লাফিয়ে লাফিয়ে চলে সমাপ্তিতে এক এমন অনির্বচনীয়তায় ঝাঁপ দেয় যা বৃহত্তর জীবনসত্যের মুখোমুখি দাঁড় করায়। বনফুলের এই স্বল্পায়ব গল্পগুলি দেখে মনে হয় তিনি শুধু যেন কতগুলো হাড় দিয়ে গল্পের কাহিনী বয়ন করেছেন, মেদ-মাংস যেন আমাদের লাগিয়ে নিতে হবে। সে কারণে মনে

হয়, বনফুলের গল্পে পাঠকের অধিকার একটু যেন বেশি। তিনি যা বলেন, তার বেশি পাঠককে দিয়ে ভাবিয়ে নেন, বা বলিয়ে নেন। বনফুলের গল্পের শুরু যেমন অপ্রত্যাশিত চমক দিয়ে, শেষও তেমনি নাটকীয় 'চাবুক হাঁকড়ানো' (Whip-Crack) ভঙ্গিতে। যেখানে পৌঁছে পাঠকের চেতনায় একটা বড় ধাক্কা লাগে, আর তার পর পাঠক পৌঁছে যায় বৃহত্তর জীবানুভূতিতে। বনফুলের কোন গল্প বিশেষত যেগুলি ক্ষুদ্রাকৃতির এক বা আধ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ, সে সব গল্পে একটি বাক্য যেন গল্পের মেরুদণ্ডের মতো গল্পটিকে দাঁড় করিয়ে রাখে। ঐ একটি বাক্যই যেন একটি গল্প হয়ে ওঠে। যেমন তাঁর আধপৃষ্ঠার 'নিমগাছ' গল্পটি। গল্পটি গদ্য কবিতার মত সাজানো ২৭টি বাক্যে সমাপ্ত। বাক্যগুলি পর পর লিখে গদ্যের মতো সাজালে হয়তো দশ থেকে বারোটি বাক্যে গল্পটি শেষ হয়ে যেত। গল্পটি পুরোটা উঠিয়ে দিচ্ছি —

"কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।
পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।
কেউবা ভাজছে গরম তেলে।
খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।
চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।
কচি কচি পাতাগুলি খায়ও অনেকে।
এমনি কাঁচাই.....
কিংবা ভেজে বেগুন-সহযোগে।
যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।
কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক ..... দাঁত ভালো থাকে।
কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।
বলেন— "নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না।"
কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।
আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।
শান দিয়ে বাঁধিয়ে দেয় কেউ— সে আর এক আবর্জনা
হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল।
মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিড়লে না, ডাল ভাঙলে না।
মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে, রইল শুধু।
বলে উঠল,— "বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি কি রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার.....
একঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে বাঃ—"।
খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভিতরে শিকড় অনেক দূর চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।"

—এখানেই গল্পটি শেষ। গোটা গল্পে বনফুল একটি নিমগাছের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে আমরা কখনো ভাবতেও পারিনি যে, শেষ বাক্যটির মতো এমন একটি বাক্য তিনি জুড়ে দেবেন। গোটা গল্পটির একটি নিমগাছের বর্ণনাতে পূর্ণ, অথচ শেষ বাক্যটি জুড়ে যেতেই কী বৃহতের ব্যঞ্জনাই না সৃষ্টি হল। উপমা, রূপকে ব্যঞ্জনায় গল্পটি কি বৃহৎ জীবন সত্যই না উন্মোচন করল। 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার' কত অসহায় করুণ অকথিত জীবনকাহিনী বহুগুণিত হয়ে প্রকাশ লাভ করল পাঠকের মনে। এধরনের সংযম, বনফুলের পক্ষেই সম্ভব। আর এধরনের সংযমই তাঁকে শিল্পীর মোহ থেকে রক্ষা করেছে। কত স্বল্পায়তনে কত বেশি কথা বলা যায়, কত বৃহৎ ও গভীর জীবন সত্য রূপায়ণ করা যায় এগল্পটি তার প্রমাণ। বস্তুতপক্ষে গল্পের শেষের বাক্যটি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নিমগাছটি আর শুধুমাত্র একটি অচেতন নিমগাছ হয়ে থাকেনি, তা মানব জীবনের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার জন্য নিমগাছের পাতা, ছাল, ডাল ইত্যাদি ব্যবহারের উপযোগী ও উপকারের বস্তু হওয়া কবিরাজের কাছে প্রশংসার বস্তু হলেও কবির কাছে কিন্তু নিমগাছটি ভিন্নমাত্রায় উপস্থিত। গল্পটিতে কবিরাজ এবং কবির দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। কবিরাজের কাছে নিমগাছের প্রয়োজনীয়তার দিকটিই প্রধান, কিন্তু কবির দৃষ্টিতে সৌন্দর্যের দিকটিই প্রধান হয়ে উঠেছে। প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয়তার উর্দ্ধে তাই জীবনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল নিমগাছ ও 'ওই বাড়ির গৃহকর্মা-নিপুণা লক্ষ্মী বউটি' মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু জীবনমূল উভয়ের অনেক দূর পর্যন্ত প্রোথিত। তাই শত আবর্জনার মধ্যে হাজারো অত্যাচার সত্ত্বেও নিমগাছটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, আর 'পাশের বাড়ির গৃহকর্মা-নিপুণা লক্ষ্মী বউটি'কেও। কবির মত সৌন্দর্য্য পিয়াসী ব্যক্তির সঙ্গে যাওয়ার সাধ্য থাকে না তাঁর। তবে সাধ্য না থাকলেও মনে চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। তাই এ গল্পে নিমগাছের রূপকে গৃহকর্মা-নিপুণা বউটির প্রবল জীবন তৃষ্ণা যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি তার নির্যাতনের স্বরূপটিও উন্মোচিত হয়েছে। শেষের ঐ একটি বাক্যই কাব্যের অসীম ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে এ গল্পে। আসলে বনফুল ছিলেন একাধারে কবি ও কথাকার। তাই কবির সৌন্দর্যপিয়াসী মন আর কথাকারের রূঢ় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি মিলেমিশে এক অদ্ভুত শিল্পকলা নির্মিত হয়েছে এ গল্পে। এই দুই সত্তাই মিলেমিশে বনফুলের ছোটগল্পগুলিকে সংক্ষিপ্ত পরিসরেও বৃহত্তর জীবন ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। আমাদের সমাজের গৃহবধূরা যে সংসারের প্রচলিত সংস্কারের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেন না, সাংসারিক স্নেহ-মায়া-মমতা নানাবিধ সংস্কার

তাকে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে রাখে। তেমনি পাশের বাড়ির বউটিও নানা সাংসারিক বন্ধনে মন আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কখনো জাগলেও তা প্রকাশ করার সাহস তার নেই। বড়ো জোর মনে মনে সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, পাওয়ার প্রত্যাশাকে সে লালন করতে পারে। তবু সাংসারিক বন্ধনের চাপে সেই লালিত আকাঙ্ক্ষাও বেশি দিন থাকেনা, তাকে গতানুগতিক জীবন ছন্দে ফিরে আসতেই হয় বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া যেমন আর কোন গত্যন্তর থাকে না নিমগাছটির, তেমনি আমাদের সমাজের গৃহবধূদের। অচেতন নিমগাছটিতে প্রাণিন সত্তার আরোপে নিমগাছটি বৃহত্তর সমাজসত্য উন্মোচন করেছে। সামাজিক নিয়মকানুনে জর্জরিত সাংসারিক নিয়ম সংস্কারে নিষ্পেষিত, অত্যাচারিত নারীর ব্যর্থ চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব চিত্র নিমগাছের উপমায় রূপলাভ করেছে গল্পে। শেষের ঐ একটি লাইনের বাইরে বনফুল আমাদের সমাজজীবনের একটি সমগ্র রূপকে তুলে ধরেছেন। বনফুল সমাজ চিত্রের বিশাল মহীরূহকে বীজাকারে সংহতি দিয়েছেন ঐ শেষ বাক্যে। এখানেই বনফুল অনন্য, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন একক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও অধিপতি।

বনফুলের **'ছোট'** আকৃতির গল্পগুলির বিষয় যা নিয়েই গড়ে উঠুক এবং এই আধ-এক পৃষ্ঠার গল্পগুলি বনফুলের বিশিষ্ট শিল্পকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও, কিন্তু শিল্পধর্মের মানদণ্ডে সেগুলি কতটা সার্থক তা নিয়ে বির্তক থাকতেই পারে সমালোচক মহলে। কেননা, গল্পিকাগুলিতে কোন বৃত্তান্ত (Anecdote) নেই, সেগুলিতে লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতি কাব্যিক সুষমায় সীমাহীন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। তবুও নানা বিতর্ক সত্ত্বেও বলা যায় যে, আধুনিক ছোটগল্প যেকোন ক্ষণিক মুহূর্তের চিত্ররূপ হতে পারে। এ বিষয়ে সাহিত্যিক সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন— **"আধুনিক ছোটগল্পে ঘটনা থাকতেই হবে — এমন কোন প্রতিশ্রুতিই নেই। একটি মুহূর্ত-বিলাস, একটি মনন, একটুখানি দেখা, একটি মেজাজ, খানিক 'জাগর-স্বপ্ন' (Surrealism) —এরা সবাই-ই একালের ছোটগল্পের বিষয়বস্তু হতে পারে।"**[৪] বনফুলের 'ছোট' আকৃতির গল্পিকা বা অণুগল্পগুলিতে এমনই একটি বিশেষ মুহূর্তের বিলাস, মনন, মেজাজ ইত্যাদি রূপায়িত হয়েছে। তবে তাঁর সব গল্পিকাই যে বৃত্তান্তহীন তা নয়। আসলে বনফুলের এই গল্পিকাগুলি হ'ল বৃত্তান্তহীন বৃত্তান্ত। যেখানে কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন হয় না, বা ব্যাখ্যা না করেও বিস্তৃত ব্যাখ্যার কাজ করেছে। এই কোন কিছু খুলে না বলার মধ্যে অনেক কিছু বলার শিল্পরূপটিই তো বনফুলকে বিশেষভাবে চিনিয়ে দেয়। যেমন উনিশটি বাক্যে সমাপ্ত **'আত্ম-পর'** গল্পটি। যেখানে চার-পাঁচ বছর আগে এক শালিখ ছানার মৃত্যুর সঙ্গে কথক নিজের সন্তানের মৃত্যুকে কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত করে আমাদের মনের দিশাকে এক অনির্দেশ্য ইঙ্গিতে ভরে তোলেন। গল্পে দেখি, গল্পকথক সারা সকাল খেটে খুটে দুপুর বেলায় বারান্দায় শুয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে কথকের **"মুখের উপরে খপ্ করে কি একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখলেন, একটা কদাকার কুৎসিত পাখির ছানা। লোম নেই-ডানা নেই-কিম্ভুত কিমাকার। রাগে ও ঘৃণায়**

কথক পাখির ছানাটিকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিতেই একটি বেড়াল সেটিকে আত্মসাৎ করল।" শালিখ পাখিদের আর্তনাদ শোনা যেতে লাগল। কথকের একটু অনুশোচনা হলেও এপাশ-ওপাশ করে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। এ ঘটনার চার-পাঁচ বছর পর একদিন হঠাৎ কথকের একমাত্র সন্তান শচীন সর্পাঘাতে মারা গেল। ডাক্তার, কবিরাজ-অনেক কিছু করেও তাকে বাঁচাতে পারলেন না কথক। সেই চার-পাঁচ বছর আগে নিস্তব্ধ দুপুরে বেড়ালের মুখে সেই অসহায় পাখির ছানাটি, আর তার চারিদিকে পক্ষীমাতাদের আর্ত হাহাকারের কথা কথকের মনে পড়ে **'হঠাৎ যেন একটা অজানা ইঙ্গিতে শিউরে'** উঠলেন।

এ গল্পের যে আখ্যান তা নিছকই ব্যাখ্যাহীন এক সহজ সরল বর্ণনা। কিন্তু এই ব্যাখ্যাহীনতার মধ্যেও সীমাহীন ব্যাখ্যার আভাস আছে। চার-পাঁচ বছর আগেকার পক্ষীমাতাদের আর্ত হাহাকারের মধ্যে যে যন্ত্রণা ছিল তা গল্প কথক সেই সময় অনুধাবন করতে পারেন নি, আজ নিজের সন্তানকে হারিয়ে মাতৃহৃদয়ের অতি হাহাকারের তীব্রতা পরতে পরতে অনুভব করেছেন। আসলে, পরের যন্ত্রণার গভীরতা আমরা অনুভব করতে পারি না পুরোপুরি। যখন সেই ধরনেরই কোন ঘটনা নিজেদের ঘটে তখনই তার তীব্রতা যথাযথভাবে অনুভূত হয়। আসলে দেশ-কালপাত্র ভেদে হাসি-কান্না-বিচ্ছেদ-আনন্দ-মৃত্যুর অনুভূতি একই, প্রকাশভঙ্গি হয়তো ভিন্ন।

তাই গল্পকথকের নিজের সন্তানকে হারিয়ে চার-পাঁচ বছর পূর্বের শালিখ ছানাটির অসহায়ভাবে মৃত্যুর কথা মনে হয়েছে, যার জন্য দায়ী ছিলেন কথক স্বয়ং। কেননা, কথক ইচ্ছে করলেই সেই পাখির ছানাটিকে বিড়ালের হাত থেকে বাঁচাতে পারতেন। তাই সেই ইচ্ছাকৃত কর্মের অনুশোচনার জন্যই চার-পাঁচ বছর পরে নিজের সন্তানকে হারিয়ে **'হঠাৎ যেন একটা অজানা ইঙ্গিতে শিউরে'** উঠলেন। এভাবে বনফুল এগল্পে মানব এবং মানবেতর প্রাণীর শাশ্বত অনুভূতির একীকরণ করেছেন। সীমা থেকে সীমাহীনতার পথে এভাবে কোন রকম বৃত্তান্ত বা বিস্তৃত বর্ণনা ছাড়াই উত্তরণ ঘটিয়েছেন বনফুল।

এমনই আরেকটি আধপৃষ্ঠার গল্প হ'ল **'ভাটিয়ালী'**। মাত্র ষোলটি বাক্যে গল্পটি রচিত। কবি কাঁকন কুমারের পঞ্চাশতম জন্ম দিবসে তাঁর কবিতার প্রথম বই 'তন্বী' নিয়ে যে হাজির হয়েছে সে তার পূর্বপ্রেমিকা 'লম্বা-চওড়া স্থূলকায়া' রেণু। অতীতে যাকে নিয়ে কাঁকন কুমার 'তন্বী'র কবিতাগুলি লিখেছে, তাকে এখন চিনতেই পারেনি কাঁকন কুমার। পরিচয় দেবার পর আলাপ হতে হতে **"রেনু সামনের নড়বড়ে চেয়ারটি টানিয়া বসিল। ক্যাঁচ করিয়া শব্দ হইল একটা। কাঁকন কুমারের বুক ধরফর করিতে লাগিল। চেয়ারটি যদি ভাঙিয়া যায় দ্বিতীয় চেয়ার কিনিবার সঙ্গতি তাঁহার আপাতত নাই।"** তাই অতীতের সেই প্রেমিকার সঙ্গে ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করার পরিবর্তে চেয়ারটির পরিণতি কি হবে এ আশঙ্কায় **'শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ারটার দিকে চাহিয়া রহিলেন।'**

এযেন ঘটনার কিছু কঙ্কালমাত্র, তাতে অস্থি-মাংস আমাদের জুড়ে দিতে হবে। বনফুল

কাঁকন কুমারের অতীত প্রেমের একটি সুন্দর আখ্যান জুড়ে দিতে পারতেন, কিন্তু দেননি। রেণুর শীর্ণকায়া কিভাবে স্থূলকায়ায় পরিণত হ'ল অর্থাৎ রেণুর স্বামীর বম্বেতে চামড়া ব্যবসাতে আর্থিক উন্নতিতে সুখে-স্বাচ্ছন্দে রেণু কিভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠলো তারও কিছুটা বিবরণ দিতে পারতেন বনফুল, কিন্তু দেননি। আসলে যেটুকু না দিলে আর কোনভাবেই গল্পটি দাঁড় হবে না সেইটুকুই শুধু দিয়েছেন। বাকিটা পাঠকের কল্পনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা, প্রেমের সেই বর্ণনা দিলে গল্পটি তার বাস্তব পটভূমিকা হারাত। গল্পের যে মূল উদ্দেশ্য কাঁকন কুমারের দারিদ্র্যের চরিত্র উন্মোচন, তা নির্দেশিত করতে গল্পের শেষে কাঁকন কুমারের সেই বুক ধরফরানিতে এসে গল্পটি শেষ করে দিলেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি শব্দও বনফুল খরচ করতে রাজি নন। আর এর চেয়ে বেশি বললেও যে গল্পের টান টান উত্তেজনাটা থাকত না সেটাও ঠিক। কবি কাঁকন কুমারের দারিদ্র্যক্লিষ্ট উৎকণ্ঠিত চিত্তের স্বরূপ উন্মোচনই বনফুলের এখানে উদ্দেশ্য, তাই কাঁকন কুমারের বুক ধরফরানিতে গল্পটি শেষ করলেন কোন রকম অতিকথন ছাড়াই।

বনফুল বাস্তববাদী লেখক। কিন্তু সেই বাস্তবতার চিত্র অঙ্কনে কল্পনার যে সেখানে স্থান নেই তা নয়, তবে সেই কল্পনা আবেগের ক্ষরস্রোতে ভেসে যায়নি। বরং তা সংযত হয়ে অসামান্য শিল্পরূপ সৃষ্টি করেছে। এমন সংযমী লেখার দৃষ্টান্ত প্রচুর বনফুলে। যেমন **'বহুরূপী'** গল্পে ষোলটি বাক্যে আইনের বহুরূপী রূপের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। **'অমলা'** গল্পটি তিনটি পরিচ্ছেদে পঁচিশটি বাক্যে সম্পূর্ণ। অমলাকে তিনজন দেখে গেল। অরুণ, হেমচন্দ্র, বিশ্বেশ্বরবাবু। প্রতিবারই পাত্রকে কেন্দ্র করে অমলার মনে কত স্বপ্ন কত কল্পনা। প্রথমবার দরে বনল না, দ্বিতীয়বার দরে বনল, কিন্তু পাত্রী পছন্দ হল না, তৃতীয়বার মেয়েও পছন্দ হল এবং দরেও বনল বিশ্বেশ্বরবাবুর সঙ্গে। তিনি সদাগরি অপিসে চাকরি করেন। শুভদৃষ্টির সময় **'কি জানি কেমন একটা মায়ায় অমলার বুক ভরে'** গিয়েছিল। **'এই শান্তশিষ্ট নিরীহ স্বামী পেয়ে অমলা মুগ্ধ হল।'** মোটাসোটা কালো হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক বি.এ. পাশ বিশ্বেশ্বর বাবুকে নিয়ে **'অমলা সুখেই আছে।'** —এ গল্পেও কাহিনী বিস্তারের যথেষ্ট অবসর ছিল, কিন্তু বনফুল তা গ্রহণ করেন নি। সমাজে নারীর পণপ্রথা জনিত সমস্যার চিত্র তুলে ধরতে পারতেন, অমলার সুখী দাম্পত্য চিত্রের বর্ণনা দিতে পারতেন, কিন্তু বনফুল তা দেন নি। অত্যন্ত স্পষ্ট ও তির্যক বাচনভঙ্গিতে কোন রকম মন্তব্য ও ভাবালুতা ছাড়াই একটি নিটোল সংহত কাহিনী আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 'সার্থকতা', 'খেঁদি', 'সমাধান', 'রামায়ণের এক অধ্যায়', 'ভিক্ষুক', 'গল্প লেখার গল্প' প্রভৃতি প্রায় আড়াইশোর উপর গল্পে বনফুলের সংযমী প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। সীমিত পরিসরে বৃহত্তর জীবনের রূপদানের কৌশল বনফুলকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল তাঁর কবিসত্তা। বন্ধুবর পরিমল গোস্বামীর কথায়— **'অত্যন্ত ছোট পরিসরে তুমি পাঠকমনে যে ব্যাপ্তির ধারনা জন্মাতে পার তা তোমার ঐ বিশেষ শিল্পরীতির জন্যই এবং তার মূলে লুকিয়ে আছে একটি কবি।'**[৫] আগেই বলেছি, এই কবি ও কথাকারের দ্বৈতসত্তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা মিলেমিশে এক অসাধারণ

সংযমী ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন বনফুল। তিনি এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী যিনি প্রয়োজনে কথাকে বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত করতে পারতেন। আবেগ ও কল্পনাকে পরিচালনের চাবিকাঠি তাঁর নিজের আয়ত্বে ও নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

বনফুলের 'মাঝারি' আকৃতির গল্প রচনার বিশেষত্বও তর্কাতীত। 'মাঝারি' আকৃতির গল্পগুলি (অর্থাৎ যেগুলি আয়তনে দুই পৃষ্ঠা থেকে বেশি অথচ পাঁচ পৃষ্ঠা থেকে কম) রচনার পেছনে গভীরভাবে কাজ করেছে মানুষের বিচিত্র জীবন অন্বেষা। মানব জীবনের বিচিত্র রূপ নির্মাণে, জীবন-ব্যাখ্যায় এক স্বতন্ত্র মহিমায় তা উদ্ভাসিত। বনফুলের 'মাঝারি' আকৃতির বেশিরভাগ গল্পই সাড়ে তিন পৃষ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত, কিছু গল্প আছে চার থেকে সাড়ে চার পাতার মধ্যে। আবার এর মধ্যে আড়াই পাতার গল্পের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। সব মিলিয়ে 'মাঝারি' আকৃতির গল্প প্রায় দু'শো তিরাশিটির মতো। এই বিপুল সংখ্যক গল্প রচনার পেছনে বনফুলের আগ্রহই প্রমাণ করে এই আয়তনের গল্প রচনাতেও তিনি সমান পারদর্শি ছিলেন। তাঁর অসাধারণ সংযমী চরিত্র, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-প্রবণ মানসিকতা, জীবন-দর্শন, মানব জীবন সম্পর্কে বিচিত্র অভিজ্ঞতা এই মধ্যমাকৃতির গল্পগুলিতেও উপভোগ্যতা এনেছে। বনফুল ছিলেন জীবন-সন্ধানী শিল্পী। তাই মানুষের বিচিত্র জীবন চিত্রণে, জীবন ব্যাখ্যায় যেটুকু পরিসর তাঁর প্রয়োজন সেটুকুই তিনি ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁর কোন গল্প আধ পৃষ্ঠায় শেষ হয়, কোনটি এক পৃষ্ঠায়, কোনটি দুই পৃষ্ঠায়, কোনটি তিন পৃষ্ঠায়, কোনটি চার-সাড়ে চার পৃষ্ঠায়। তা সে যত পাতারই গল্প হোক ,জীবনচিত্র উন্মোচনে সেই আয়তনই যেন যথাযথ বলে আমাদের মনে হয়। গল্পগুলি পড়ে আমাদের মনে হয় এর চেয়ে কম বুঝি বলা যেত না বা এর চেয়ে বেশি বলা বুঝি উচিৎ হত না। তবে তুলনামূলকভাবে ছোট আকৃতির গল্পের তুলনায়, মধ্যমাকৃতির গল্পে জীবন ব্যাখ্যার পরিধি কিছু বিস্তৃত। তবুও সেখানেও তিনি এমন একটি 'কৌশল' নিয়েছেন গল্প বলার যা থেকে বোঝা যায় তিনি একটি কথা বাড়তি বলতে চান না। যেমন **'স্থূলের স্মৃতি'** গল্পে তিনি বলেছেন— **'যাক্, বর্ণনা করিয়া সময় নষ্ট করিব না।'** যদিও গল্পটি ছোট আকৃতির। শুধু 'ছোট' আকৃতির নয়, সাড়ে তিন পাতার মধ্যমাকৃতির **"ভ্রষ্ট লগ্ন"** গল্পেও বনফুলকে বলতে শুনি— **'আমার সেই সদ্য জাগ্রত যৌবনে—বেশি বক্তৃতা করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহিনা—আপনারা যা আশঙ্কা করিতেছেন তাহাই ঘটিল।'** আসলে বনফুল কি ছোট, কি মাঝারি যে কোন রীতির গল্পেই অতিরিক্ত একটি বাক্য বা একটি শব্দও ব্যয় করতে রাজি নন। অথচ ঐ কথাগুলিও কিন্তু বর্জ্য কথা নয়, সেগুলিও গল্পের সংগঠনে কোন না কোনভাবে সাহায্য করেছে। তাই দেখা যায়, বনফুলের প্রায় সমস্ত গল্পেই এই অদ্ভুত সংযমী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ জীবন ব্যাখ্যায় তা কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে নি। বনফুলের বিশেষত্ব এখানেই।

এবারে বনফুলের দু'একটি 'মাঝারি' আকৃতির গল্প আলোচনা করে তাঁর কৃতিত্ব নিরূপণ করা যেতে পারে —

জীবন যে কারো জন্য থেমে থাকে না, প্রেম যে কোন বিশেষ পাত্রেই আবদ্ধ থাকে না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপান্তর ঘটে চলে। জীবন ক্রমশ এগিয়েই চলে। এই চলমান জীবনের এক বিচিত্র রূপ **'ভ্রষ্টলগ্ন'** গল্পে চিত্রিত হয়েছে। মানুষের মন কি চায়, আর মানুষ কি পায় তা বিধাতা ছাড়া যেন আর কারো বোঝার সাধ্য নেই। স্বপ্ন এবং বাস্তব সত্যের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য তা বলাই বাহুল্য, তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখে, সেই স্বপ্ন ভাঙে, আবার নতুন স্বপ্ন গড়ে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলে। এগল্পে গল্পের কথক বন্ধু তকুর অসাধারণ সুন্দরী বোন মালতীর প্রেমে পড়েন। বক্তা মালতীকে প্রেম নিবেদন করলে মালতী তা প্রত্যাখ্যান করে। বক্তা মানপুর ছেড়ে কোলকাতায় এসেও মালতীকে ভুলতে পারেন নি। তবে তকুর সঙ্গে বক্তার পত্রালাপ ছিলই। তকু একবার মালতীর পাত্র খোঁজার জন্য বক্তাকে চিঠি লেখে, যেন 'সুরূপ' একটি পাত্রের সন্ধান বক্তা দেন। বক্তা তার গোপন ইচ্ছা জানিয়ে বন্ধুকে একদিন এক পত্র লেখেন, কিন্তু **'কোন উত্তর আসে নাই।'** এরপর বেশ কিছুদিন কেটেছে, বক্তা এম.এ পড়ছেন, ঠিক সে সময় মিস্ মিত্রের প্রেমে পড়েন এবং বিবাহ প্রস্তাব দেন। মালতী বক্তার **'মন হইতে অতর্কিতে সরিয়া গিয়াছে। তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে আর একজন মৃদু হাসিনী মৃদু ভাষিণী মিস্ মিত্র।'** বিবাহ ঠিক, ঠিক সে সময় মালতীর দাদা এসে বক্তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কারণ, স্টোভ ধরাতে গিয়ে মালতীর মুখ পুড়ে যাওয়ায় আর কেউ তাকে বিবাহ করছিল না। তকুর অনুরোধে বক্তা সাড়া দেয়, বিবাহ করে মালতীকে। আর এদিকে ভ্রষ্ট-লগ্ন হয়ে মিস্ মিত্র পড়ে থাকে।

বনফুল পাপকে ঘৃণা করেছেন, পাপীকে নয়। তাই তাঁর এ গল্পে পাপীর প্রায়শ্চিত্ত করালেন। যে অহংকারী সুন্দরী মালতী বক্তাকে রূপের গর্বে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই মালতীকে যেন বিধাতাই তার অহংকার চূর্ণ করে বক্তার কাছে পাঠিয়ে দিল। শুধু পাপ-পুণ্যের হিসেব নয়, এ গল্পে মানুষের মনের বিচিত্র রহস্যের স্বরূপও উন্মোচন করেছেন বনফুল। মানুষের মন যে কোন একটি বিশেষ বস্তুতে বা ব্যক্তিকে আবদ্ধ থাকে না, সে যে পরিবেশ-পরিস্থিতির দাস তা বনফুল খুব ভালোভাবেই জানতেন। এক বিশেষ পরিস্থিতিতে ফেলে চরিত্রের গূঢ় মানস প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করা বনফুলের শিল্পী স্বভাব। এগল্পেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

মাত্রাতিরিক্ত লোভ মানুষের জীবনে কি ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসতে পারে তার প্রমাণ "আইন" গল্পটি। বনফুল চিরকালই অনাচার, দুর্নীতির বিরুদ্ধে খড়গহস্ত। অন্যায় ও পাপাচারীর বিরুদ্ধে বনফুলের ন্যায় দণ্ডটি বিধাতার দণ্ডে পরিণত। এ থেকে যেন পরিত্রাণ নেই। এ গল্পের পরিণামী উদ্ভাসন আমাদের চকিত-চমকিত করে। এগল্পে ডাক্তার টি.সি. পাল দু'হাজার টাকার বিনিময়ে আইনের চোখে ধুলো দিতে গিয়ে সবদিক সামলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে যে কাজটি

করলেন, তার ফল তাকে হাতে নাতে পেতে হয়েছে। ডাক্তার টি.সি. পাল একজন নিপুণ সার্জেন এবং অর্থলোভী ব্যক্তি। টাকার লোভে তিনি যে কোন রকম অন্যায় অপকর্ম করতে দ্বিধা করেন না। একদিন দু'হাজার টাকার বিনিময়ে এক খুনীকে ব্যাক ডেটের সার্টিফিকেট দিতে রাজি হয়ে যান। নিজের চেম্বারে অ্যাপেনডিক্সের অপারেশনের নামে। অপরিচিত ব্যক্তিকে টাকার লোভে মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়ে আত্মতৃপ্তি সহকারে তিনি বলেছেন— **'এমন পাকা কাজ করে দিলুম যে আইনের বাবারও সাধ্য নেই আপনাকে ধরে।'** কিন্তু মানুষের অন্যায় কৃতকর্মের ফল তাকে পেতেই হয়। তাই অপরিচিত খুনী ব্যক্তিটি যখন তার কাজ হাসিল করে বেড়িয়ে পড়ে, তার পরে ডাক্তারবাবু পুলিশের পত্রের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, যে অপরিচিত ব্যক্তিটিকে তিনি এই মাত্র আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যা সার্টিফিকেটটি দিয়েছেন, সে তার জ্যৈষ্ঠ পুত্র রমেশের হত্যাকারী। গল্পের এই পরিণামী ক্লাইমেক্স গল্পটিকে জমাট বাঁধিয়েছে। বনফুল মানব জীবনের অবনমিত বিধ্বস্ত ট্রাজিক পরিণাম নিয়ে কোন মন্তব্য করেননি। নৈব্যক্তিক ভঙ্গিতে তথ্যটুকু বিন্যাস করেছেন মাত্র। এই নির্বাক উপস্থাপনাই বনফুলের সৃজনকলার বিশেষত্ব। মানুষের যে চারিত্রিক অধঃপতন তার স্বভাবজাত, তাকে বনফুল মেনে নেন নি কখনো। যেখানেই তিনি সে ধরনের কিছু দেখেছেন সেখানেই চাবুকের কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন তার বিবেকের উদ্বোধনে। এগল্পে একদিকে যেমন অন্যায়কর্মে প্রতিফল কি হতে পারে তার চিত্র তুলে ধরেছেন, তেমনি অর্থলোভী ডাক্তার শ্রেণীর চরিত্র বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরেছেন। একর্থে খুনী ও অর্থলোভী ডাক্তার উভয়েই নিজের নিজের এক্তিয়ারে যে কসাই তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তবু বলতে হয়, খুনীর কোন ন্যায়-অন্যায়বোধ নেই, পাপ-পুণ্য বোধ নেই, যে কোনভাবে তার কাজ হাসিল করাই তার ধর্ম। কিন্তু একজন ডাক্তার তার নৈতিক ধর্ম বিসর্জন দিয়ে যে অধর্ম করে তা খুনীর চাইতেও বেশি অপরাধ। তাই খুনী নয়, লোভী ডাক্তারের নৈতিক অধঃপতনের উপযুক্ত শাস্তি যেন বনফুলের অভীপ্সিত ছিল। আর তা নির্মমভাবে তাকে দিলেন। এতে তাঁর কোন কুণ্ঠা নেই, ভাবালুতা নেই।

শুধু পুরুষ চরিত্র নয়, নারী চরিত্র অঙ্কনেও বনফুল সমান দক্ষ। নারী চরিত্রের একরূপ পাই 'নিমগাছ' গল্পে, নারী চরিত্রের আর এক রূপ অঙ্কিত হয়েছে **"নিপুণিকা"** গল্পে। এগল্পের শুরুতে বনফুল নিপুণিকা নারীর চরিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে— **"লীলাময়ী তন্বী রূপসী। খঞ্জন নয়নের চটুল চাহনি, পাবর বক্ষের সংযত অসংযম লাস্য-চপল ললিত গমন-ভঙ্গিমা, মিষ্ট কণ্ঠের রজত নিক্কণনিভ হাস্যধ্বনি, ছদ্মকোপ, কমনীয় ভ্রূভঙ্গি"** পাষাণকেও উতলা করে তোলে। এ বর্ণনায় পাঠকের প্রথমাবস্থায় মনে হতে পারে বনফুল বুঝি কোন অসংযমী নারী চরিত্রের কথা বলতে চলেছেন, কিন্তু গল্প এগোতে এগোতে নিপুণিকা নারী ধর্ম পাল্টাতে থাকে। গল্পটি চারটি পর্বে নাটকীয় ভঙ্গিতে লিখিত। প্রথম পর্বে যুদ্ধে আহত সেনাপতি সুন্দরী নার্সের কথাবার্তায় নার্সটি যে সেনাপতির প্রেমে পড়েছে তা আভাসে ইঙ্গিতে বনফুল বলেছেন। দ্বিতীয় পর্বে গভীর রাত্রে কিভাবে নার্সটি সেনাপতির শিবিরে প্রবেশ করল এবং উভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হল। সেনাপতি

নার্সের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে পেতে চাইল, কিন্তু নার্সটি জানতে চায় তার পরবর্তী যুদ্ধের প্ল্যান কি। সেনাপতি তখন ভাবে **'এই মায়াবিনী তাহা হইলে স্পাই।'** এরপর নার্সের যৌবনের আকর্ষণ রোধ করতে না পেরে সেনাপতি যুদ্ধের প্ল্যান দিতে বাধ্য হলেন। তৃতীয় পর্বে দেখা যায়, সেনাপতি ও নার্স শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। নার্সের মুখে মৃদু মৃদু হাসি। কিন্তু পরক্ষণেই সেনাপতির পিস্তলের গুলিতে সে হাসি স্তব্ধ হয়ে গেল, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সুন্দরী নার্স। পর মুহূর্তেই টেবিলের উপর একটি চিঠি পেলেন সেনাপতি। তাতে লেখা— **"প্রিয় সেনাপতি মহাশয়,**

আমি ধরা পড়িয়াছি, হয়তো আমাকে এজন্য মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। আপনার হাতে মরিতে আমার আপত্তি নাই। মৃত্যুকে কে অতিক্রম করিতে পারে? আপনার হাতে প্রাণ বিসর্জন করিলাম, ইহা আমার সৌভাগ্য।

একটি ক্ষুদ্র অনুরোধ করিয়া যাইতেছি। শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে হয়তো আমি করিতাম না, আপনাকে সত্যই আমি ভালবাসিয়াছিলাম, সেই ভালোবাসাজনিত স্পর্ধায় এই ক্ষুদ্র অনুরোধটি করিতে সাহস করিতেছি। আমার মৃতদেহটা আমার স্বদেশে পাঠাইয়া দিবেন। আপনি সেনাপতি ইচ্ছা করিলেই ইহা করিতে পারেন। ইহাই আমার অন্তিম অনুরোধ।" এরপর পঞ্চম পর্বে **"নার্সের মৃতদেহ স্বদেশে উপনীত হইল।"** তবে তার পূর্বে আরেকটি সংবাদ জীবিত অবস্থায় নিপুণিকা পাঠিয়েছিল, তা হল এই যে, তার শবে হয়তো গোপন সংবাদটি বহন করে আনতে পারে। খবর মতো অনুসন্ধান করে **'বাথরুমে যে কাগজটি নার্স গলাধঃকরণ করিয়াছিল শব ব্যবচ্ছেদাগারে তাহার পেট চিরিয়া কাগজটি পাওয়া গেল।'** যেটিতে **'যুদ্ধের প্ল্যান লেখা ছিল।'**

এইভাবে নিপুণিকা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে তার জীবনের মায়া ত্যাগ করে প্রতিপক্ষ সেনাপতির শিবিরে প্রবেশ করে, যুদ্ধের প্ল্যান হস্তগত করে নিজের দেশে পাঠায়। নিজের উদ্দেশ্য সাধনে শরীর দিয়েছে, জীবন দিয়েছে। এই দেশপ্রেমি নিপুণিকা অতি দক্ষ ও কৌশলী। সে সেনানায়ককে প্রলুব্ধ করার আর্টও যেমন জানে, তেমনি দেশের জন্য মরতেও জানে। তার প্রেম নিবেদনের মধ্যেও নিপুণতা আছে। সে যথার্থই নিপুণিকা। সে শুধু পুরুষের ভোগ্য শরীর হয়ে থাকে নি, উদ্দেশ্য সাধনের চাবিকাঠিতে পরিণত হয়েছে। এই নিপুণিকা তাই বলে বারবিলাসিনী গোত্রের নয়। জীবনকে মহৎ উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে তার কোন দ্বিধা নেই। অত্যন্ত শান্ত সংযত ভঙ্গিতে অতিকথন বর্জন করে টান টান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে নারী চরিত্রের এক বিশেষ দিক তুলে ধরেছেন এগল্পে বনফুল।

বনফুলের **"বড়"** আকৃতির গল্পের সংখ্যা প্রায় পঁয়তাল্লিশ। এই 'বড়' মাপের গল্পগুলি পাঁচ পৃষ্ঠা থেকে চোদ্দ পাতার ('অর্জুন মণ্ডল') মধ্যে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, লোকটি আধপৃষ্ঠারও

কম আয়তনের গল্প লিখেছেন, তিনি পনের পাতার এই দীর্ঘ গল্প রচনা করতে পারেন! হ্যাঁ, পারেন। আসলে যে কথা আগেও বলেছি, বনফুলের আবেগের চাবিকাঠি তাঁর নিয়ন্ত্রাধীনে। তিনি যে গল্পের যতটা ব্যাখ্যা বিস্তৃতি ততখানি পরিসর নিয়েছেন। লেখক গল্পে তার দিকটি স্পষ্ট করতে যেটুকু বৃত্তান্ত প্রয়োজন সেটুকুই গ্রহণ করেছেন। বনফুলের বড় গল্পগুলির বিষয়গুলি এক একটি উপন্যাস হবার উপযুক্ত। কিন্তু তিনি সেই বৃহৎ পটভূমির কাহিনীকে সংক্ষেপে ছোটগল্পের রূপ দিয়েছেন। তাই তিনি ছোটগল্পে 'সংক্ষেপে উপন্যাস' লিখতে পারেন। বনফুলের কৃতিত্ব এখানেই। তবে একথাও ঠিক যে, পাঁচ-সাত পাতার ওপরের গল্পগুলিতে বনফুলের বর্ণনার কিছুটা হলেও অতিশায়ীতা আছে। আসলে বনফুল অভিজ্ঞতাবাদী, বাস্তববাদী লেখক। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়েছে। তবে সেই দীর্ঘায়তন শিল্প সৃষ্টির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়নি। বরং যথার্থ জীবনসত্য উন্মোচনে তা পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে।

"অর্জুন মণ্ডল" গল্পটি আলোচনা করলে আমরা উক্ত মন্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারব। ভারসাম্যহীন আদর্শ প্রতিষ্ঠার উন্মাদনা জীবনে কীভাবে ট্র্যাজিক পরিণাম নিয়ে আসতে পারে সে চিত্র এগল্পে চিত্রিত। 'অর্জুন মণ্ডল' গল্পে গল্প কথকের আবাল্য পরিচিত 'অর্জুন কাকা' একাগ্রচিত্ত নিয়মনিষ্ঠ, কর্তব্য সচেতন বলিষ্ঠ জীবনবোধের সাধক। তাঁর জীবনে খামখেয়ালীপনা, অসংগতি, অসংযমীর কোন স্থান নেই। নিজের আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে এবং অপরকেও গড়ে তোলার প্রবণতা তার মধ্যে প্রবল। নিজের ভেতরকার অক্ষমতাকে ভেংচিয়ে পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে তা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা তাকে সংগ্রামী, সংযমী মানুষে পরিণত করেছে। কিন্তু তার জীবনের এই মাত্রাতিরিক্ত সংযমী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তার জীবনে সার্বিক পরাজয় ডেকে এনেছে।

গল্পের অর্জুন কাকা এক অদ্ভুত ব্যতিক্রমী চরিত্র। ছোটবেলা থেকেই গল্পকথক অর্জুন কাকাকে যেভাবে দেখেছেন, সেই স্মৃতিচিত্র থেকে অর্জুন কাকার সেই ব্যতিক্রমী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গল্পকথক তুলে ধরেছেন। অর্জুন কাকা জাতে জেলে। মাথায় করে ঝুড়ি নিয়ে হাটে হাটে মাছ বিক্রি করে। কিন্তু **'আশ্চর্য জীবন লোকটার।'** চল্লিশ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরক্ষর এই লোকটি একবার জমিদারের লোকদের সঙ্গে মাছ কেড়ে নেওয়া নিয়ে বচসা হওয়ার সূত্রে গল্পকথকের ডাক্তার-পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে বুঝতে পারলেন শিক্ষিতের বা বিদ্যার্জনের গুরুত্ব কতটা। এরপর বিদ্যাচর্চার নেশা তাকে পেয়ে বসে। নিজের পেশাকে বজায় রেখে রাতে চলে তার বিদ্যাচর্চা। দিনের বেশিরভাগ সময় এবং রাতে জেগে জেগে পড়তেন তিনি। আর মাঝে মাঝে চা খেতেন ঘুম কাটানোর জন্য। তবুও ঘুম এলে **"চোখে সরষের তেল দিতেন। মাথার চুল ধরে টানতেন। ঠাস্ ঠাস্ করে নিজের গালে চড়ও মারতেন কখনও কখনও।"** সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে অদম্য উৎসাহে নিয়মিত পড়াশোনা করতে থাকেন। তারপর একদিন গল্পকথকের

পিতার এক অতিথি অর্জুন কাকার কথাবার্তায় ও বিদ্যার পরিধি দেখে খুশি হয়ে কমপাউণ্ডারি পড়ার সুযোগ করে দেয়। কম্পাউণ্ডারি পাশ করে এক স্থানীয় হাসপাতালে চাকরি গ্রহণ করেন অর্জুন কাকা। কিন্তু পড়াশোনাকে বন্ধ করেননি তিনি। চিকিৎসা বিদ্যার বাংলা অনুবাদ বই পড়ে ডাক্তারী বিদ্যাতে দক্ষতা অর্জন করেন। তার সঙ্গে সঙ্গে ডিক্সেনারী মুখস্থ করা, রবিনসন ক্রুশো, গ্যালিভার্সট্রাভেলস্, পিলগ্রিমস্ প্রগেস জাতীয় বই কিনে একটার পর একটা শেষ করতে লাগলেন। এহেন অর্জুন কাকাকে ড্রেসারের পরীক্ষায় পরীক্ষকের চেয়ে বেশী জ্ঞান প্রদর্শনের জন্য ফেল করতে হয় প্রথমবার। নিজের সাত মেয়ের সাত জামাইদের বিলাসিতায় ও উচ্ছৃঙ্খলতায় বিরক্ত হয়ে তাদের মারধরও করতে বাধে না তার। কেননা, এ ধরনের জীবন তিনি পছন্দ করেন না। এমনকি তার সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে গল্প কথককে বিলেতে পাঠাতে এতটুকু দ্বিধা নেই তার। অদ্ভুত খেয়ালী মানুষ এই অর্জুন কাকা। নিজে রেধে খান, এমন কি নিজের চা টুকু পর্যন্ত। শীতকালে গরম কাপড় পড়তেন না, দুপায়ের ফাঁকে জ্বলন্ত উনান রেখে গা-হাত-পা সেঁকতেন। তাঁর মতে, **'সোয়েটারই পর আর শালই গায়ে দাও, এর কাছে কিছু নয়।'** একেবারে স্বতন্ত্র খেয়ালের এই মানুষটির মূর্খ জামাইদের সঙ্গে বনিবনা হয়নি, নাতিও মনের মতো হয়নি, স্ত্রীও মারা গেছে, প্রাক্টিস করতেও যখন আর মন বসছে না, এক কথায় দুনিয়ার কারও সঙ্গে যখন বনল না, তখন তীর্থ ভ্রমণে প্রয়াগ, কাশীতে যাবার মনস্থির করলেন। তার জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যাতে সব কুলিয়ে যায় এমন একটা বড়সড় সিন্দুক বানালেন তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত আগ্রহ দিয়ে। কেননা জীবনে এই একটা জিনিসই তিনি নিজের হাতে নিজের মত করে গড়তে পেরেছেন। **"সিন্দুকটাও হল চমৎকার। যেমন প্রশস্ত, তেমনি মজবুত, তেমনি সুন্দর দেখতে।"** সেই সিন্দুকে অর্জুন কাকার প্রয়োজনীয় সব কিছু ঢোকানো হল। স্টেশনে ট্রেন ধরতে এলেন। অর্জুন কাকা **"একটা কুলি সিন্দুকটা তুলতে পারলেন না। দু'জন লাগল।.....ট্রেন এল। কুলি দু'জন প্রাণপণে চেষ্টা করলে সিন্দুকটাকে গড়িয়ে তুলতে, কিন্তু কিছুতেই পারলেন না। সিন্দুকটা এত বেশি বড় হয়েছিল যে ট্রেনের দরজা দিয়ে কিছুতেই ঢুকল না। সুটকেশ নিয়ে কত লোক উঠল নামল, কিন্তু সিন্দুক নিয়ে অর্জুন কাকা উঠতে পারলেন না।"**

সমস্ত গল্পটিতে অর্জুন মণ্ডলের ব্যতিক্রমী চরিত্রের নানা বৈশিষ্ট্য গল্পকথক তুলে ধরেছেন। অর্জুন মণ্ডলের চারিত্রিক দৃঢ়তা তুলনাহীন। সে যেভাবে পড়াশোনা করত তা সত্যিই আমাদের বিস্মিত করে। তিনি দুঃসাহসিক। তাঁর দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় জমিদারের লোকজনদের বিরুদ্ধে অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় এবং তাদের মারধর করায়। তিনি নিজের আদর্শানুযায়ী সকলকে গড়ে তুলতে চাইতেন। তাই বিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল জামাইদের মারতেও দ্বিধা করেন নি। আবার তাঁর মনের মত হওয়ায় গল্পকথককে সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে ডাক্তারী পড়াতে বিলেতে পাঠাতে দ্বিধান্বিত হননি। সংসারে কারো সঙ্গে না বনাতে এমন এক সিন্দুক গড়ে বসলেন, যা নিয়ে যাত্রা করা দুঃসাধ্য। আসলে অর্জুন মণ্ডল যতই আদর্শবান ব্যক্তিত্ব

হোন কেন, তার আদর্শ, জীবনাচরণ প্রচলিত সহজ স্বাভাবিক জীবনের পরিপন্থী। অস্বাভাবিক বলেই তা প্রাকৃতিক নিয়মে দণ্ডিত। সারাটা জীবন তিনি যেভাবে চলবেন এবং তার পরিজনদের যেভাবে চালাবেন বলে ভেবেছিলেন তা তিনি পারেন নি। নিজের মতো করে কোন কিছুই পান নি সংসারে। ব্যর্থতাই তার জীবনের সঙ্গী। শেষে নিজের ভাবনায় যে সিন্দুকের রূপদান করলেন তা নিজের ব্যর্থতাকেই ডেকে আনল। যেখানে সুটকেশ নিয়ে কত লোক অনায়াসে যাতায়াত, নামা-ওঠা করছে, সেখানে ঐ বিরাটাকায় সিন্দুক নিয়ে অর্জুন মণ্ডল ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, থাকতে বাধ্য হয়। আসলে আদর্শবাদী জীবন যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, সীমাহীন আদর্শবাদীতা জীবনে পরাভবই ডেকে আনে। অর্জুন মণ্ডলের ট্র্যাজিডি ঐখানেই।

অর্জুন মণ্ডল বনফুলের চোখে দেখা মানুষ। বনফুল তাঁর 'মনন' প্রবন্ধের (১৫তম খণ্ড) 'আমার চোখে আমি' স্মৃতিচারণে লিখেছেন— **"ভুবন সোম, অর্জুন মণ্ডল, অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়। বাস্তবে এরা ছিল অন্য নামে। এখনো আছে আমার স্মৃতিতে প্রিয় মানুষের মতো।"** বনফুল তাই অর্জুন মণ্ডল চরিত্রের সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্য যতটা পরিসর প্রয়োজন ততটা পরিসর নিয়েছেন। অর্জুন মণ্ডলের চরিত্র বর্ণনা কিছুটা দীর্ঘ মনে হলেও তাকে স্পষ্টতা দেবার জন্য এটুকু পরিসর আবশ্যক ছিল। বনফুলের চোখে দেখা এই আদর্শবান, দুঃসাহসী, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, স্বতন্ত্র খেয়ালী স্বভাবের ব্যর্থ জীবন কথা নিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে। বনফুল ছিলেন আদর্শবান, নীতিনিষ্ঠ শুদ্ধ বলিষ্ঠ জীবনের একনিষ্ঠ পূজারী। অর্জুন মণ্ডল চরিত্র তার প্রতিভু। যদিও অর্জুন মণ্ডল শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ জীবনের পথিক। আসলে অবক্ষয়ী আদর্শহীনতার যুগে আদর্শবান অর্জুন মণ্ডলেরা তো ব্যর্থ হবেনই! দেশ-কাল-পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলে নিজের আদর্শ অনুযায়ী খাপছাড়া জীবন অতিবাহিত করতে গেলে ব্যর্থতা আসতে বাধ্য। অর্জুন মণ্ডলেরা তাই নিজেদের ব্যর্থতা নিজেরাই ডেকে আনে। বনফুল আদর্শবান নীতিনিষ্ঠ শুদ্ধ সুস্থ বলিষ্ঠ জীবনবোধের পূজারী। কিন্তু যে আদর্শবাদীতা সহজ স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ জীবনে সমস্যার সৃষ্টি করে, তাকে তিনি সমর্থন করেন নি। অর্জুন মণ্ডলের ট্র্যাজিক চরিত্র নির্মাণেই তা স্পষ্ট। বনফুলের চোখে দেখা অর্জুন মণ্ডলের বৈশিষ্ট্য তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত হলেও অর্জুন মণ্ডলের ট্র্যাজিক রূপ চিত্রণে তিনি নিজের জীবনাদর্শকেই রূপ দিয়েছেন। আরেকটি কথা, অর্জুন মণ্ডলের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে বনফুলের ব্যক্তিগত জীবন কথাও যেন কোথাও কোথাও উঁকি দিয়েছে। বিশেষ করে অর্জুন কাকার বিবিধ বিষয়ের বই একনিষ্ঠভাবে পড়ার অদম্য আগ্রহে, কম্পাউন্ডারী পরীক্ষায়, আদর্শবাদী জীবন ভাবনায়, গল্প কথকের বিলেতে পড়তে যাওয়ার কথায়, গল্পকথকের ডাক্তার পিতার চরিত্র বৈশিষ্ট্য উল্লেখ ইত্যাদিতে। জীবন অভিজ্ঞতার এই রূপচিত্রণে বনফুল নিজেকে ছড়িয়ে দিতে গিয়ে কিছুটা জড়িয়ে পড়ায় বর্ণনায় কিছুটা দীর্ঘ পরিসর নিয়েছেন। তবে তা গল্পরস সৃষ্টির পরিপন্থী হয় নি। **"বনফুল ছোটগল্পের প্রাণের অবলীলায় ও পরিমিতিবোধে বিশ্বাস করতেন। তত্ত্ব, তথ্য, ইতিহাস, অলৌকিকতা, সামাজিক পর্যবেক্ষণ বা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ— গল্পে যাই**

থাক না কেন, স্বচ্ছন্দ গতিবেগ তার থাকা চাই। অর্থাৎ, উপকরণ বা তাৎপর্য যেমনই থাক, গল্পের গল্পত্বকেই তিনি অগ্রাধিকার দিতেন। গল্পরসই তাঁর কাম্য ছিল।"[৬]

এবারে বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়প্রবণতা অনুযায়ী আলোচনা করা যেতে পারে। পূর্বেই বলেছি বনফুলের গল্পের বিষয়ের বিভিন্নতা এত বেশি যে, কোন একটি বিশেষ প্রবণতায় তাদের সার্বিক চরিত্রকে বেঁধে রাখা যায় না। তবুও তাঁর গল্পের সমীক্ষার জন্য এই আপাত শ্রেণীবিভাগও কিছুটা অপরিহার্য, যদিও তা একেবারে জল-অচল ভাগ নয়। শিল্পীর সাধারণ প্রবণতাটি ধরার তা একটি প্রয়াস মাত্র। কারণ বনফুলের সমস্ত গল্পের অনুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয় এবং তা অনিবার্যও নয়,তাঁর গল্পের বিশেষ প্রবণতা ধরে তার একটি সাধারণ ধারনা গড়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য। এ যেন অনেকটা "বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ" গ্রহণের প্রচেষ্টা। যাইহোক, বনফুলের গল্পগুলিকে আমার কল্পনায় ও বিবেচনায় যে সব বিভাগগুলিতে বিন্যস্ত করেছি তা এইরকম— **১। রঙ্গ-ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাস্যরসের গল্প ২। সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ জীবনবোধের গল্প ৩। হাসির গল্প ৪। বিষয়-বস্তুকেন্দ্রিক গল্প ৫। রূপকধর্মী গল্প ৬। অলৌকিক গল্প ৭। চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প ৮। নাটকীয় গল্প ৯। মানবমনের রহস্য উন্মোচনকারী গল্প ১০। শিশু-কিশোরের গল্প ১১। পশুকেন্দ্রিক গল্প ১২। আঙ্গিক প্রধান গল্প ১৩। নিয়তি প্রধান গল্প ১৪। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার অবলম্বনে রচিত গল্প ১৫। জৈব প্রবৃত্তিমূলক গল্প।**

এবারে বনফুলের উক্ত গল্প বিভাগগুলির আলোচনা করে শিল্পীর মানস প্রবণতাকে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে—

১। রঙ্গ-ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাস্যরসের গল্প ঃ বনফুল বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন ব্যঙ্গ-কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর ব্যঙ্গ-কৌতুক মন গল্পেও চমকপ্রদ রস সৃষ্টি করেছে। তবে বনফুলের ব্যঙ্গ কখনো ইচ্ছাকৃত ব্যঙ্গ ছিল না। যেখানেই তিনি কোন অসংগতি বা অসংযম বা ভন্ডামী লক্ষ্য করেছেন, সেখানেই ব্যঙ্গের কষাঘাতে ব্যক্তি-চরিত্র বা সমাজচরিত্রকে সংশোধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর ব্যঙ্গ রচনার মূলে ছিল সমাজ-সংসারের বিচ্যুতিকে সংশোধন করার প্রচেষ্টা। বনফুল আগাগোড়াই প্রত্যয়নিষ্ঠ শিল্পী। মানব চরিত্র বা সমাজ চরিত্রের স্বাভাবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি সহমর্মিতার সঙ্গে দেখতেন। কারণ তিনি জানতেন, ভালো মন্দ মিলেই একজন মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে। আর মানুষের ভুল-ভ্রান্তি-ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েই মানুষ ক্রমশ পূর্ণতার পথে এগিয়ে চলে। কিন্তু মানবচরিত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসঙ্গতি নিজের কারণে যখন স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাকে বনফুল ভন্ডামী, ছিঁচকেমি, নোংরামি, ন্যাকামি বলে অভিহিত করেছেন - যা বনফুলের একেবারে অসহ্য ছিল। তিনি 'শনিবারের চিঠি'(১৩৫৬) - তে নিজেই বলেছেন—

"ভণ্ডামী, ছিঁচকেমি, নোংরামি, ন্যাকামি প্রভৃতির উপর আমি খড়্গহস্ত। সরল পাপীকে আমি স্নেহ করি। কিন্তু ভণ্ড, ন্যাকা এদের আমি সহ্য করতে পারি না।" এইসব চারিত্রিক অসংগতিকে গল্পে রূপ দিতে গিয়ে বনফুলের গল্প হাস্যমুখর হয়ে উঠেছে। তাঁর ব্যঙ্গের মধ্যে রঙ্গের আভাস বা রঙ্গের মধ্যে ব্যঙ্গের আভাস এক অসাধারণ স্বাদসৃষ্টি করেছে গল্পে। প্রমথনাথ বিশী 'বনফুলের ব্যঙ্গ কবিতা'-র (১৩৬৫) ভূমিকা অংশে এ প্রসঙ্গে বলেছেন— **'সংসার ও জীবনের যে সব গরমিল, (Paradox) আছে, সেগুলিকে তিনি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া মিশাইয়া দেন, অমনি হাসির বিস্ফোরণ ঘটে।'** আসলে বনফুল কি সমাজ চরিত্রের, কি ব্যক্তি চরিত্রের অসংগতি, **'সমস্ত অভ্যস্ত চিন্তাধারাকে দুঃসাহসিক ব্যঙ্গের সাহায্যে উল্টে'** দিতে পারতেন। বনফুলের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁকে আমার 'Satirist বনফুল' বলতে ইচ্ছে করে। তবে বনফুলের ব্যঙ্গ কখনো সরাসরি আক্রমণ করে না। তা ঘুরপথে কখনো অম্ল-কষায়, কখনো কৌতুকে কখনো মৃদু হাসির, কখনো মধুরতায় আর্দ্র। বনফুলের এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে আছে— 'শ্রীপতি সামন্ত', 'উৎসবের ইতিহাস', 'ছোটলোক', 'দেশ দরদী কেনারামের রোজনামচা', 'বাঘা', 'সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ', 'বিদ্যাসাগর', 'পরিবর্তন', 'জৈবিক নিয়ম' ইত্যাদি।

মানব চরিত্রের মহতী ভাবনায় বনফুল শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু যে মহতী ভাবনা অপরের ব্যক্তিত্বকে লাঞ্ছিত করে তা বনফুলের সহ্যশক্তির বাইরে। মেকি ভদ্রতার মুখোশ টেনে খুলে দিতে বনফুল সিদ্ধহস্ত। এমনই এক গল্প হ'ল **"ছোটলোক"** যেখানে আমরা ভাবতে বাধ্য হই প্রকৃত ভদ্রলোক কে, বা ছোটলোক কে? শিক্ষায় দীক্ষায় বলীয়ান হলেই কি তাকে প্রকৃত ভদ্রলোক বলা যায়? বিদ্যে না থাকলেও জীবনভাবনার মহনীয়তায় কি কেউ ভদ্রলোকের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না? এসকল প্রশ্নের উত্তর আমরা গল্পটি গভীরভাবে ভাবলেই পেয়ে যাই।

'সুনির্দিষ্ট নীতি-অনুসরণকারী অনমনীয় চরিত্র রাঘব সরকার চিরকালই উন্নত মস্তক।' তিনি কখনো কারো অনুগ্রহের প্রত্যাশী নন, কারো ঘাড়ের বোঝা হয়ে থাকেন নি কখনো **'যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। স্বকীয় মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।'** রাঘব সরকার কৃতবিদ্য ব্যক্তি, সুতরাং 'তাহার মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্র নারায়ণ, বল্‌শেভিজম্, ডিভিশন্ অব্ লেবর, পল্লীর দুর্দশা, ফ্যাক্টরী, জমিদারী, নানা কিছু ভাবনা প্রবাহিত হয়ে চলে। এই রাঘব একদিন গ্রীষ্মের নিদারুণ দ্বিপ্রহরে ছাতাহীন মাথায়, কন্টকসস্কুল জুতো পরে খদ্দর পরিধানে হেঁটে চলেছেন, এমন সময় এক রিক্‌শাওয়ালা সওয়ারির প্রত্যাশায় ঘন্টা বাজিয়ে তার পিছু নেয়। রাঘব সরকার রিক্‌শায় চড়াকে 'পাপ' বলে মনে করেন। কিন্তু পরক্ষণেই জীর্ণশীর্ণ অনাহার ক্লিষ্ট লোকটিকে দেখে রাঘব সরকারের **'হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।'** শিবতলা পর্যন্ত ছ পয়সায় ভাড়া ঠিক হলেও রাঘব সরকার রিক্‌শায় উঠে না, সে হেঁটেই চলে। রিক্‌শাওয়ালাও তার পিছু পিছু শিবতলায় পৌঁছায়। পৌঁছে পকেট থেকে রাঘব সরকার ছ'পয়সা বের করে দিতেই "লোকটার চোখে মুখে একটা নীরব অবজ্ঞামূর্ত হইয়া উঠিল। সে

ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিয়া দিল।" কারণ রাঘববাবু তো তার রিক্‌শায় চড়েন নি, তাহলে সে পয়সা নেবে কি করে? রাঘব সরকার রিক্‌শাওয়ালাটিকে পয়সা নিয়ে যেতে বললে সে বলে 'আমি কারো কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।' এই বলে রাঘব সরকারের উন্নত মস্তক অবনত করে দিয়ে 'ঠুন ঠুন করিয়া ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।'

রাঘব সরকার এক বিশেষ জীবনাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে নিজের উন্নত মস্তকে কখনো ভাবতেও পারেন নি যে, এই নীচু শ্রেণীর মানুষেরও আত্মমর্যাদাবোধ থাকতে পারে। এ জ্ঞান তিনি সেদিনই প্রথম লাভ করলেন, আর সেটি এমনভাবেই লাভ করলেন যাতে তার সমস্ত আর্দশবাদীতা চূর্ণ হয়ে গেল। রিকশাওয়ালার সেই তেজোদ্বীপ্ত কথা 'আমি কারও কাছে ভিক্ষে নিই না' প্রকৃতপক্ষে সেই ভদ্রবেশধারী মধ্যবিত্তের ঠুনকো মুখোশ খুলে দেওয়ার প্রয়াস মাত্র। আদর্শবাদীতারও একটা সীমা থাকে। সেই সীমা লঙ্ঘন রাঘব সরকারের চরিত্রের বড় ত্রুটি। আর বনফুল তীব্র কষাঘাতে রাঘবকে জর্জরিত করতেও ছাড়লেন না। রাঘব সরকার যদি আদর্শবাদীতার এই আদিখ্যেতা না দেখাতো তাহলে সে একটা সুষ্ঠু বলিষ্ঠ চরিত্র হত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভালো-মন্দ নিয়েই মানব চরিত্র গঠিত। খুব ভালো চরিত্র যেমন আমাদের মনে দাগ কাটে না, কারণ, তা দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়, খুব খারাপ চরিত্রও আমাদের অনুকম্পা পায় না, কারণ, তাদের আমরা ঘৃণা করি। কিন্তু যে মানুষটি ভালো-মন্দে গড়া তার চরিত্র আমাদের আকর্ষণ করে। কিন্তু এই ভালো-মন্দের মধ্যে সমতা না থাকলে সেই চরিত্র আমাদের সহানুভূতি হারিয়ে ভণ্ড, জোচ্চর মানুষে পরিণত হয়। বনফুল মানুষের চরিত্রের প্রকৃত দুর্বলতার প্রতি সহানুভূতিশীল, কিন্তু সেই চারিত্রিক দুর্বলতা যখন স্বাভাবিকতা হারিয়ে অসঙ্গতির পর্যায়ে উন্নীত হয় বনফুল তাকে ছেড়ে কথা বলেন নি। তিনি 'সরল পাপী'কে স্নেহ করেন কিন্তু ভণ্ড, ন্যাকা তাঁর অসহ্য। মানুষের ব্যক্তি-চরিত্রের এমনই এক অসঙ্গতির চিত্র বনফুল তুলে ধরেছেন **"দেশ দরদী কেনারামের রোজনামচা"** গল্পে। এ গল্পে বনফুল মানব চরিত্রের ভণ্ড ভাবনাকে হাস্য- পরিহাসিক পরিমণ্ডলে শ্লেষতীক্ষ্ম ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছেন।

গল্পটি রোজনামচা বা দিনলিপি আকারে লেখা। চারদিনের ঘটনার যথাক্রমে ৮.৭.'৫০, ১০.৭.'৫০,১২.৭.'৫০, ১৪.৭.'৫০-এর বিবরণ অনুসারে ভণ্ড চরিত্রের স্বরূপটি স্পষ্টরূপে গল্পকার উন্মোচন করেছেন। 'দেশ দরদী' কেনারামের দেশভাবনা কতটা অন্তঃসারশূন্য তা তার কথাতেই বোঝা যায়— "আপনারা কখনও দেশের দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়াছেন কিনা জানি না। হয়তো করেন নাই, হয়তো করিয়াছেন। মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে আমি ভাবি, আমি যেভাবে দেশের দুঃখ প্রত্যহ অনুভব করি তেমনভাবে আর কেহ করে কিনা। আমি প্রত্যহ তিনখানি সংবাদপত্র আদ্যন্তপাঠ করিয়া বিচলিত হই, বিগলিত হই, বিহ্বল হই। ইচ্ছা করে চিৎকার করিয়া কাঁদি। কিন্তু কাঁদিতে পারি না। মনে হয়, আমার অশ্রুর উৎস বোধ হয় শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু না সেদিন চোখে কাঁকর পড়িয়াছিল, অনেক জলতো বাহির হইল! তাহা হইলে বোধ হয় দেশের

দুর্দশার কথা ভাবিবামাত্র অশ্রু জমাট হইয়া যায়, ঝরিয়া পড়িতে পারে না।" এহেন দেশ দরদী কেনারামের ভণ্ড চরিত্রের আচরণ পরবর্তী ঘটনাগুলিতে ক্রমে খসে পড়তে থাকে। 'স্বাধীনতা-কাপে' পড়ে দেশও কিভাবে চায়ের কাপে পড়া মাছির মতো হাবুডুবু খাচ্ছে তা ভেবে কেনারামের মনটা হুহু করে উঠে, সংবাদপত্রের সম্পাদকের লেখা পড়ে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করে, কিন্তু তার অনুভূতি ঐ ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, নিজের কিছু করার আগ্রহ ও পরিকল্পনা নেই। সন্ধ্যাবেলা, 'ইভনিং ইন প্যারিস' সেন্ট লাগিয়ে আদ্দির পাঞ্জাবি পড়ে ক্লাবে আড্ডা মারতে যাওয়ার সময় উদ্বাস্তু পাকিস্তানি তরুণীর ম্লান মুখ তার 'হৃদয়-গামছা' নিঙড়িয়ে উঠলেও সাহায্যের একটি পয়সাও বের হয় না। ক্লাবে বন্ধুদের সঙ্গে রাত্রি দশটা পর্যন্ত ব্রীজ খেলে **'বাসায় ফিরিয়া মাংসের কোর্মা সহযোগে লুচি আহার করিতে করিতে বারংবার মনে হইতে লাগিল, আহা, কত লোক যে অনাহারে আছে!'** অন্যমনস্কভাবে অনেকগুলি লুচি গলাধকরণ করে **'নেটের মশারী-আবৃত দুগ্ধ ফেননিভ শয্যায় শয়ন করিতে গিয়া আরও কাতর'** হল তার শিয়ালদহের ফুটপাতে অনাহারক্লিষ্ট লোকদের কথা মনে হল। তার **"চক্ষু সজল হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হইল না। একটা চাপা কষ্টে যে দম বন্ধ হইবার মতো হইল।"** রাতে শোয়ার বালিশের উপর তোয়ালাটি কেনারামের স্ত্রী পেতে না দিয়ে সিনেমা দেখতে যাওয়ায় এবং বাড়ির চাকরটিও তোয়ালেটি বালিশে পেতে দিতে ভুলে যাওয়ায় তার বক্তব্য **"খাদ্যমন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া সামান্য চাকর পর্যন্ত সব ফাঁকিবাজ। এদেশের কি কোন দিন উদ্ধার হইবে?"** তারপর বালিশের উপর রোমশ তোয়ালাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে বাগানে আমসি দেখে কেনারামের মনে হল **'আমাদের দেশও একদিন আম ছিল, আজ আমসি হইয়াছে।'** মনে হওয়া মাত্র তার **'হৃদয়-বালতি দুঃখ-বারিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।'** সিগারেট ধরিয়ে দেশের কথা ভাবতে ভাবতে রাস্তার সেই ম্লানমুখী বালিকাটির কথা মনে পড়ায় কাশীর জরদা দিয়ে দুখিলি পান মুখে পুড়ে দেশের কথা ভাবতে ভাবতে মনে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করলেন। তিন তিনটে খবরের কাগজ তন্ন তন্ন করে পাঠ করে কেনারাম যে সূক্ষ্মদৃষ্টিলাভ করেছেন তা মর্মভেদী। এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তিনি সিনেমা দেখতে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করেন এবং সেখানে উদ্বাস্তু যুবতীটিকে দেখতে পান। তারপর সেই ম্লানমুখী যুবতীটির সঙ্গে আলাপ করে সিনেমা শেষে উভয়ে একসঙ্গে ফিরপো অভিমুখে যাত্রা করলেন।

সমস্ত গল্প জুড়ে দেশদরদী কেনারামের দেশের জন্য যে অস্থিরতা, চিন্তাভাবনা লক্ষ্য করি তা তার ভণ্ড-মস্তিষ্ক প্রসূত ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, কার্যক্ষেত্রে কিছু দেখা যায়নি। যদিও সিনেমা গৃহে পাশে বসা উদ্বাস্তু যুবতীটিকে চানাচুর খাইয়েছে, তাকে ফিরপোতে নিয়ে গেছে খাওয়াতে, কিন্তু তাতে করে তার দেশপ্রীতির এতটুকুও পরিচয় ফুটে ওঠেনি। আসলে কেনারাম আত্মসুখপরায়ণ কপট স্বভাবের মানুষ। যার মেকি দেশ ভাবনায় সারবস্তু বলে কিছু নেই, যে নিজেকে বৃহৎ, মহৎ দেশপ্রেমিক ও দেশ ভাবুক মনে করে, অথচ যে গরীব দুঃখীর

অসহায়তার সুযোগ সন্ধানী। দেশ দরদী কেনারাম যে মোটেই একজন দেশদরদী ব্যক্তি নয়, তিনি যে এক ভণ্ড, প্রতারক, তা বনফুল গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক পরিহাস রসিক তির্যক ভঙ্গিতে এগল্পে তুলে ধরেছেন। আমাদের সমাজে এমন ভণ্ড মানুষ বহু দেখতে পাওয়া যায়, যারা পরের দুঃখ যন্ত্রণায় কাতর হন, কিন্তু করেন না কিছুই, পরন্তু সেই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন, দেশ দরদী কেনারাম সেই গোত্রভুক্ত। **"বনফুল সত্যান্বেষী। তাঁর সত্যান্বেষা প্রবল ছিল বলে সমাজ এমনকি সরকারের তীব্র সমালোচনায় তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন নি।"**[৭] বনফুলের শিল্পীধর্মের অভিজ্ঞান এখানেই যে, তিনি হাসতে হাসতে বোলতার হুল ফোটানো জ্বালা ধরিয়ে দেন আমাদের সমাজস্থ ভণ্ড মানুষদের।

২। **সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ জীবনবোধের** গল্প ঃ একথা আগেও বলেছি যে বনফুল আগাগোড়া সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ জীবনবোধের পূজারী। তিনি শত দারিদ্য, শত বিচ্ছিন্নতা, শত ধ্বংসের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে এমন এক মহৎ বৃহৎ উন্নত জীবনাদর্শে বিশ্বাসী যা থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি চ্যুত হন নি। সেই জীবন চরিত্র তিনি নিয়ত মানব চরিত্রে প্রত্যাশা করে ফিরেছেন, যেখানে তাঁর এই সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ জীবনবোধ প্রকাশ পেয়েছে। তবে এজীবন কোন মহাপুরুষের জীবন অন্বেষণ নয়, তা আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে ভালো-মন্দে গড়া আহৃত জীবন। কেননা তাঁর শিল্প সৃষ্টিতে বাস্তবাতিরিক্ত আদর্শের কোন স্থান ছিল না। তিনি প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর এক সুস্থ জীবনবোধকে রূপ দিতে সর্বদা প্রয়াসী ছিলেন। এধরনের গল্পগুলির মধ্যে আছে 'চৌধুরী', 'মানুষ', 'খুড়ো', 'তাজমহল', 'চম্পা মিশির', 'যোগেন পণ্ডিত', 'রঘুবীর রাউত', 'বিশ্বাস মশাই', 'দত্ত মহাশয়', 'হৃদেশ্বর মহাশয়', প্রভৃতি।

"চৌধুরী" গল্পটি এমন এক জীবনবোধকে প্রকাশ করেছে যেখানে বলিষ্ঠ জীবন ভাবনার এক অন্যরকম চিত্র রূপায়িত হয়েছে। কংসারি চৌধুরী অপরাজেয়। **"কখন কাহারও কাছে হার মানেন নাই। জাল, জুয়াচুরি, ঘুষ, খোশামোদ, বাহুবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল– কার্যসিদ্ধির জন্য যখন যেটার প্রয়োজন, কাজে লাগাইয়াছেন।"** তিনি কিছুতেই পশ্চাদপদ হবার পাত্র নন, তিনি কি করেন নি? **"গ্রামে পিতার নামে স্কুল স্থাপন, মাতার নামে অবলা আশ্রম প্রতিষ্ঠা, বৃন্দাবনে মন্দির, জলসত্র, ডাকাতি, খুন, বড় বড় মামলা, নারী ধর্ষণ, গৃহদাহ— এমন কি শিশু হত্যা পর্যন্ত।"** অর্থাৎ মহত্বের চূড়ান্ত স্তর থেকে পঙ্কিলতার শেষ বিন্দু পর্যন্ত, যাতে হাত দিয়েছেন তারই চূড়ান্ত করে ছেড়েছেন। অদম্য এক বিস্ময়কর চরিত্র কংসারি চৌধুরী। কিন্তু হঠাৎ এক দিন চৌধুরী অন্ধ হয়ে গেলেন। বড় বড় ডাক্তার বৈদ্য দেখে শুনে বললেন তার দৃষ্টিশক্তি আর ফিরবে না। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেও যখন দৃষ্টিশক্তি ফেরানো সম্ভব নয় জানলেন তখন তাঁর বিশ্বাসী দেওয়ানকে বললেন— **"বল কিহে! পরাধীন হয়ে বাঁচতে হবে? শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল।"** দেওয়ানজি কিছুক্ষণ পর ঔষধ নিয়ে এসে দেখেন **"চৌধুরীর রক্তাক্ত দেহটা বিছানায় লুটাইতেছে।**

রিভালভার দিয়া তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। গুলি করিয়াছেন চোখেই।" আসলে, নিজের উদ্ধত তেজ, পৌরুষের হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যেতে দেখে কংসারি সে পরাজয়কে মেনে নিতে পারেনি। যে কংসারির অধীন সকলে সে কংসারি যখন দেখলেন তাকেই পরের অধীন হয়ে থাকতে হবে এখন, তখন যে চোখের অন্ধত্বের জন্য তার এই পরাজয় তাতেই গুলি করে আত্মহত্যা করে নিজের বলিষ্ঠ জীবনবোধকে বাঁচিয়ে রাখলেন। 'তাজমহল' গল্পের ফকির শাজাহানের জীবন ভাবনা, 'খুড়ো' গল্পের খুড়োর জীবনবোধ এক রকম, কংসারি চৌধুরীর জীবনবোধ আর একরকম, যে জানে জীবন দিয়ে জীবনের মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে। এও এক ধরনের জীবন সাধনা।

"চম্পা মিশির" এমনই আর এক গল্প যেখানে বনফুল আর এক ধরনের সুস্থ জীবনবোধকে তুলে ধরেছেন। চম্পা মিশির এমনই একজন লোক, যে জাত-পাত-নির্বিশেষে গরীবের নিঃস্বের, অসহায়ের সেবা করতে ভালোবাসে। তার কাছে এসব সেবা বা উপকার নয়, **'সময় কাটানোর খেলা।'** চম্পা মিশির টমটমের বাজে ঘোড়াকে ঠিক করাতে ভীষণ আনন্দ পান, সেকারণে টম টম ওয়ালারা তাকে আরোহী হিসেবে পেতে সর্বদা ব্যগ্র থাকে। চম্পা মিশির কোন টমটমের চালক নন, টমটমের বাঁকা ঘোড়াকে সোজা করাই তার কাজ যেন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গার ওপার থেকে ষ্টিমারে পেরিয়ে মাইল খানেক হেঁটে এই পরোপকারের খেলায় মত্ত হন। অনেক জমি-জায়গা থাকায় খাওয়া-পরার ভাবনা নেই তার। যে টমটমের ঘোড়া খারাপ সেইটেই পছন্দ করতেন তিনি। তা বলে যে তাকে কম ভাড়া দিতেন তা নয়, বরং বেশিই দিতেন। আর টমটমটা নিজেই হাঁকাতেন। সেই খারাপ ঘোড়া যতদিন না ঠিক হত ততদিন সেই টমটমকেই বহাল করে রাখতেন। অনেকে ঠকানোর চেষ্টা করত তাকে, কিন্তু মিশিরজির কাছে এসব চালাকি চলত না, তাদের উপযুক্ত ভর্ৎসনা দিতেন। মিশিরজির শহরে এসে সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন। আদালতেই বেশির ভাগ সময় কাটাতেন। রোজই তাঁর পরের একটা না একটা মকদ্দমা থাকতই। তাঁর নিজের জন্য নয়, পরের মোকদ্দমা। যে পক্ষ দুর্বল সেই দুর্বল পক্ষের মোকদ্দমা তদ্বির করতেন তিনি। তার জন্য উকিল ব্যবস্থা করতেন, সাক্ষী যোগাড় করতেন, নিজেও পরামর্শ দিতেন। শহরে তাঁর একটা ছোট বাসা ছিল, সেই বাসায় আশ্রয় দিতেন তাদের। তিনি কখনও সবলের পক্ষ নেন নি। **'যার কেস কমজোর, যার অর্থাভাব, যে পুলিশের বিষ দৃষ্টিতে পড়ে নাজেহাল হচ্ছে, চম্পা মিশির সর্বদা তার পক্ষে।'** নতুন উকিলদের মক্কেল জুটিয়ে দিতেন, কিন্তু বিনিময়ে তিনি কানাকড়িও চাইতেন না। কারণ, এ তার পেশা নয়, নেশা। মফস্বল থেকে আসা দুস্থ রোগীদের সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেওয়া, গল্পকথকের ক্লিনিকে এমন অনেক রোগী চম্পা মিশির পাঠিয়েছিলেন। একবার চম্পা মিশির হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায়, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গল্পকথককে ডেকে চম্পা মিশির অনুরোধ করেছিলেন যে, তাদের পাড়ায় রমজান বলে একটি গরীব লোক আছে, তার একটা ভেড়া আছে, ভেড়াটিকে লড়িয়ে তাদের পেট চলে। কিন্তু গত দুটি বাজিতে হেরে গেছে ভেড়াটা, কারণ তার বদহজমের রোগ হয়েছে। অতএব

তিনি যেন ভেড়াটিকে পথ্য দিয়ে গরীব লোকটিকে একটু সাহায্য করেন। চম্পা মিশিরের মৃত্যুর পর গল্পকথকের মনে হয়েছে, **'চম্পা মিশিরের মত লোকেরা কোথায় গেল, যারা কেবল দুর্বল মানুষদেরই সাহায্য করত, বাঙালি বিহারি হিন্দু মুসলমান-এসব ভেদ ছিল না যাদের কাছে?'**

বাস্তবিক চম্পা মিশির যে জীবনাদর্শের অনুসারী ছিলেন বর্তমান স্বার্থকেন্দ্রিক সমাজ জীবনে যেখানে মানুষ নিজেকে নিয়ে ভাবতে তৎপর সেখানে চম্পা মিশিরের মত সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ জীবন ভাবনা এক অন্যমাত্রা বহন করে আনে। তাই গল্পকথককে চম্পা মিশির যে শরবতিয়া লেবু গাছটি দিয়েছিল তা শুকিয়ে যেতে দেখে তার চারদিক খুঁড়িয়ে সার দিয়ে জল দেওয়ালেন ভাল করে। কারণ, **'গাছটাকে বাঁচাতেই হবে।'** গল্পকারের একথার মধ্য দিয়ে লেবু গাছকে বাঁচিয়ে তোলার আর চম্পা মিশিরের মত লোকদের বাঁচিয়ে রাখার তাৎপর্য এক হয়ে গেছে— লেবু গাছ আর চম্পা মিশির এখানে এক হয়ে গেছে। **"বনফুলের চরিত্রেরা স্বভাবে আশাবাদী; ব্যাক্তিমানুষ অন্তত যে আসাটি নিয়ে বাঁচে এ আশা সে আশা, একদিন নিরবয়ব মূল্যবোধের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে জেগে উঠবে মানবতা, এই প্রতিশ্রুতি তারা বিশ্বাস করতে চায়।"**[৮] চম্পা মিশির তাই আর বিশেষ কোন ব্যক্তি নয়, তিনি পরোপকারী, পরহিতাকাঙ্ক্ষী আদর্শবাদী মানুষের প্রতিভূ। চম্পা মিশিরের চরিত্রের এমন জনহিতৈষী ক্রিয়াকাণ্ডে বনফুলের চরিত্রের পরোপকারের দিকগুলি উঁকি দিয়েছে বলে মনে হয়।

৩। **হাসির গল্প** ঃ সিরিয়াস গল্পের পাশাপাশি নিখাদ হাসির গল্পও বনফুল কম লেখেন নি। তবে বনফুল শুধু হাসানোর জন্য হাসির গল্প লেখেন নি, সে হাসি কখনো কখনো গভীর তাৎপর্য নিয়ে সমুপস্থিত। বনফুলের গল্পে Humour বা খেয়ালীর হাসির তুলনায় Wit বা বুদ্ধিপ্রধান ও Satire বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক হাসি-ই বেশি পাই। সাধারণত কোন চরিত্রের উদ্ভট ক্রিয়াকলাপ, অস্বাভাবিক আচরণ, কথাবার্তা আমাদের হাস্যরস বোধকে জাগিয়ে তোলে। তবে তার জন্য বিশেষ ও অসাধারণ কল্পনাশক্তি, রসবোধ ও প্রত্যুৎপন্নমতিতা থাকা প্রয়োজন, যা বনফুলের মধ্যে আমরা পাই। জীবনের অনেক গভীর ও গম্ভীর কথা হাসিচ্ছলেও বলা যায়, তার জন্য বিশেষ শিল্পকুশলতার প্রয়োজন হয় না। বনফুলের জীবনকে দেখার, প্রকাশ করার মধ্যে এমন এক কৌশল আছে, যেখানে হাসির ফোয়ারা আপনা আপনিই ঝরে। এধরনের গল্পগুলির মধ্যে আছে— 'অদ্বিতীয়া', 'বিশুদ্ধ কৌতুক', 'সুলেখার ক্রন্দন', 'যুগল স্বপ্ন', 'বৈষ্ণব শাক্ত', 'খড়মের দৌরাত্ম্য' প্রভৃতি।

"অদ্বিতীয়া" গল্পে দাম্পত্য জীবনের করুণ পরিণতির পাশাপাশি হাসির ফল্গুধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত। গল্পকথক স্ত্রী প্রভাবতী নিয়ে বেশ ছিলেন, **'গৃহিণী গড়ে বছরে দেড়টি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া চারি বৎসরেই'** ছয়টি পুত্রকন্যার মালিক করে তুলেছিলেন। মাঝে দু'বার জমজ হয়। কথকের এ বর্ণনা যথেষ্ট হাস্যকর। এবম্বিধ প্রজাবৃদ্ধি সত্ত্বেও পঞ্চম বর্ষেও

গৃহিনী গর্ভধারণ করে। যথারীতি তিনি পিত্রালয়ে শান্তিপুরে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন শ্যালক বিনোদ চিঠি মারফৎ জানায় যে প্রভাবতী 'এক্লেম্পসিয়া'-য় মারা গেছে। শ্যালক কথকের পুত্রকন্যাদের কিছুদিন থাকার কথা বলে। স্ত্রীর মৃত্যুতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় কথক ছুটির আবেদন করলেন, কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হল না। দু'মাস পর সম্বলপুরবাসিনী শ্যালিকা দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে বলে কথককে। আরো বলে **'এখানে একটি বেশ ডাগর-ডোগর মেয়ে আছে।'** কথক **'সাতদিন ভাবিয়া-অর্থাৎ এক টিন চা ও পাঁচ দিন সিগারেট নিঃশেষ করিয়া'**, শ্যালিকাকে বলে **"বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্বদাই মনে পড়ে।"** কিন্তু শেষে শ্যালিকার প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং যথারীতি গোঁফ দাঁড়ি কামিয়ে তরুণ সেজে বিবাহ বাসরে বসলেন, বিবাহ বাসরে ভাবেন **'ইহার 'কিডনি' কেমন আছে কে জানে!'** বিবাহ সম্পন্ন হলে পর শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটি কিছুতেই ঘোমটা খুলল না। শ্যালিকা এ বিবাহের ষড়যন্ত্র করেছিল। বিবাহ উৎসব না জমলেও **'জমিল ফুল শয্যার রাত্রে।'** নববধূর সঙ্গে মিলনের জন্য বক্ষে অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে ছয়টি সন্তান ও আরও এক নবজাত শিশু নিয়ে প্রথম স্ত্রী প্রভা খাটে বসে তাঁর প্রতীক্ষা করছে। পুরুষ চরিত্র পরীক্ষায় শ্যালিকাই বাজি জিতলেন।

পুরুষ চরিত্র পরীক্ষায় শ্যালিকার রসিকতার মধ্য দিয়ে যে বাস্তব সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা মর্মান্তিক সন্দেহ নেই, কিন্তু গল্পে যে ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে, যে ঘটনা সংস্থাপন করা হয়েছে, যে কথাবার্তা, বাক্যালাপ ব্যবহার করা হয়েছে তা হাস্যোদ্রেক করার জন্য যথেষ্ট। এইভাবে বনফুল হাসির মধ্যে দিয়ে সিরিয়াস কথা বলেন।

"সুলেখার ক্রন্দন" গল্পেও বাস্তব ও স্বপ্নের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, তবুও যে মানুষের মন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে তৎপর তা হাস্যকর পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। গভীর রাত্রি, বাইরে জ্যোৎস্নার ফিনিক ছুটছে। একটি স্বপ্নময় আবেষ্টনীর মধ্যে দুগ্ধ ফেননিভ শয্যার উপর শুয়ে ষোড়শী তন্বী সুলেখা অঝোরে কেঁদে চলেছে। স্বামী বিপিনের কল্পনায় তখন প্রশ্ন জাগে **'কেন এ ক্রন্দন?'** — এ কি কুমারী জীবনের কোনও পূর্বরাগের স্মৃতি মথিত বেদনা? সিনেমায় যেতে পারেনি বলে কি অভিমান? পুত্রশোক? নাকি শাড়ির পাড় পছন্দ করা নিয়ে মনোমালিন্যের জের? বিপিনের মন বলছে **'এমন চাঁদনি রাতে কৈশোরের সেই অর্ধ-প্রস্ফুটিত প্রণয়-প্রসূন সহসা পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইতে পারে না কি?'** দূরে 'চোখ গেল' পাখি অবিশ্রান্ত সুরে ডেকে চলেছে। **'সম্মুখের বাগানে রজনীগন্ধাগুলি স্বপ্ন বিহ্বল — চতুর্দিকে জ্যোৎস্নার পাথার!'** এমন দুর্লভ ক্ষণে মনে নানা কথা ভাবতে ভাবতে মুখে শঙ্কার ছায়া নিয়ে বিপিন ঘরে ঢুকতেই সুলেখার ক্রন্দনের আসল কারণ জানা গেল। সুলেখা কাঁদছে অন্য কিছু ভেবে নয়— দাঁতের ব্যথায়। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার এই আকাশ-ছোঁয়া সত্যের প্রকৃত মর্ম উদ্‌ঘাটনে আমরা আমাদের হাসিকে থামিয়ে রাখতে পারি না।

৪। বিষয়-বস্তুকেন্দ্রিক গল্প ঃ গল্প-উপন্যাস তথা কথাসাহিত্য বিষয় আশ্রয়ী বিবৃতিমূলক রচনা। তাই কোন কোন সমালোচক গল্পের বিষয়-বস্তুকেন্দ্রিক শ্রেণী বিভাগকে ততটা গুরুত্ব দেন নি, কিন্তু গল্পের মূল আকর-আশ্রয়ীকে (বিষয়বস্তু)অবলম্বন করেই গল্পকার যে তাঁর রচনার ভাববস্তুকে কোথাও চরিত্র, কোথাও আবেগ, কোথাও নাটকীয়তা, কোথাও ব্যঞ্জনা, কোথাও মনস্তত্ব, কোথাও আরো অন্য কিছু রূপ দেন তা বলাই বাহুল্য। তবে সবকিছুর মূলে যে কাহিনীই প্রধান সে কথাও আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই গল্পের বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক শ্রেণী বিভাগও একটা বিভাগ হতে পারে নিশ্চয়ই, যেখানে প্লটের বিন্যাস কৌশলে গল্প গড়ে উঠেছে। এধরনের গল্প বনফুল মোটেও কম লেখেন নি এবং তাতে মুন্সিয়ানারও অভাব নেই। বনফুলের এধরনের গল্পগুলির মধ্যে আছে— 'দাঙ্গার সময়', 'ধনী-দরিদ্র' 'যোদ্ধা' ,'বল মা তারা', 'পাঠকের মৃত্যু', 'যুগান্তর', 'হাসির গল্প', 'ভাগ্য পরিবর্তনের ইতিহাস' ইত্যাদি।

"দাঙ্গার সময়" বাংলা-বিহারের ভয়াবহ দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত, প্লটকে ঘিরেই যার গল্পত্ব গড়ে উঠেছে। তবে এগল্পের আরেকটি বিশেষ গুরুত্ব আছে— তা হল বনফুলের ব্যক্তি-জীবন কথা। এগল্পে বনফুল হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ভয়াবহ ও করুণ চিত্র উদঘাটনের পাশাপাশি তাঁর ব্যক্তিজীবনের কিছু ঘটনাও সন্নিবেশ করে দিয়েছেন। যা আমরা তাঁর 'পশ্চাৎপট' গ্রন্থে পাই। আমি আগেই বলেছি, বনফুল অভিজ্ঞতাবাদী লেখক, তাঁর প্রায় সমস্ত গল্পই অভিজ্ঞতা সঞ্জাত, তবে তা শুধু অভিজ্ঞতার বিবরণ নয়, অন্তরভেদী বিশ্লেষণও। এগল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। **'পশ্চাৎপট'** থেকে আমরা জানতে পাই বনফুল শৈশবে বাড়ীর মুসলমান চাকর চামরুর বউয়ের স্তন পান করে বড় হন। কারণ, বনফুলের জন্মের পর তাঁর মা লীলাবতী অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাঁর বুকের দুধ শুকিয়ে যায়, প্রাণ বাঁচাতে বনফুলকে চাকর চামরুর বউয়ের দুধ খেতে হয়। বনফুলের মা কঠোর হিন্দুত্ববাদী নিষ্ঠাবতী মহিলা। কিন্তু সন্তানকে বাঁচানোর জন্য তিনি তাতে কিছু বিরোধিতা করেন নি। চামরুর বউ নিজের সন্তানের জন্য একটি স্তন রেখে অপরটি বনফুলকে খাওয়াতেন। গল্পে চামরুর নাম পাল্টে হয়েছে আব্দুল, চামরুর ছেলের নাম 'পশ্চাৎপটে' না থাকলেও গল্পে হয়েছে রহিম, আর চামরুর বউ হয়েছে রহিমের মা আর বক্তা বনফুল হয়েছেন গল্পবক্তা পরেশ।

গল্পের কথক পরেশ ও তাদের পরিবারের পরিচারক আব্দুলের পুত্র রহিম সমবয়সী এবং সহপাঠি ছিলেন শৈশবে। রহিমের মায়ের স্তন খেয়ে বড়ও হয়েছেন গল্পকথক পরেশ। বড় হয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে রহিম চাকরি পেয়ে মাকে নিয়ে পাটনায় চলে যায়। তারপর আর তাদের কোন খোঁজ-খবর পাননি গল্পকথক। এর মধ্যে শুরু হয় বাংলা-বিহার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সকলে ভীত, সন্ত্রস্ত। মুসলমানেরা হিন্দুদের উপরে বেছে বেছে আক্রমণ করছে। গ্রামের পর হিন্দু গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে করে দিচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে বর্শা, বন্দুক, লাঠি যে যা পারে তা দিয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছে। এমনি এক ভয়ঙ্কর উত্তেজনাপূর্ণ রাতে পাহারা দিতে দিতে দেখে তাদের পাঁচিলে গা ঘেঁসে দু'টি ছায়া মূর্তি তাদের বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছি। পাশের বাড়ির

হরেনবাবু এখবর দেয়। গল্পকথক পরেশ সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা নিয়ে দু'বার ফায়ার করে। তারপর **"কম্পাউণ্ডওয়ালের সেই ফাঁকাটার কাছে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়ালাম সবাই। হঠাৎ রাস্তার ওপারের অন্ধকার ঝোপটা থেকে আর্তকণ্ঠে হাহাকার করে উঠল কে যেন— ভাই পরেশ, আমি রহিম। পাটনা থেকে আমি মাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি তোমার কাছে আশ্রয় পাবো বলে। আমাদের বাঁচাও ভাই। গেট বন্ধ। দেওয়ালের সেই ফাঁকাটা দিয়ে মা বোধ হয় ভেতরে ঢুকে গেছেন—**

রক্তাক্ত দেহটাকে টেনে বার করা হল। দেখা গেল বুলেটটা ঠিক বামস্তন ভেদ করে বেরিয়ে গেছে।"

দাঙ্গায় এর চেয়ে মর্মান্তিক পরিণতি আর কি হতে পারে! যে মায়ের স্তন খেয়ে গল্পকথক পরেশ বড় হয়েছিলেন সেই মায়ের বুকের ছাতি যে পরেশের গুলিতেই বিদীর্ণ হবে, তা কি পরেশ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এমনই, যা মুহূর্তে আপনকে পর, বন্ধুকে শত্রুতে পরিণত করতে পারে, অতিপ্রিয় জনকে নিজেরই হাতে মরতে হতে পারে। বনফুল এগল্পে এ প্রশ্নই আমাদের সকলকে ছুঁড়ে দিয়েছেন যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আমাদের প্রিয়জনকেই আমরা হারাই, হোক না সে মুলমান, বা অন্য কেউ। দাঙ্গা কোন নতুন যুগের সূচনা করে না, তা মনুষ্যত্বকে বিনাশ করে। শিল্পী বনফুল মানুষের মনে মানবিকতাবোধের জাগরণে মানুষ বনফুলকে জড়িয়ে ফেলতে দ্বিধা করেন নি। এসব ক্ষেত্রেই বনফুলের স্বকীয়তা, মহনীয়তা, বলিষ্ঠতা, অনন্যতা।

"পাঠকের মৃত্যু" গল্পটি গল্প-আখ্যানকে কেন্দ্র করে রচিত। এগল্পে স্থূলকায় গ্রন্থের রস আহরণে 'পাঠকের মৃত্যু' কিভাবে হয় তা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। গল্প-কথক অনেকদিন আগে আসানসোল স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষায় বসে ছিলেন, পাশেই আর এক বাঙালি হাতে একখানি বেশ মোটা উপন্যাস নিয়ে বসেছিলেন। ট্রেন আসতে ঘন্টা তিনেক দেরি থাকায় গল্পকথক সেই অপরিচিতের মোটা উপন্যাসটি **'দুঃসহ গ্রীষ্মের দারুণ দ্বিপ্রহরে'** গভীর মগ্নতার সঙ্গে পড়ছিলেন। তখন গল্প কথকের মনে হল এক **'অদ্ভুত উপন্যাস'**। উপন্যাসটি এতই ভালো লেগেছিল যে পড়া শেষ না হওয়ায় সেই ট্রেন ছেড়ে দিলেম। কিন্তু তবুও সমগ্র উপন্যাস পড়া শেষ হল না, কারণ শেষের বেশ কিছু পাতা ছিল না। দশ বছর পর গল্পকথকের ভাগিনেয়ীর শ্বশুর বাড়িতে সেই বইটি দেখতে পাওয়ায় থাকার কথা না থাকলেও **'বইখানির লোভে থাকিয়া গেলেন।'** কিন্তু বইটা পড়তে পড়তে গল্প-কথকের **"কেমন যেন গোলমাল"** মনে হল, কারণ সেই আসানসোলের স্টেশনের মত উপভোগ্যতা কিছুতেই আসছিল না। তখন গল্পকথকের মনে হল— **"এ কি সেই বই যাহা আমি আসানসোল স্টেশনে দারুণ গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে উর্দ্ধশ্বাসে তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম? এমন রাবিশ মানুষে লেখে!**

এ শেষ করা তো অসম্ভব! দশ বৎসর আগেকার সেই উৎসুক পাঠক কবে মারা গিয়েছিল টেরও পাই নাই।

এবারও বই শেষ হইল না।"

আসলে গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা পড়ে শেষ না করতে পারলে তার রস পুরোপুরি অনুভব করা যায় না। স্থূলকায় গ্রন্থ পাঠকের মনকে আহত করে, রস আহরণে ব্যাঘাত ঘটায়, ইচ্ছে থাকলেও অনেক সময় সময়াভাবে সমগ্র বই পড়া হয়ে ওঠে না, তাই তার রস গ্রহণেও বিফল হয় পাঠক, মৃত্যু ঘটে পাঠকের। বর্তমান ব্যস্ত-সমস্ত যুগে মানুষের অত সময় নেই যে মোটা মোটা বই পড়ে সময় কাটায়, অবশ্য সময় কাটাতে বাধ্য হলে (যেমনটি আসানসোল স্টেশনে গল্পকথকের হয়েছিল) অনেক সময় মোটা বইও ভালো লাগে। কিন্তু গল্পকার এগল্পে বিপুল কলেবর গ্রন্থ কিভাবে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করে **'রাবিশ'** শব্দটি থেকে তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। গল্পটি এক অর্থে বনফুলের আত্মসমালোচনা, কেননা যিনি **'ডানা' 'ভুবন সোম'** –এর মতো বড় বড় উপন্যাস লিখেছেন, তিনি মোটা বই লেখার পক্ষে এমন সওয়াল করতে পারেন তা ভাবাই যায় না। নিজের রচনার মধ্য দিয়ে নিজের সমালোচনা করা একজন মহৎ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। এও বনফুলের বিশিষ্টতার একটি দিক।

৫। **রূপকধর্মী** গল্প ঃ রূপকধর্মী গল্পে বাইরের রূপের অন্তরালে অন্তরের রূপ অন্বেষণ করা হয়। এই শ্রেণীর গল্পে একটি বাহ্যিক ও একটি আভ্যন্তরীণ কাহিনী প্রায় সমান্তরালভাবে চলে। এই শ্রেণীর গল্প রচনাতেও বনফুল সমান রূপদক্ষ শিল্পী। তাঁর ব্যক্তি চরিত্রেও দু'টি সত্তা সব-সময় ক্রিয়াশীল থাকত-একটি কল্পনাপ্রবণ মন, অন্যটি বিজ্ঞানী মেজাজের মন। এই দ্বৈত সত্তা পরস্পর একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করত। তাই বাস্তব জীবন কাহিনী ভাবনাকে আশ্রয় করে একটি বিমূর্ত রূপ ধরার চেষ্টা করলে তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে **'বিজ্ঞানী মেজাজের'** মন। তাই রূপ থেকে রূপান্তরের রূপ নির্মাণে রূপকধর্মী গল্পে বনফুলের ভাবনা কে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। অতি সাধারণ ঘটনার রূপকে তিনি জীবনের বৃহৎ ভাবনাকে তুলে ধরেছেন। এই শ্রেণীর গল্পে বিষয় থেকে বিষয়াতীতের Action থেকে Abstraction এর দিকে যাত্রা করে। এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে আছে— 'রূপকথা','আত্মপর', 'নিমগাছ', 'স্বপ্ন-কাহিনী', 'পাখী', 'পক্ষী পুরাণ', 'নুড়ি ও তালগাছ', 'রাত-দুপুরে' ইত্যাদি।

"রূপকথা" গল্পটিতে রূপকের আড়ালে জীবনের এক গভীর সত্য প্রকাশিত হয়েছে। পনের লাইনের এই গল্পটিতে মানুষের জীবন ভাবনার অতি জটিল বাস্তব উপলব্ধি দ্যোতিত হয়েছে। সুন্দর জ্যোৎস্না, চারিদিকে জনমানসের সাড়া নেই, গভীর রাত্রি। দূর থেকে নদীর কল কল ধ্বনি ভেসে আসছে। নির্জন প্রান্তরে স্বপ্ন-বিহ্বল দৃষ্টিতে বক্তা দেখছেন, জ্যোৎস্নায় ভূবন ভেসে যাচ্ছে, কুৎসিৎ জিনিসও সুন্দর হয়ে উঠেছে, আকাশের কালো মেঘেও রুপালি আবেশ। বক্তা যার অপেক্ষায় সময় কাটাচ্ছিলেন সে আসছে, **"সর্বাঙ্গে তাহার জ্যোৎস্নার আকুলতা। তাহার নূপুর শিঞ্জনে জ্যোৎস্না শিহরিয়া উঠিতেছে।"** সে বক্তার পানে চেয়ে হাসল। **"সহসা একটা দুর্ধর্ষ দস্যু কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই কিশোরীর বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। জ্যোৎস্নায়**

শায়িত ছোড়াটা চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল। রক্তের ধারায় জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেল। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া লোকটাকে ধরিলাম। ধরিয়া দেখি— এ কি, এ যে আমারই বিবেক!"

বনফুল চিরকালই সুন্দরের উপাসক ছিলেন। তাই চন্দ্রালোকিত রাতে শিল্পী বনফুল স্বপ্নাবিষ্ট চিত্তে সুন্দরের আরাধনায় মগ্ন, প্রকৃতির এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের প্রকাশ যেন বনফুলের চিরআকাঙ্ক্ষিত এক বিশেষ মানস প্রবণতা। এখানে সুন্দরী কিশোরী যেন বিশ্ব প্রকৃতির রূপক, আর হত্যাকারী দস্যু যেন শিল্পী প্রাণেরই পাশবিক প্রবৃত্তির এক নগ্ন প্রকাশ।

এই শ্রেণীর আরেকটি উৎকৃষ্ট গল্প "স্বাধীনতা জন্ম"। গল্পটির মধ্যে বনফুলের মনের গোপন স্বাধীনতা স্পৃহা রূপকের মোড়কে প্রকাশিত হয়েছে। ডিমের ভিতর থেকে ভ্রূণের ফেটে বেরোনোর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয়েছে। ডিমের ভিতর ভ্রূণের মধ্যে নিহিত ছিল অফুরন্ত স্বপ্ন, তা হল— **"স্বাধীনতার স্বপ্ন। আকাশে উড়িবে। আকাশ কি তা জানা ছিল না, কিন্তু আকাশের স্বপ্নটা ছিল। আকুলতা ছিল, আগ্রহ ছিল, একটা দুর্দম প্রেরণা সমস্ত বাঁধা অপসারণ করিয়া ছুটিয়া যাইতে চাহিয়াছিল অসীম শূন্যে; কিন্তু বাধা দুস্তর।"** এভাবে কাহিনীর শুরুতেই গল্পকার স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। কিন্তু এর পরই কাহিনী কিছু আজগুবি কথায় পূর্ণ। কিন্তু আজগুবি হলেও তা একটু গভীরভাবে ভাবলে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে হাজির হয়। নাটকীয় ভঙ্গিতে এরপর ডিমের ভিতর থেকে ভ্রূণের বিবর্তনের কথা বর্ণিত হয়েছে। জগতের প্রাণ প্রবাহের মধ্যে দ্বৈত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, এক প্রাণ চায় স্বাধীনতার মুক্তি, আরেক প্রাণ চায় তাকে গ্রাস করতে। কিন্তু বহু বাধা সত্ত্বেও ডিমের ভ্রূণের ডিম ফেটে বেরিয়ে স্বাধীনতা উপভোগের আকুতি প্রকাশিত হয়েছে। অবশেষে হঠাৎ একদিন ডিম ফেটে সে ভ্রূণ এক পক্ষীশাবক হয়ে বেরিয়ে আসে। তার প্রাণ তখন স্বাধীনতাকে উপভোগ করার জন্য উৎসুক। সেই পক্ষীশাবকের বর্ণনায় যে ভাষা ও ভাব যুক্ত করেছেন তা বৃহত্তর ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে— **"পক্ষীশাবক বাহির হইয়া আসিল।কুৎসিত, কদাকার। পালক নাই, রঙ নাই, সুর নাই, গান নাই। ধনীর প্রাসাদে নয়, অলঙ্কৃত টেবিলে নয়, মহার্ঘ প্লেটের উপরে নয়, অতি তুচ্ছ খড়কুটার শয্যায় শুইয়া আছে। আশেপাশে দুলিতেছে কয়েকটা সবুজ ডাল, মাথার উপরে অনন্ত নীলাকাশ। নিতান্ত অসহায়। সর্প, শ্যেণ, শিকারী, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দৃশ্য-অদৃশ্য শত্রু চর্তুদিকে। ও কি বাঁচিবে?"** তার পর গল্পকথকের সেই বিশেষ কাব্যিক অনুভূতি— **"নিশ্চয়ই বাঁচিবে। ও-ই একদিন আকাশে উড়িবে। উহার মধ্যেই নিহিত আছে গরুরের শৌর্য্য, রাজহংসের মহিমা। উহারি পালকে জাগিবে ইন্দ্রধনুর বর্ণসম্ভার, উহারই কণ্ঠে ফুটিবে অনবদ্য সঙ্গীত-মাধুরী।"**

এভাবে একটি ডিমের মধ্যে থাকা ভ্রূণের স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে শত প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করে নতুন স্বাধীনতাকে অনুভব করার উদ্দীপনা এবং আগামী দিনে সৌন্দর্য উপলব্ধির সম্ভাব্যতার মধ্য দিয়ে। গল্পটি ১৯৪৭ সালের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত ('শনিবারের চিঠি', ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ, ভাদ্র মাস)। তাই গল্পটিতে যে বনফুলের অবরুদ্ধ মনের সদ্য

স্বাধীনতা প্রাপ্তির একটি উচ্চকিত আবেগ কাজ করেছে, তা বলা বাহুল্য। তবু সেই আবেগ বৈজ্ঞানিক কল্পনায় নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় একটি উচ্চাঙ্গের গল্প আমরা তাঁর কলম থেকে উপহার পেয়েছি।

৬। অলৌকিক গল্প ঃ বনফুলের অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি বিশেষ আবেদন নিয়ে আমাদের মনে হাজির হয়। অতিপ্রাকৃত গল্পে একটি অলৌকিক রহস্য গল্পের পটভূমি নির্মাণে, এমন কি কাহিনী বয়নেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তবে অতিপ্রাকৃত গল্প মানে যে পুরোপুরি বাস্তব নিরপেক্ষ গল্প তা নয়, কেননা গল্পের বাতাবরণটি বাস্তবাতিরিক্ত রহস্যময় আবরণে মোড়া থাকলেও তার শেকড়টি কিন্তু পোঁতা থাকে বাস্তবের মাটিতেই। নচেৎ তা Fancy থেকে Fantasy বা উদ্ভট গল্পের আবেদন নিয়ে আসে। তা যাইহোক, এধরনের অলৌকিক গল্প সৃষ্টিতে বনফুল সমান নিপুণ। কেননা বনফুল তাঁর অলৌকিক গল্পগুলিতে যে রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন তাতে বৈজ্ঞানিক মানসিকতা মিশে গল্পগুলিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। এ ধরনের গল্পগুলি হল— 'প্রজাপতি', 'রূপকথা', 'অধরা', 'অবর্তমান', 'হিসাব', 'একালের অদ্ভুত গল্প', 'প্রমাণ', 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ', 'মেঘলা দিনে', 'পাখী বদল', 'ফ্রেমে বাঁধানো কার্ডবোর্ড' প্রভৃতি।

বনফুল একদিকে ছিলেন কল্পনাবিলাসী, আরেক দিকে ছিলেন 'বিজ্ঞানী মেজাজের' সাহিত্যিক। এই দুটি সত্ত্বা তাঁর গল্পে বারবার মিলে মিশে এক আলাদা আবেদন সৃষ্টি করেছে। এই দ্বৈত সত্তা মিলেমিশে মানবমনের এক অলৌকিক রহস্য সৃষ্টি করেছে **"প্রজাপতি"** গল্পে। এক পাতারও কম, মাত্র সংক্ষিপ্ত ৩৪ টি বাক্যে গল্পটি রচিত। আত্মকথনের ভঙ্গীতে লেখক গল্পটিতে একটি প্রজাপতি তাঁর মৃত স্ত্রীর প্রতিমূর্তি হিসেবে মনে করে এমনভাবে ঘটনাজাল বিন্যাস করেছেন যাতে একটি অলৌকিকতার স্পর্শ আছে। বর্ণনাটি এরকম— **"নীল শেড দেওয়া ইলেকট্রিক বাতিটার উপর কয়েকদিন থেকে একটি প্রজাপতি এসে বসেছে। যতক্ষণ আমি টেবিলে বসে লেখা-পড়া করি ও শেডটির উপরে চুপ করে বসে থাকে। আশা মারা যাবার কিছু দিন পর থেকে ওই আমার সন্ধ্যাবেলার সঙ্গী।"** বন্ধু সোমেশ্বর ইদানিং প্রায়ই আসছে কারণ তার বোন বেলার সম্বন্ধে বক্তা 'একটু দুর্বলতা' পোষণ করেছে। বন্ধু সোমেশ্বর বক্তাকে তার বোন বেলাকে বিবাহ করার জন্য পিড়াপীড়ি করলেও রাজি না হওয়ায় দ্বিজেনের সঙ্গে বেলার বিবাহ দেবার কথা বলতেই বক্তা বলে বসে **"আমি বিয়ে করব। তবে কিছু দিন সময় দাও ভাই।"** কথা মতো বক্তাকে সময় দিলেন সোমেশ্বর। সোমেশ্বর চলে যাবার পর যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য। হঠাৎ আশার কণ্ঠস্বরে কে যেন বলে উঠল— **"তাহলে আমার দায়িত্বও ফুরোল— আমিও চললাম। প্রজাপতিটা উড়ে জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।"**

এই গল্পটিতে বক্তা যেভাবে কাহিনী বিন্যাস করেছেন তাতে একটি অতীন্দ্রিয়তার স্পর্শ

আছে, যা আমরা কার্য-কারণ সূত্রে ব্যাখ্যা করতে পারি না, অথচ যাকে মন পুরোপুরি অস্বীকারও করতে পারে না। গল্পে প্রজাপতির মধ্য দিয়ে বক্তা তার মৃত স্ত্রী আশার যে রহস্যময় বাতাবরণ তৈরী করেছেন তাতে গল্পটি অলৌকিকতার জগতে পারি দিয়েছে। এই অলৌকিক গল্পের মধ্যে একদিকে পুরুষ চরিত্রের গোপন দুর্বলতার প্রতি যেমন ইঙ্গিত করা হয়েছে, তেমনি অপার প্রেমের অবচেতন বাসনাকেও প্রতিরূপ দেওয়া হয়েছে।

"হিসাব" গল্পটিকে অলৌকিক শ্রেণীর একটি অন্যতম গল্প হিসেবে গ্রহণ করা যায়। গল্পটি বাস্তবতার সূত্র ধরে অলৌকিক জগতে পাড়ি দিয়েছে। হিসেব মিলিয়ে সব কিছুর কারণ সব সময় বিশ্লেষণ করা যায় না। পদ্মাবতী বা পদির যার সঙ্গে হিসেব মিলছিল , তার সঙ্গে বিয়ে হল না, হিসেব মিলল চার ছেলে মেয়ের পিতা রামচরণের সঙ্গে। রামচরণের স্ত্রী হঠাৎ করে মারা যায়, তাই রামচরণ জীবনের অবলম্বন হিসেবে পদিকে বিয়ে করে বসে। পদি অবশ্য রূপসী ছিল, গৃহকর্মা নিপুণাও। তবুও হিসেব তো সব সময় মেলে না। বিয়ে করে যাবার দিন বক্তা ও সকলে স্টেশনে গেলেন। রামচরণ উঠল, ছেলে-মেয়েরা পাশের কামরায় ছিল। **"পদি উঠেই এক কাণ্ড করে বসল। উঠেই উপরের দিকে চেয়ে 'আঃ' বলে চিৎকার করে উঠল সে। তারপরই অজ্ঞান। সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল। মুখের সমস্ত হাসি মিলিয়ে গেল— ফুটে উঠল আতঙ্ক। উপরের দিকে হাত জোর করে বলতে লাগল, — আমার কোন দোষ নেই, আমাকে জোর করে বিয়ে করেছে, আমি কিছু বলিনি— কিছু কোরো না, তোমার পায়ে ধরি.....।"** পদি এরপর পাগল হয়ে গেল। তারপর বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা পদির অবচেতন মনের বিশ্লেষণ করে দুই আর দুয়ে চারের হিসেব মেলাতে যখন ব্যস্ত তখন **'আর একটা কাণ্ড ঘটিল।'** ছোট্ট একটা মাদুলি পরে পদি সুস্থ হয়ে গেল হঠাৎ।

এইভাবে বনফুল বাস্তব আর বাস্তবাতিরিক্ত পরিবেশ সৃজনের মধ্য দিয়ে গল্পে এক অলৌকিক আবহ সৃষ্টি করেছেন বারে বারে। যা আমাদের বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণে, হিসেব নিকাশে মিলে না, আমরা মেলাতে চাইলেও মেলাতে পারি না। এসব গল্পে ভৌতিক পরিবেশ নয়, অলৌকিক বাতাবরণেই গল্প রস জমাট বেঁধেছে।

৭। চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প ঃ বনফুল জীবন-সন্ধানী শিল্পী। সেই জীবন সন্ধানে মানব চরিত্রের রহস্য ও বৈচিত্র্যই তাঁকে সবচেয়ে আকর্ষণ করে, **'ইন্সপায়ার'** করে। মানব চরিত্রের বিবিধ স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর চরিত্র মুখ্য গল্পগুলি বিশেষ আকর্ষণীয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানব জীবনকে, মানব চরিত্রকে দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। তাই তিনি বলেছিলেন— **'মানুষই আমার বিষয় ও প্রেরণা।'** এই মানুষের বিচিত্র স্বভাব অন্তরঙ্গ পরিচয়, প্রবৃত্তি, তার আচরণ, শুদ্ধতাবোধ অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে তাঁর গল্পে চিত্রিত। এই শ্রেণীর গল্পগুলির মধ্যে আছে 'অর্জুন মণ্ডল', 'চম্পা মিশির', 'যোগেন পণ্ডিত', 'রঘুবীর রাউত', 'দত্ত মহাশয়', 'মিস্টার মুখার্জী',

'অমলা', 'চৌধুরী', 'খুড়ো', 'মহামানব কেনারাম ও ক', 'নিত্য চৌধুরী', 'চম্পা মিশির' ইত্যাদি।

বনফুলের বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে। বিংশ শতাব্দীর সেই বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভাঙাচোরা সমাজের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে বনফুল মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্তের যে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, তাদের মর্যাদাবোধে গভীর আত্মদৈন্য সৃষ্টি করেছিল **'মিস্টার মুখার্জী'** গল্পটিতে সে চিত্রই বনফুল তুলে ধরেছেন। মিস্টার মুখার্জী গল্পকথকের আড্ডায় মধু মামার মারফৎ যোগ দেয়। লোকটির কথাবার্তায় বিশেষত্ব আছে। তার কথাবার্তা শুনলে মনে হয় **'সমস্ত দুনিয়াখানা তাহার হাতের মুঠার মধ্যে রহিয়াছে।'** কিন্তু গল্পকথক জানেন এসবই তার আত্মম্ভরিতা, কেননা **"মিস্টার মুখার্জী যে একজন উঁচুদরের মিথ্যাবাদী এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল না। কিন্তু আমরা কোন দিন মুখার্জীর কথার প্রতিবাদ করি নাই। করি নাই, কারণ তাঁহার মিথ্যা কথাগুলি শুনিতে বেশ লাগিত। এবিষয়ে তিনি প্রকৃত আর্টিষ্ট ছিলেন। রুগ্ন অনাহার ক্লিষ্ট চেহারা। ক্ষৌরের অভাব মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট। আধময়লা সাহেবী পোশাক গায়ে। শুনিয়াছি লোকটি বিলেত-ফেরত পৃথিবীর অনেক দেশ নাকি দেখা আছে- নিজেই এসব বলিতেন। লোকটি নিতান্ত মূর্খ যে নন তাহা অবশ্য তাহার কথাবার্তাতেই বোঝা যাইত। তিনি নিজেই একদিন বলিয়াছিলেন যে তিনি ডবল এম.এ.। তিনবার প্রফেসারী পাইয়া নাকি ত্যাগ করিয়াছেন— ইত্যাদি।"** এহেন মিস্টার মুখার্জী গল্পকথকের আড্ডায় মহাত্মাজী, মিসেস্ নাইডু, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, বার্নাড শ', বলডুহন, ব্লুম শেক্সপীয়ার, গ্যেটে প্রমুখকে তাঁর কথাবার্তায় গুরুত্বহীন করে তুলেছেন। সারা পৃথিবী— নিউ ইয়র্ক, রোমে, প্রাগে, বার্লিনে, টোকিওতে, এমন কি ভলগা নদীর তীরেও বহুদিন কাটিয়েছেন, মঙ্গলগ্রহে তাঁর জমি কেনার ইচ্ছেও আছে। মুখার্জী কখনো আবার কোটিপতি বা কোটিপতিদের কন্যার সঙ্গে 'লাঞ্চ'ও করেন, নানা সামগ্রী তাদের উপহার দেন মাঝে মাঝেই। এরপর একদিন আড্ডা ভাঙতে অনেক রাত হয়ে যায়। ট্রাম না থাকায় গল্পকথক পদব্রজেই বাড়ি ফেরার পথে একটু দূরে একটা অন্ধকার গলির মোড়ে একটি ব্যাগে **'মদনানন্দ মোদক'** বিক্রি করতে দেখেন মিস্টার মুখার্জীকে। গল্পকথককে দেখে কিন্তু অপ্রতিভ হয়নি মুখার্জী, বরং সপ্রতিভভাবে বলেছে সেই মাদকের উপকারিতা। বক্তা নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর গল্পকথক বলছেন— **"আমার চমক ভাঙিল যখন মিস্টার মুখার্জী তাঁহার ডান হাত দিয়া সহসা আমার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন— "একটা অনুরোধ —একথা যেন বলবেন না কাউকে। সবাই হয়তো জিনিসটা ঠিক বুঝবে না। ভাববে, হয়তো অভাবে পড়েই—"** এরপর গল্পের আড্ডায় আর মিস্টার মুখার্জীকে কোনদিন দেখা যায়নি।

গল্পের শেষেই গল্পকার বনফুল তাঁর জীবনবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মিস্টার মুখার্জী একটু আত্মগৌরবী, তিনি 'ভদ্র' বড়লোক, জ্ঞানী গোছের হবার চেষ্টা করতেন সবসময়, কিন্তু আর্থিক অসামর্থের কারনে তা পারছেন না। তবে আর্থিক অস্বচ্ছলতা যতই থাক, আত্ম অহংকারী মনোভাব যত থাক, তিনি যে 'শিক্ষিত' তা নিশ্চিত। তাঁর সেই আর্থিক যন্ত্রণা, আত্মিক যন্ত্রণাকে

দুর্বিসহ করে তুলেছিল। তার থেকে মুক্তি পেতেই আড্ডায় তাঁর **'রাজা-উজীর বধ'**। তাঁকে বাঁচতে হবে তো! আত্মক্ষয়ী এই জীবন সংগ্রামে স্বাপ্নিক ভাবনাই কিছুটা যন্ত্রণার লাঘব করতে পারে। কেননা, মদনানন্দ মোদক বিক্রি করে তাঁর কতটুকু আয় হয় তাতে সন্দেহ আছে। তাই গল্পকথকের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় নিজের কাছে নিজেই যেন ধরে পড়ে যায় মিঃ মুখার্জী। অভাবে পড়েই যে তাঁর এই অবস্থা একথা তো সত্যি! আপাত অর্থে তাকে মিথ্যবাদী বলে মনে হয়। কেননা, আড্ডায় সমস্ত মিথ্যাকথাই বলতেন। এবং সে কারণে শিল্পী বনফুলের কাছে ধিক্কৃত হবার কথা, কিন্তু বনফুল তা করলেন না, পরিবর্তে শিল্পীর সমবেদনা মিশিয়ে দিলেন। আসলে মিস্টার মুখার্জীর এই মিথ্যাবাদীতার মূলে তাঁর তো কোন অপরাধ নেই, যে শিক্ষিত অথচ পেট চালানোর জন্য যাঁকে 'মদনানন্দ মোদক' ফিরি করতে হয়, তাঁর প্রতি সহানুভূতি ছাড়া আর কি বর্সিত হতে পারে? মুখার্জী'রা হলেন 'সরল পাপী', সে কারণে তাঁরা বনফুলের 'স্নেহের' পাত্র।

"মহামানব কেনারাম ও ক" গল্পে বনফুল এমন এক শ্রেণীর চরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করেছেন যারা অতিরিক্ত মহনীয়তা দেখাতে গিয়ে নিজের ঘর-সংসারের সর্বনাশ পর্যন্ত ডেকে আনে। কেনারাম কুণ্ডু মহামানব সাজতে গিয়ে এবং তার চিন্তাভাবনা ও কথাবার্তা, ব্যবহার মহামানব সুলভে মনে করতে করতে বন্ধু 'ক' তার স্ত্রী পুঁটিবালার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। তবু কেনারাম 'ক'-কে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়নি। কেনারাম 'ক'-কে কথার মধ্য দিয়ে আঘাত করলে যখন উপলব্ধি করে 'ক'- এর মনে তার কথায় 'অনুশোচনার মেঘ' দেখা দিয়েছে, যা আপাত দৃষ্টিতে হাসি বলে মনে হচ্ছে, তা হাসি নয়। তখন কেনারামের সমস্ত রাগ জল হয়ে যায়, মহামানব সুলভ আনন্দে সে যে লোকে গিয়ে হাজির হয় তার অস্তিত্ব 'ভূগোলে' পাওয়া যায় না। এমন করতে করতে নারী ধর্ষণকারী গুণ্ডা 'ক' একদিন কেনারামের স্ত্রী পুঁটিবালাকে নিয়ে অন্তর্ধান করে, কিন্তু তবুও কেনারাম নিজেকে মহামানব প্রমাণ করার জন্য কোন রকম উত্তেজনা দেখায় নি, বরং আত্মসমালোচনা করেছে— সে বলেছে, **"অপরের দোষ দেখিয়া নিজের কথা ভুলিও না। 'ক' চরিত্রহীন গুণ্ডা, কিন্তু আমি একথা ভুলিতে পারি না যে, আমার পিসতুতো শালার মাসতুতো ভাইও তাই। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, সূর্যের স্পট আছে। গোলাপে কন্টক আছে, পঙ্কজিনীর জন্ম পঙ্কে। অপরের বীভৎস আচরণ দেখিলে বারবার এই কথাই আওড়াইবে যে, আমরাও বীভৎস। তাহা হইলেই শান্তি পাইবে, সমস্যারও সমাধান হইয়া যাইবে! লোকে যদি তোমাকে 'ঘর জ্বালানে পর ভোলানে'বলে বলুক, লোকের কথায় কান দিও না। সত্যকে আশ্রয় কর।"** এভাবে কেনারাম নিজেকে মহামানব প্রমাণ করেই ছাড়তে চায়। গল্পের শেষ বাক্য— **'কেনারাম এখনও পাগলাগারদের বাইরেই আছে।'** লেখকের এই তির্যক বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা কেনারাম তার স্ত্রীর সঙ্গে 'ক'-এর আপত্তিকর অবস্থায় দেখাতেও যে ব্যবহার করেছে এবং কেনারামের যে মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে তা একজন পাগলের সঙ্গেই তুলনীয়। কিন্তু কেনারাম

পাগলাগারদের বাইরে আছে, কারণ, কেনারাম পাগল নয়, মহামানব, কেননা, **'মহামানবদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা।'** আসলে আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন চরিত্র দোষে দুষ্ট, কেউ **'ধোয়া তুলসীর পাতা নই।'** অপরের চরিত্র নিয়ে কথা তোলার আগে নিজের দিকে তাকালে আমাদের চরিত্রের **'বীভৎসতা'** লক্ষ্য করা যাবে। তাই প্রথমে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি। এই আত্মশুদ্ধি না ঘটলে মহামানব হওয়া সম্ভব নয়। আত্ম সংশোধন-ই আমাদের মহৎ মানুষে পরিণত করতে পারে বলে বনফুল মনে করতেন। কেনারামের আচরণ তাই আমাদের অস্বাভাবিক ঠেকলেও এর মধ্য দিয়ে বনফুল জীবনের এক শাশ্বত সত্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

৮। **নাটকীয় গল্প ঃ** নাটক গল্প নয়, গল্প নাটক নয়। দুটোই স্বতন্ত্র শিল্পকলা। এ দু'য়ের মধ্যে সাযুজ্য এক জায়গায় তা হল পাঠক মনে অপ্রত্যাশিত চমক জাগানোয় এবং দর্শক মনে টান টান উত্তেজনা জাগরিত করে রাখার মধ্যে যে এর পর কি হবে? নাটক একটি মিশ্র শিল্প বা Mixed Art এবং তা Performing Art বা উপস্থাপনীয় শিল্প। এতে থাকে ঘটনা, চরিত্র, সংলাপ, মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যসজ্জা, নাট্যকারের জীবনদর্শন ইত্যাদি। তবে গল্পেও গল্পকারের কোন একটি বিশেষ জীবনভাবনা প্রকাশ পায়। কথা সাহিত্য বিবৃতিমূলক রচনা হওয়া সত্ত্বেও তা পাঠক মনে আকস্মিক চমক জাগিয়ে তোলার জন্য নাটকের সঙ্গে তুলনীয় হয়। Allardyce Nicoll 'Dramatic' বা নাটকীয় শব্দের তাৎপর্য বোঝোতে গিয়ে বলেছেন— **"The word 'Dramatic' connotation signifying the unexpected, with usually, the suggestion of a certain shock occasioned either by a strange coincidence or by the departure of the incidents narrated from the ordinary tenor of daily life.Now, the very fact that this word 'dramatic' can thus the freely and commonly used must indicate that in this strangeness, unexpectedness, and sense of shock the public recognizes something which it find as a main element in work of dramatic art."**[৯] বনফুল তাঁর গল্পের যেভাবে কাহিনী বিন্যাস করেছেন, অধ্যায় বিভাজন করেছেন, গল্প গঠন করেছেন, যে ভঙ্গিতে গল্পটি বলেছেন, তাতে নাটকের সেই অপ্রত্যাশিত চমক পাঠক মনে জাগে; যে কারণে তাঁর গল্পগুলি এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যদিও ছোটগল্পের সমাপ্তিতে একটা নাটকীয় চমক থাকেই, তবু বনফুলের এই শ্রেণীর গল্পগুলি পরম উপভোগ্য হয়েছে। গল্পে নাটকীয় রস পরিবেশনে তিনি সিদ্ধহস্ত। এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে আছে— 'নিপুণিকা', 'উৎসবের ইতিহাস', 'চিঠি পাওয়ার পর', 'জৈবিক নিয়ম', 'আইন' ,'মুহূর্তের মহিমা' ইত্যাদি।

বনফুলের প্রায় সব গল্পেই কিছু না কিছু নাটকীয়তার স্পর্শ আছে। কিন্তু **"চিঠি পাওয়ার**

পর" গল্পটি অদ্যন্ত নাটকীয়। আটটি অধ্যায়ে গল্পের বিষয় নির্বাচন, পরিবেশ রচনা, ঘটনা সংস্থান— সব মিলিয়ে গল্পটিতে অনবদ্যভাবে নাটকীয় রস জমাট বেঁধেছে। গল্পের নায়ক পূর্ব প্রেমিকা অনিতার একটি চিঠি পাওয়ার পর থেকে নায়কের মনের যে অস্থিরতা, যে উদ্বেগ তাতে নাটকীয়তা চরম মাত্রায় প্রকাশিত। অমিতা চিঠি লিখেছে— "উনি লক্ষ্ণৌ বদলি হয়েছেন। পাটনা হয়েই আমরা যাব। আমাদের গাড়ি পাটনায় রাত্রি সাড়ে আটটায় পৌঁছবে। পাঁচ মিনিট মাত্র থামবে। আপনি যদি স্টেশনে আসেন সুখী হব। অনেক দিন আপনাকে দেখিনি। দেখতে ইচ্ছা করে। আসবেন তো? আশা করি আমাকে একেবারে ভুলে যান নি।"—এই চিঠি পাওয়ার পর নায়কের চরম অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে। গল্পের শুরুতেই গল্পের ভাষ্যকার নায়ক তা জানিয়ে দিয়েছেন— 'সমস্ত দিনটা যেন আর কাটতে চাহিতেছে না।' আবেগে অস্থির হয়ে পড়ছে নায়ক। তাঁর মনে পূর্বের সমস্ত স্মৃতি যত জেগে উঠছে তিনি ততই উদ্বেল হয়ে পড়ছেন। অমিতা গল্পের নায়ককে ত্যাগ করেন নি, প্রথম জীবনে তার যক্ষ্মা হওয়ায় গল্পের নায়ক স্বেচ্ছায় অমিতাকে ত্যাগ করেছিল। অমিতা প্রথমটা মেনে নিতে না পারলেও শেষে তা মেনে নেয় এবং অন্যত্র বিবাহ করে। তার স্বামী বড় চাকরী করে, স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, তবুও যেন অমিতা সুখে নেই বলে মনে হয় নায়কের। অমিতার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্য অমিতার প্রিয় ডালমুটের অর্ডার দেয়, বন্ধুর বাড়ি থেকে সাদা গোলাপ জোগাড় করে অমিতাকে দেবার জন্য, জামা অপরিষ্কার থাকায় নিজেই তা কাঁচে। সেই পাঁচ মিনিটে অমিতাকে কি বলবে এই ভেবে তার সমস্ত দিন চলে যায়। তারপর গল্প Falling Action -এর পথে ধাবিত হয়। নায়ক সমস্ত কিছু জোগাড়-যন্ত্রণা করে ডালমুট ও গোলাপ নিয়ে স্টেশনে পৌঁছায়। গল্পকথকের ভাষায়— "ডালমুট ও গোলাপ লইয়া আমিও অন্যমনস্কভাবে প্লাটফর্মে পায়চারি করিতেছি। সমস্ত অঙ্গ জুড়িয়া একটা বেদনার অনুভূতি ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছে। কতক্ষণে আসিবে ট্রেনটা? একজন রেলওয়ে কর্মচারী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, লক্ষ্ণৌগামী ট্রেনটির আসবার আর কত দেরি আছে।

তিনি নির্বিকার ভাবে বলিলেন— "সে ট্রেনত আটটা পঁয়ত্রিশে ছেড়ে গেছে। এ অন্য ট্রেন আসছে। এখন ত সাড়ে ন'টা।

সেকি!

'নিজের হাত ঘড়িটা দেখিলাম

সাড়ে সাতটা বাজিয়া রহিয়াছে!

সহসা মনে হইল আজ সকালে ঘড়িতে দম দিই নাই। অমিতার চিঠি পাইয়া এমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম যে ঘড়িতে দম দেওয়ার কথা মনে ছিল না।

বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম।"

—এখানেই গল্পের শেষ। গোটা গল্প জুড়ে ব্যর্থ প্রণয়ের একটি তীব্র আকুলতা গল্পটিতে

চমক সৃষ্টি করেছে। বনফুল কখনই আতিশয্যকে সহ্য করেন নি, লঘু বা গুরু কটাক্ষে তাকে বিদ্ধ করেছেন। এখানেও কি তাই করেছেন? না, তা মনে হয় না। আসলে প্রেম জীবনের এক অমূল্য সম্পদ, যে প্রেম নায়ক স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই প্রেম আবার ফিরে হয়তো আসলেও আসতে পারত। কিন্তু বনফুল তা করলেন না। কেননা, অমিতা এখন পরস্ত্রী, হোক না সে নায়কের পূর্ব প্রেমিকা তাই নায়কের সঙ্গে অমিতার মিলন ঘটালেন না। ঘড়ির টাইমের গণ্ডগোলে যে ট্রেন ছুটেছে অমিতা তার বহু পূর্বেই ছুটে পালিয়েছে। প্রেম সম্পর্কে বনফুলের একটা শুদ্ধতাবোধ ছিল, তা সে প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কে হোক, বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে হোক। সেই শুদ্ধতাবোধের জায়গা থেকেই প্রেমের এই অপূর্ণতা। নায়কের জীবনের ট্রেনই যেন ছুটে পালিয়েছে বহু পূর্বেই।

"মুহূর্তের মহিমা" গল্পটিও নাটকীয় পরিবেশ, ঘটনা সংস্থান, ভাষা ব্যবহারে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। গুরগন খাঁ ওরফে কালীকান্ত শ্রীমতিকে ভালোবাসে এবং তাকে পেতে চায়। কিন্তু শ্রীমতি ভালোবাসে তিনু নামে এক গরীব ছোকরাকে। তিনুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কিভাবে তাকে লাভ করবে কালীকান্ত তার বর্ণনা নাটকীয় হয়ে উঠেছে। কাটা কাটা বাক্যে সংলাপ যেভাবে উক্তি প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে এগিয়েছে তা যথেষ্ঠ নাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত। গল্পকার গুরগনখাঁর পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

"বর্তমান গুরগন খাঁর বয়ঃক্রম পঁচিশের কিছু উপর হইবে।
মুখে সূচালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।
তদুপযুক্ত গোঁফ।
রঙ বাদামি।
চক্ষু তীক্ষ্ণ।
বুকময় চুল।
—ইহা নিতান্তই বাহ্যিক পরিচয়।
আসল পরিচয় গুরগন শাঁসালো, শক্তিমান, শিক্ষিত।
জমিদার।
অপত্নীক।
মাংসাশী।"

—এরপর শ্রীমতিকে পাওয়ার জন্য কালীকান্ত 'গোবিন্দলালী ভঙ্গিতে' যে কথাবার্তা বলেছেন এবং শ্রীমতি মুহূর্তের ছলাকলায় গুরগনকে ভুলিয়ে তিনুর সঙ্গে কিভাবে পালিয়ে গেল তা যথেষ্ট রোমাঞ্চকর নাটকীয় চমকে পূর্ণ। এগল্পে বনফুল 'নিপুণিকা' গল্পের নিপুণিকা নারীর মতো ছলা-কলা পূর্ণ নারীর এক সুন্দর চিত্র অঙ্কন করেছেন, যা বিদ্যুৎ বিকাশের মত আমাদের মনে দাগ কেটে যায়।

৯। মানবমনের রহস্য উন্মোচনকারী গল্প ঃ শিল্পী মাত্রই জীবন-সন্ধানী, মানব জীবনের রহস্য উন্মোচনকারী। প্রত্যেক শিল্পী আপন ভাবনা অনুযায়ী গল্পের বিষয়, চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিশেষ কোন দিককে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। জগতের বিবিধ বিষয়ের মত মানব মনের রহস্য বোধ হয় শিল্পীকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে। মানব চরিত্রের সেই রহস্য উন্মোচনে মানুষের বিচিত্রতাকেই রূপ দেন শিল্পীরা। জগতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ দেখা যায়। কোন একজন মানুষের সঙ্গে আর একজন মানুষের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রত্যেক মানুষ আবার তার নিজের ভাবনা অনুযায়ী বিভিন্ন। মানব চরিত্রের সেই বিভিন্ন ভাবনা ব্যক্তি বিশেষে এক-এক রকমভাবে প্রকাশিত হয়, মানব চরিত্রের রহস্য অনন্ত। সেই অনন্ত রহস্যের কিছু বুদ বুদ শিল্পীরা তাঁদের ভাবনায় উন্মোচন করতে প্রয়াসী হন। বনফুলও মানব মনের রহস্য উন্মোচনকারী এক রূপদক্ষ শিল্পী। মানব জীবন সম্পর্কে তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি তাঁর অনুভবে যে সূক্ষ্মতা এনে দিয়েছে তাতে গল্পগুলি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। **"মনের আলো-আঁধারই লীলার মধ্যে জীবনের যে রহস্য প্রকাশিত হয় তাকেও তিনি পূর্ণ স্বীকৃতি দিয়েছেন। সদরে অন্দরে মনের লুকোচুরি খেলায় জীবনের জয় পরাজয়ের আনন্দ বেদনা তিনি নিরপেক্ষ রসিক দর্শকের মতই প্রত্যক্ষ করেছেন। মানুষের বাহিরের মন ও ভিতরের মনের চেতন অবচেতন লোকের বাসনাও সংস্কার বুদ্ধি ও ব্যবহারের মধ্যে যে সংঘাত এবং তার ফলে জীবনের সুখ-দুঃখের যে লীলাবৈচিত্র তার রহস্য উন্মোচনেও বনফুলের শিল্পদৃষ্টি অব্যর্থ।"**[৯০] এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল— 'মানুষের মন' ,'ভিতর ও বাহির' ,'তিলোত্তমা', 'তপন' ইত্যাদি।

"মানুষের মন" গল্পটিতে মানব মনের রহস্যের এক স্বতন্ত্র রূপ উন্মোচিত হয়েছে। নরেশ ও পরেশ দুই ভাই। একজন একনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, অন্যজন গোঁড়া বৈষ্ণব। তাই স্বভাবতই তাদের জীবনযাত্রার ধরন, চিন্তাভাবনা একেবারে ভিন্ন। কিন্তু এক জায়গায় তাদের উভয়ের মিল আছে, তা হল ভ্রাতুষ্পুত্র পল্টুর প্রতি উভয়ের অপত্য স্নেহ। পল্টুর টাইফয়েড হল। ফলে বৈজ্ঞানিক নরেশ ছুটলেন অ্যালোপেথিক ডাক্তারের কাছে, আর বৈষ্ণব পরেশ গেলেন কবিরাজের কাছে। কিন্তু কিছুতেই পল্টু সুস্থ হয়ে উঠছে না, দেখে উভয়ে ভীষণ চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়েছেন। অবশেষে জ্যোতিষ ও তারকেশ্বরের দৈব ঔষধ আনতে ছুটলেন পরেশ। বৈজ্ঞানিক নরেশের শেষ অস্ত্র ইন্‌জেকশন, আর বৈষ্ণব পরেশ বহু দৌড়াদৌড়ি করে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত বাবা তারকেশ্বরের চরণামৃত নিয়ে আসলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে উঠছে না। তারপর পল্টুর যখন শেষ অবস্থা সমাসন্ন উভয়ে তখন জ্ঞান-বিশ্বাস হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছেন এবং তাদের 'স্নেহের ধনকে' মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বৈষ্ণব পরেশ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাকে শেষ পন্থা হিসেবে গ্রহণ করেছেন আর বৈজ্ঞানিক নরেশের একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে দাঁড়ায় তারকেশ্বরের ঠাকুরের চরণামৃতের উপর।

আসলে জীবনে আমরা যা ভাবি, যে আদর্শ নিয়ে চলার চেষ্টা করি সেই সব ভাবনা,

কঠোর আদর্শবোধ জীবনের চরম মুহূর্তে এসে পাল্টে যেতে পারে। জীবনে কোন কিছুই যেন চূড়ান্ত নয়, সবই পরিবর্তনশীল। বনফুল একথাও হয়তো এগল্পে বলতে চেয়েছেন যে, বিজ্ঞান আর আধ্যাত্মিকতা কোনটি এককভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, প্রত্যেকেরই ভাবনার বিশেষত্ব থাকলেও অখণ্ডতা নেই। সবে মিলেই পূর্ণতা। জীবনের বিশেষ মুহূর্তে এসেই আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি।

"তিলোত্তমা" গল্পটিতে মানব-মনের রহস্য উন্মোচনের চরম শিল্পরূপ লাভ করেছেন। আমরা বিশেষত মানবিক অনুভূতি সম্পন্ন মানুষেরা নিজেদের বিবেক-বোধের জোরে পশুদের চেয়ে উন্নত শ্রেণীতে পরিগণিত হয়েছি। মানুষের মনের সেই সুপ্ত বিবেকবোধের এক বিস্ফোরিত জাগরণ 'তিলোত্তমা' গল্পে লক্ষ্য করা যায়। নয়টি পরিচ্ছেদে বনফুল মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের গতিপথ নির্ধারণ করে অন্তর অনুশোচনার মাধ্যমে শুভবোধে উত্তরণে এক অনির্দেশ্য শক্তির কথা এগল্পে বলেছেন। মানব জীবনের সমস্ত হিসেব নিকেষ জীবনের এক বিশেষ মুহূর্তে এসে বদলে যায়। লেখকের কথায়— **"সকলেরই জীবনে মাঝে মাঝে এমন একটি নাটকীয় মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সমস্ত হিসাব সমস্ত আয়োজন হঠাৎ নিমেষে বদলাইয়া যায়। উত্তর বাহিনী নদীস্রোত সহসা দক্ষিণ বাহিনী হইয়া পড়ে, তুঙ্গ পর্বত অকস্মাৎ গভীর গহ্বরে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনেই এসব হয়। ইহার জন্য রাম বা রাবণ হইবার প্রয়োজন নাই।"** গল্পে নকুল নন্দীর বি.এ. পাশ পুত্র গোকুল নন্দীর জীবনে তার স্ত্রী তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করে এ সত্য প্রকাশ লাভ করেছে।

নকুল নন্দীর একমাত্র পুত্র গোকুল নন্দী। পিতার ও মাতুলালয়ের প্রাপ্ত সম্পত্তিতে তার ভালোভাবেই দিন কাটে। তাই অর্থের চিন্তা তার নেই। আড্ডা মেরে, তাস খেলে, শখের থিয়েটারে অভিনয় করে, রাজনীতি বা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনার মধ্য দিয়েই তার দিন কাটে। তৎকালীন বাংলাদেশে বিবাহের বাজারে এমন ছেলে **'হীরের টুকরো'**। তাই তার বিবাহের সম্বন্ধ আসতে শুরু হতেই পিতা নকুল নন্দী আর্থিক দেনা-পাওনার হিসেব কষে কন্যা পণের কথা ভাবতে লাগলেন এবং একদিন এক কন্যা নির্বাচন করে বিয়ে ঠিক করে এলেন গোকুলের কোন মতামত গ্রহণ না করেই। গোকুল পিতার বাধ্য সন্তান। সুতরাং সেও বিরুদ্ধতা করল না, গোকুল মেয়েটির নাম শুনেই বিমোহিত। মেয়েটির ডাক নাম তিলু, ভালো নাম তিলোত্তমা। কিন্তু ভাবনা আর প্রাপ্তির মধ্যে বিস্তর ফারাক হওয়ায় গোকুল ঘাবড়ে যায়— বিবাহের শুভদৃষ্টির সময় মেয়েকে দেখে গোকুল কিংকর্তব্যবিমূঢ়, কারণ মেয়ে **"তিলের মতই কুচকুচে কালো এবং গোল। ছোট ছোট চোখে ভীরু শঙ্কিত দৃষ্টি।"** নকুলের স্ত্রী গঞ্জনায় জানায় যে তার বেয়াই মশাই তাদের ঠকিয়েছে। দান সামগ্রী ও মেয়ে দুদিক দিয়েই বেয়াই তাদের ঠকিয়েছে। যাইহোক, শেষে সবাই মিলে গোকুলের দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে চাইল, এমন কি গোকুল ও তাতে সায় দিল। তিলু দেখতে কালো হলেও মনটি খুব ভালো ছিল তার, শত কূটকথা সত্ত্বেও একটি বারও প্রতিবাদ

করত না। ঘর-গৃহস্থালীর কাজেও নিপুণা, খাটতে পারে গাধার মত। এহেন তিলুকে গোকুল জানায় যে সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করবে, তিলু কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলে— **"বেশত। হিঁদুর ঘরে হয়তো এমন।"** গোকুল তখন বলে— **"তোমার কষ্ট হবেনা?"** তিলু তার উত্তরে বলে **"আমার? না।"** একটু চুপ করে থেকে আবার বলে— **"হলেও তোমার যদি তাতে সুখ হয় সে কষ্ট সহ্য করব।"** গোকুল বুঝল এটি অভিমানের কথা কিন্তু কিছু বলল না। বছর খানেক পর গোকুলের মোহ কেটে গেল, তার মোহ কাটার পক্ষে এক বছরই যথেষ্ট, কারণ তিলু লেখাপড়া, গানবাজনা, হাব-ভাব কিছু জানে না, রূপগুণ কিছু নেই, গুণের মধ্যে একটি আছে তা হল, মহিষের মতো খাটতে পারা। গোকুল একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে, বাবাও দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করছে না, এমন সময় একটা সুযোগ এলো। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক অভিনয়ের সময় ঊষা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, কুশলী ঊষার কথায় গোকুল আবার কূল হারায়। গোকুলের মারও ঊষাকে খুব পছন্দ। সুতরাং বিবাহ স্থির হয়ে গেল। রাত্রি দ্বিপ্রহর বিনিদ্র নয়নে গোকুল তিলুকে খবর দিল যে আগামীকাল ঊষার মা তাকে আশীর্বাদ করতে আসবে, এবং এও জানতে চায় তার কোন আপত্তি আছে কি না। তিলু জানায় 'না', গোকুল আরো জানায় যে বিয়ের পরই তাকে বাপের বাড়ি থাকতে হবে-এই শর্তেই ঊষা বিবাহে রাজি হয়েছে। তিলু জানায়— **"শুনেছি। তাই যাব। তুমি এক-আধবার যদি যাও দয়া করে তাতেই আমার যথেষ্ট হবে।"** পরের দিন সকালে ঊষার মা উষার হাতে গাঁথা ফুলের মালা ও আশীর্বাদের জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হয়। এমন সময় তিলুর শ্বাশুড়ি বলে— **"ও বৌমা, কোথা গেলে তুমি? শাঁখটা বাজাও তুমি। শাঁখটা লইয়া সসঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। শাঁখটা বাজিয়া উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল যেন।"** তৎক্ষণাৎ গোকুল বলে উঠল— **"আমাকে মাপ করবেন।"** তারপর— **"দুইহাতে মালাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।"**

আসলে মানুষের জীবন সব সময় সমানভাবে চলে না। যে জাগ্রত বিবেকে মানুষ নির্দয়, বোধ শক্তিহীন মানুষে পরিণত করে, সেই বিবেকই আবার মনের কোন সুপ্ত স্থানে এমনভাবে লুক্কায়িত থাকে যার দংশনে আত্ম সংশোধনের পথে কখন যে অগ্রসর হয় তা নিজেও বলতে পারে না। গল্পে গোকুলের বিবেকবোধ ঊষার বাহ্যিক চটকদারী কথার ছলনায় অন্তর্হিত হলেও তিলোত্তমার শাঁখ বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে তার মাথায় যে বজ্রাঘাত হয়, তারপর বিবেকের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে আশীর্বাদের মালা ছিঁড়ে পিড়ি থেকে উঠে চলে যায়। তিলোত্তমার চরিত্রের মোহনীয়তা, অন্তর সৌন্দর্য এতদিন গোকুল না বুঝতে পারলেও তাঁর মঙ্গলময়ী রূপ প্রত্যক্ষ করেই গোকুলের সুপ্ত বিবেকবোধ জাগরিত হয়ে ওঠে। এক অনির্দেশ ইঙ্গিতে তার যেন চিত্তশুদ্ধি হয়, নবজন্ম ঘটে। মানুষের সুপ্ত বিবেকবোধের উন্মোচনে এমন রহস্যময় গল্প আর কটা আছে? মানব মনের রহস্য দুর্জ্ঞেয়, কখন কোন পরিস্থিতিতে কার মনে কোন ঘটনা কোন প্রভাব ফেলবে তা আগে

থেকে কেউ বলতে পারে না।

১০। শিশু-কিশোরের গল্প ঃ বনফুল শুধু বয়স্কদের জন্যই গল্প লেখেন নি, শিশু কিশোরের মনোরঞ্জনের জন্য রোমঞ্চকর কিছু কিছু গল্প রচনা করেছেন, যাতে তাঁর শিশু সুলভ কৌতূহলী স্বভাব স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। বাস্তবে, স্বপ্নে শিশু-কিশোরের মন যে কল্পনার পাখায় ভর করে কত সম্ভব-অসম্ভব জগতে পারি দেয় তার সুন্দর মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ এসব গল্প পাওয়া যায়। তবে এসব গল্পে বনফুল শিশু-কিশোরের জগৎ ধরে বয়স্কদের চেনা জগতেও পারি দিয়েছেন কখনো কখনো। এধরনের গল্পের মধ্যে আছে— 'নতুন সিংহ','খোকনের স্বপ্ন', 'তিস্তা', 'সেদিন ভোরে', 'অলঙ্কার পুরী' প্রভৃতি। এর মধ্যে 'অলংকার পুরী' বড় গল্প।

"নতুন সিংহ" গল্পে খোকন কখনও তার ঠাকুমার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শিশুর মন যে কত কল্পনাপ্রবণ হয়, তারা যে সে কল্পনার জগতের বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মধ্যে নিজেদেরও মিশিয়ে এক অদ্ভুত জগৎ তৈরী করে তা চমৎকারভাবে রূপায়িত হয়েছে। সাতবছরের খোকন তার ঠাকুমার কাছে জানতে চায় এবার পুজো কবে হবে, ঠাকুমা উত্তর দেয়, 'এবার পুজো হবে না।' মা দুর্গা আসবেন না। একথা শুনে "নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না খোকন। পুজোর সময় কত জামা কাপড় হবে, থিয়েটার হবে পাড়ায়— মা দুর্গা আসবেন না, তা কি হতে পারে কখনও।" ঠাকুমা বলে 'কিসে আসবেন তিনি?' খোকন জবাব দেয় 'কেন সিংহে চড়ে!' ঠাকুমার কথা 'সিংহ মাংস খায়, অত মাংসের খরচ যোগানো মা দুর্গার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ 'মা দুর্গার অত পয়সা নেই।' খোকন বলে— 'আমরা চাঁদা দেব সবাই তো।' কিছুক্ষণ পরে বলে 'মা দুর্গা এরোপ্লেনে আসতে পারেন না?' ঠাকুমা বলে "না। সিংহ ছাড়া আর কিছুতে চড়েনই না।" খানিকক্ষণ পর ঘর থেকে খোকন ঠাকুমাকে বলে "আমি দুর্গাকে পিঠে করে বয়ে আনব। এই দেখ সিংহ সেজেছি।" ঠাকুমা দেখলেন "খোকন কালি দিয়ে প্রকান্ড গোঁফ করেছে, ঝাঁকড়া উলের টুপিটা মাথায় পরে কেশর করেছে, হামাগুড়ি দিয়ে ঘাড়টা উঁচু করে রেখেছে বীর বিক্রমে।" আর 'গাঁক্-গাঁক্- গাঁক' করে চিৎকার করছে। তারপর ঠাকুমা বললেন— 'হ্যাঁ, তুই যদি মা শক্তিকে পিঠে করে বয়ে আনতে পারিস নিশ্চয় তিনি আসবেন।' এরপর খোকন কৈলাশে গিয়ে কিভাবে মা দুর্গাকে নিয়ে আসবে তা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর "ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে অরণ্যের পর অরণ্য পার হয়ে সে চলেছে মা দুর্গাকে আনতে। সত্যিই যেন সিংহ হয়ে গেছে সে। ঘাড়ে গজিয়েছে কেশর, চোখে জ্বলছে আগুন, গায়ে হয়েছে অসীম শক্তি। অরণ্য পর্বত লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে সে। সামনে কোনও বাধা এলেই সিংহ গর্জনে ডাক ছাড়ছে— 'গাঁক্-গাঁক্- গাঁক্।"

আসলে খোকন কিছুতেই ভাবতে পারছিল না এবার মা দুর্গা আসবেন না। তাই যে ভাবেই হোক মাকে আনার জন্য সে প্রস্তুত। এসব ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ে সে স্বপ্নে

কৈলাসে গিয়ে মা দুর্গাকে নিজে সিংহ সেজে নিয়ে আসে। আসলে শিশুরা যা ভাবে তা বাস্তবে পূরণ না হলে তারা তার স্বপ্ন দেখে, আর স্বপ্নে সেই অপূর্ণতাকে পূরণ করে। এগল্প ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব সক্রিয় হলেও শিশুর মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

"খোকনের স্বপ্ন" গল্পটিও শিশু-কিশোরের মনের নানা ভাবনা শিশু-কিশোর সুলভ মনোভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তার পাশাপাশি কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও দিয়েছেন বনফুল। এম. এস. সি পাশ করা কাকার পাশে শুয়ে খোকনের নানা জিজ্ঞাসা, নক্ষত্র কি? গ্রহ কি? ছায়াপথ কি? নীহারিকা কি? এসবের ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে খোকনের ভয় করতে লাগল। তারপর ঠাকুমার কাছে গিয়ে কাকা যা যা বলেছিল সবিস্তারে বর্ণনা করে গেল। ঠাকুমা যা বলল খোকনের তা আরও বিস্ময়কর ঠেকল। ওই ছায়াপথ দিয়ে নাকি রাজপুত্র আসবে। তাই দেবতারা ঐ পথে আলো জ্বেলে রেখেছে। গল্প শুনতে শুনতে খোকন ঘুমিয়ে পড়ল। **"ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে যা স্বপ্ন দেখলে তা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক।.... চারিদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নক্ষত্রের মশাল জ্বলছে। অসংখ্য জ্বলন্ত শিখার উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে চতুর্দিক। দূরে কালো কালো মেঘের স্তূপ, তাতে আগুন লেগেছে যেন। বজ্রের বাজনা বাজছে। মেঘের পিছনে শোনা যাচ্ছে ঝড়ের গর্জন। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন লক্ষ লক্ষ শাঁখ বাজছে—ছায়াপথ দিয়ে রাজপুত্র আসছে .... ওই যে .... মাথায় সোনার মুকুট, হাতে তলোয়ার। নির্ভয়ে এগিয়ে আসছে রাজপুত্র, কোন দিকেও ভ্রুক্ষেপ নেই.... ওই আসছে....। কাছে এল যখন, তখন খোকন অবাক হয়ে গেল। রাজপুত্র অপর কেউ নয়, সে নিজেই। তারই মাথায় সোনার মুকুট, হাতে তলোয়ার, সে বেরিয়েছে দিগ্বিজয়ে।"**

আসলে শিশুরা বাস্তবে যা ভাবে বা শোনে কল্পনার পাখায় ভর করে সেই জগতে তারা চলে যায়। তাদের মনের অবদমিত সাধ স্বপ্নে গিয়ে পরিপূর্ণতা পায়।

১১। পশুকেন্দ্রিক গল্প ঃ বনফুল শুধু মানব জীবন ও সমাজ জীবনকে নিয়েই গল্প লেখেন নি, মানবেতর পশুকে কেন্দ্র করেও অসাধারণ কিছু গল্প বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন। মনুষ্যেতর গল্প লেখার প্রচলন বনফুলের পূর্বে ও পরে অনেক লেখা হয়েছে, যেমন শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালাপাহাড়', 'নারী ও নাগিনী', প্রমথনাথ বিশীর 'নীলমণির স্বর্গলাভ', শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঘিনী', নারায়ণ সান্যালের 'গজমুক্তা' প্রভৃতি। বনফুলের পশুকেন্দ্রিক বা মনুষ্যেতর গল্পগুলি সংক্ষিপ্ত পরিসরে, অভাবনীয় ভঙ্গিতে, সহজ সরল ভাষায়, প্রতীকে অভিনব হয়ে উঠেছে। পশুও মানুষের বিচিত্র স্নেহ-মমতার দাবী-অভিমানের সম্পর্ক বিশ্লেষণে এই শ্রেণীর গল্পগুলি অনন্য শিল্পরূপ লাভ করেছে। বনফুলের এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে আছে— 'গণেশ জননী', 'বাঘা', 'আত্ম-পর', 'খেলা', 'এক ফোঁটা গল্প', 'খেঁকি', 'আলোবাবু' প্রভৃতি।

"গণেশ জননী" গল্পটিতে মানব হৃদয়ের সঙ্গে মানবেতর প্রাণীর রাখীবন্ধন ঘটিয়েছেন

বনফুল। একান্ত স্নেহের টানে কিভাবে একটি হস্তিশাবক নিজের সন্তানের জায়গা দখল করে নেয় তা চমৎকার অনুভবেদ্য করে প্রকাশ করেছেন। একটু মজা, একটু খুনসুটি, একটু সমবেদনা— এক উৎকেন্দ্রিক অথচ স্নেহবৎসল এক নিঃসন্তান প্রৌঢ় দম্পত্তির হৃদয়ে কোথায় যেন একটা অনির্দেশ্য মৃদু বেদনার অনুভূতি আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায়।

একটি হাতি, যার নাম গণেশ, সে-ই এই গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র, তাকে ঘিরে নিঃসন্তান দম্পতির যত ভাবনা। বছর কতক পূর্বে এক গুজরাটি ব্যবসায়ীকে অসুস্থ অবস্থায় মাঠ থেকে তুলে এনে সেবা শুশ্রূষা করে বাঁচানোর জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তিনি ঐ প্রৌঢ় নিঃসন্তান দম্পতিকে একটি হাতির বাচ্চা উপহার হিসেবে পাঠান। নিঃসন্তান দম্পতি আদর করে তার নাম রাখলেন 'গণেশ'। গণেশ এখন বড় হয়েছে— তার চলাফেরার অসুবিধে যেন না হয় তার জন্য বসতবাড়ির সব দেয়াল কেটে দরজাগুলো বড় মাপের করা হয়েছে। দেওয়াল ভেঙে বড় হলঘরের মত করে দেওয়া হয়েছে। গণেশ এখন তার 'মা' অর্থাৎ গৃহকর্ত্রী যখন নদীতে নাইতে যায় তখন শুঁড়ে করে বালতি আর গামছা পৌঁছে দিয়ে আসে, 'মা' যখন গরমের দিনে বাঁধতে বসে মায়ের গরমে কষ্ট হচ্ছে ভেবে রান্না ঘরের দুয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে শুঁড়ে পাখা ধরে মাকে হাওয়া করতে থাকে। সেই দম্পতির এখন ধ্যান জ্ঞান ঐ 'খোকন' গণেশ। তাকে আদর করলে সে খুশি হয়, আবার বকলে ভীষণ অভিমান করে থাকে— এমন কি রাগ করে খাওয়া-দাওয়াও বন্ধ করে দেয়।

যে প্রৌঢ় গুজরাটি লোকটিকে এই দম্পতি সুস্থ করেছিলেন তিনি তাঁর বাগান থেকে এক ঝুড়ি ল্যাংড়া আম পাঠিয়েছিলেন বাগানের মালীকে দিয়ে। বাড়িতে কর্তা-গিন্নি তখন কেউই ছিলেন না। মালী বাড়িতে আমের ঝুড়িটি রেখে চলে যায়। এই সুযোগে গণেশ সবগুলি আম উদরস্থ করে ফেলে। গণেশ জননী বাড়ি ফিরে একটু সস্নেহে শাসন করে তাকে খালি বলেছিল— **'রাক্ষস, সব খেয়ে বসে আছ, একটিও রাখতে পারনি আমাদের জন্য'** —এই বলে একটি আলতো চাপড়ও মেরেছিলেন তিনি। ব্যাস্, সেই অভিমানে 'গণেশ' খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে গুম হয়ে আছে। গণেশ জননী ভেবেছে গণ্শা অবশ্যই দারুণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এইভাবে গৃহকর্তা গল্পকথক চিকিৎসক ডাক্তারবাবুর কাছে টেলিগ্রাম করেন। ডাক্তারবাবুও ভাল 'ফীজ' পাওয়ার আশায় সেকেন্ড ক্লাস টিকিটেই রওনা হয়ে গেলেন। কেননা কমিশনারের ঘোড়া, ম্যাজিস্ট্রেটের কুকুর, পুলিশ সুপারের গাই গরু ইত্যাদির চিকিৎসা করে কোন মত তাঁর সংসার চলে। গল্পকথক ভেবেছিলেন হাতি যখন আছে, তাহলে নিশ্চয়ই গৃহকর্তা জমিদার। কিন্তু যথাস্থানে গিয়ে দেখলেন যে ঐ হাতি আদৌ কোন ধনী জমিদারের নয়, মধ্যবিত্ত কৃষিজীবী দম্পতির সন্তানবৎ পালিত পোষ্যমাত্র।

গল্পকথক ডাক্তারবাবু গিয়ে দেখলেন একটা বিরাট হলে প্রকাণ্ড একটি শতরঞ্চির উপর গণেশ গুম হয়ে আছে। গণেশ জননী তাঁর শুঁড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে খাবার জন্য সাধ্যসাধনা করছে , লেবুজল দিয়ে সুন্দর বার্লি রেঁধে এনেছে, কিন্তু গণেশ কিছুতেই খায় না। ডাক্তারবাবু

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝলেন যে গণেশের কিছুই হয়নি, গণেশ সম্পূর্ণ সুস্থ, অভিমান করেই তার এই অনশনব্রত। ডাক্তারবাবুকে গৃহকর্তা 'ফী' দিতে এলে কিছুতেই সেই ফীজ নিতে পারলেন না। মানুষের সঙ্গে পশুর এমন বিচিত্র স্নেহ-মমতা দাবী-অভিমানের সম্পর্কের কথা ভেবে তিনি মনে করলেন এ সম্পর্ক প্রত্যাশিত মুদ্রার চেয়ে বহু মূল্যবান। ফিরে যাওয়ার মুহূর্তে গল্পকথক ডাক্তারবাবুর কানে এল যে **"তাহলে আর টাকার দরকার হবে না পোদ্দার। গয়নাগুলো তুমি ফেরত দিয়ে দাও।"** অর্থাৎ গণেশ জননী গণ্শার চিকিৎসার জন্য নিজের গায়ের গয়না বন্ধক দিয়ে চিকিৎসার টাকা জোগাড়ের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মানুষ ও পশুর এমন আত্মিক সম্পর্ক সত্যিই বিরল। মমতামেদুর সম্পর্ক থাকলেও সমাজের রূঢ় রূপ চিত্রণে শরৎচন্দ্র 'মহেশ' কে নাঙলের ফলায় গফুর মিঞার হাত দিয়ে হত্যা করিয়াছিলেন। প্রভাতকুমারের জয়রাম মোক্তার আদরিণীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়' নামে পোষা ষাঁড়টির প্রবল স্নেহান্ধতা আমাদের সুবিদিত, কিন্তু এগল্পে নিঃসন্তান দম্পতি গণেশকে যেভাবে নিজ সন্তানের মত স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে লালন পালন করেছে, তার চিকিৎসার জন্য নিজের যেভাবে সর্বশান্ত করে দিয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। তাছাড়া, এগল্পে সে সময়ের পশু চিকিৎসকদের জীবন-যাপনের গ্লানিকর বর্ণনা, চিকিৎসকদের ঔদার্যের রূপটিও ফুটে উঠেছে। বনফুলের পিতা ও বনফুল নিজেও পরোপকারী সুচিকিৎসক ছিলেন, তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার এমন বাঙ্ময় প্রকাশ পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে এ গল্পে।

"খেঁকি" গল্পটি একটি খেঁকি কুকুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এক সাহেবের Dog Box থেকে একটি কুকুর হারিয়ে যাওয়ায় রেল কর্তৃপক্ষ কিভাবে সেই সাহেবের অভিযোগ দায়সারাভাবে পূরণ করে নিজেদের কর্তব্য সারলেন তার এক হাস্যকর বর্ণনা এগল্পে আছে। এর পাশাপাশি রেল কর্তৃপক্ষের কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীনতার চিত্রটি বেশ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। গল্পটি এরকম— এক সাহেবের Dog Box থেকে একটি বুলডক বংশের কুকুরের বাচ্চা হারিয়ে যায়। সাহেবটি রেলকর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন জানায়। রেল কর্তৃপক্ষ তখন সেই বিশাল ঝামেলা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য রেল স্টেশনের একটা খেঁকি কুকুরকে বাক্স-বন্দি করে সেই সাহেবের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। সাহেবটি Station Master-কে অভিযোগ করলেও কোন ফল হল না। এদিকে অস্থিচর্মসার খেঁকি কুকুরটি যেভাবে ভেবেছিল যে সাহেবের বাড়িতে গিয়ে রোজ মাংস খেতে পাবে, সাহেবের সামনে আসাতে মুখের উপর সজোরে সবুট লাথি খেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে প্ল্যাটফর্মের পাশের এক বাড়িতে ঢুকে পড়ে, সেখানেও লাঠির তারা খেয়ে পালিয়ে বেরিয়ে যায়। সেই বাড়ির ভদ্রলোকটির রেল বিভাগে যে Post-এ লোক নেবার কথা, সে পোস্টে চাকরি হল না, কেননা সেই Post-টি সাহেবদের জন্য 'Reserved'।

গল্পটিতে একটি খেঁকি কুকুরকে কেন্দ্র করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্যাটায়ারের সূক্ষ্ম হুল ফোটানোর মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। খেঁকির আত্মকথনের মধ্য

দিয়ে গল্পটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

১২। আঙ্গিক প্রধান গল্প ঃ বনফুল আঙ্গিক সচেতন শিল্পী। তিনি সবসময়ই এমন বিষয় নিয়ে এমন আঙ্গিকে গল্প লেখার চেষ্টা করতেন যেটা নতুন,একটু 'অন্য রকম' বলে আমাদের মনে হবে। তিনি নিজেও একথা বলেছেন যে, তাঁর বিষয় বিন্যাস সব সময় একটা নতুনত্বের স্বাদ বয়ে আনবে এই প্রত্যাশায় গল্প লিখতেন। আর কোন গল্প যেন অন্য কোন গল্প আঙ্গিকের সঙ্গে না মিলে সে চেষ্টাও করতেন। বনফুল প্রতিনিয়ত পরীক্ষার পর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন থেকে নতুনতার দিকে যাত্রা করেছেন। বনফুলের গল্প বিশেষভাবে আঙ্গিক সচেতনার গুণেই বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। আসলে গল্পের বিষয় ভাবনার সঙ্গে গল্পের রূপ নির্মাণের সুপরিকল্পিত নিটোল গ্রন্থনেই গল্পের সফলতা অনেকটা নির্ভর করে। বনফুলের এমন কিছু গল্প আছে যার আকর্ষণ ঐ বহিরঙ্গ রূপায়বের জন্য। এধরনের গল্পের মধ্যে আছে— 'কখগ','কবচ', 'ভৈরবী ও পূরবী' প্রভৃতি।

"কখগ (জ্যামিতিক গল্প)" গল্পের নামকরণেই বনফুলের আঙ্গিক সচেতনার পরিচয় মেলে। বনফুল বিজ্ঞানী মেজাজের যে সাহিত্যিক এটি তার একটি নমুনা গল্প। বৈজ্ঞানিকতা ভাবালুতাকে আতিশয্যকে নিয়ন্ত্রণ করে, কটাক্ষ করে। এগল্পের মধ্যে দিয়ে সমকালীন গল্পের একদিককে কটাক্ষ করেছেন শিল্পী। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর 'রিয়ালিষ্ট' গল্পের নায়কের পরিচিতি দিয়েছেন 'ক বাবু' নামে। নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধি প্রধান গল্প লিখতে গল্পকার পাত্র-পাত্রীদের বীজগণিতের হরফে পরিণত করেছেন শেষ পর্যন্ত। বনফুল এই গল্পে বৌদ্ধিকতার প্রতি অতি আগ্রহকে কটাক্ষ করেছেন। বনফুল অতি-ভাবালুতারও পরিপন্থী, আবার অতি বৈজ্ঞানিকতারও পরিপন্থী। কেননা অতি ভাবালুতা বাস্তবজ্ঞানলুপ্ত করে, আর অতি বৈজ্ঞানিকতা মানুষকে বিশুষ্ক করে তোলে। ভাবালুতা যদি বৈজ্ঞানিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে নানা রকম শিল্পঘটিত দোষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

'কখগ' গল্পের আখ্যান ভাগ যৎসামান্য। পাঁচটি পরিচ্ছেদে গল্পটি বিন্যস্ত। 'ক'-এর ষোড়শী কন্যা 'গ'। 'ক' -এর বন্ধু 'খ'। 'ক' তার ষোড়শী কন্যা 'গ'-এর সঙ্গে বন্ধু 'খ'-এর অবৈধ সম্পর্কের পরিচয় পেয়ে 'ক' লোকজন ডেকে কিভাবে 'খ ও গ'-এর বিবাহ দিলেন সে কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু গল্পের বিন্যাসে লেখক যে প্রতিপাদ্যের ভঙ্গিটি ব্যবহার করেছেন তা গল্পটিকে সরসতা দিয়েছে। গল্পের নামের তলায় তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে 'জ্যামিতিক গল্প' বলে উল্লেখ করেছেন।

গল্পটি এরকম— **"ক ও খ অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। শুধু তাই নয় উভয়ের জীবনের গতিপথ বৃত্তাকার। ধার করে, ধার করে শোধ করে আবার ধার করে। জীবনের গতিপথ ভিন্ন হলেও এদের সান্ধ্য গতিপথ সরলরেখায় চলে।"** সন্ধার সময় উভয়েই এক স্থানে গমন করে এবং

আবার ফিরে আসে। রাতেই যেদিন ফিরতে হয় সে দিন গতিপথটা সরল থাকে না একটু আঁকা-বাঁকা হয়ে যায়। ধার বাড়ে। জীবন অর্থহীন হয়ে পড়তে চায়, আবার নতুন অর্থ মেলে।

'ক বস্তুতান্ত্রিক'

'খ ভাবতান্ত্রিক'।'খ' কেঁদে, অভিনয় করে নিজের কাজ হাসিল করে। 'ক' সোজা কথায় না হলে পকেট মারে।

'ক' এর মাতৃহীন ষোড়শী কন্যা 'গ'। তার অন্তরের কামনা সর্বাংশে প্রকট। বস্তুতান্ত্রিক 'ক' দেখে, বোঝে। কিন্তু কিছু করতে পারে না। কারণ সামর্থ নেই। 'খ' তার বাড়িতে আসে। 'ক-খ-গ' ত্রিভুজ নয়—পিতা, পিতৃবন্ধু ও কন্যা। 'ক' ও 'খ' তার পর সোজা সরলরেখায় বেরিয়ে পড়ে চতুর্ভুজ হওয়ার লক্ষ্যে।

ভাবতান্ত্রিক 'গ' 'খ'-এর সঙ্গে গোপনে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে। 'ক' তারপর একদিন ঘরে 'খ' ও 'গ'-কে আপত্তিকর অবস্থায় ধরে ফেলায় 'ক' ঘরে শিকল লাগিয়ে গিয়ে পুরুত ডেকে এনে উভয়ের বিয়ে দিয়ে দিল।

বনফুল এই গল্পের বিন্যাসে যে গাণিতিক ভাবনা প্রয়োগ করেছেন তাতেই যেন গল্পটির ভারসাম্য রক্ষা হয়েছে। এমন কি বীজগণিতের সাঙ্কেতিক অক্ষরে ব্যক্তি নাম রাখায় বনফুলের কৌতূহলপ্রদ মনোভাবটি বেশ পরিস্ফূট।

"ভৈরবী ও পূরবী" গল্পটিও বনফুলের আঙ্গিক-সচেতনতার আর একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গদ্যে-পদ্যে অপূর্ব চম্পু কাব্য হয়ে উঠেছে গল্পটি। ভ্রমর, জোনাকি আর ফুলের রোমান্টিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বনফুল সময়ের মূল্য কতটা তা চমৎকারভাবে বুঝিয়েছেন। ভোরের যে প্রেম ফুলের কাছে ভ্রমর চেয়েও পেল না, প্রত্যাখ্যাত হল, সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল পড়ে ফুলও তার সেই প্রেম সৌন্দর্য্য আর কাউকে উৎসর্গ করতে পারলো না, ঝরে পড়ে গেল।

কাননে একটি বর্ণে গন্ধে অপরূপ ফুল ফুটেছে, তার চারিদিকে আনন্দের উৎসব। আকাশে বাতাসে আলোতে যেন কিসের আকুলতা! ফুলের সেই রূপ মাধুর্য দেখে ভ্রমর এসে বলে—

"কি যে চাই সখি জানি না তো তাই
তবে মনে হয় আজিকে প্রাতে
এতটুকু মধু দিতে যদি তুমি
তোমার রঙিন সোহাগ সাথে!
মুখ তুলে সখি আঁখি মেলে চাও
বিকল করো না এমন আলো,
গুণ্ঠন খোল একবার ওগো
তোমারেই আমি বেসেছি ভাল।"

—ফুল ভ্রমরের সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু ভ্রমর চলে যাবার পর ফুলটির যেন ঘুম

ভাঙল, তার হৃদয় ভ্রমরের জন্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, কিন্তু ভ্রমরের আর দেখা নেই। ছোট ফুলটির আঁধারে আলো জ্বালিয়ে জোনাকি এলে ফুলটি ভ্রমরের কথা জানতে চাইল, জোনাকি জানালো, "আমি তো তাকে চিনি না। দেখা হলে সুধোব তাকে।" সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে ভোর হল, প্রজাপতি ফুলকে এসে বললে, 'খুঁজে পেলাম না তাঁকে।' ফুল বলল 'কাকে'? প্রজাপতি বলল, 'তুমি কাল যার কথা বলেছিলে?' ফুলটি বলল, 'আমি তো কাল ছিলাম না আজ ফুটেছি।' প্রজাপতি বলল, 'কালকের ফুল কোথায়?' ফুলটি উত্তর দিল—"সে ঝরে গেছে। তারই পাশের বোঁটায় আমি ফুটেছি আজ।" নতুন ফুলটি জোনাকির কাছে জানতে চাইল আজ সকালে কে যেন তাকে গুঞ্জন গানে বলে গেছে—

'গুণ্ঠন খোলা ওগো কাননিকা

ব্যর্থ করো না এমন আলো' – তাকে? তার আশায় সারাদিন বসে আছে সে। যদি দেখা পায় তবে যেন আর একবার আসতে বলে। 'দেখা পাই তো বলবো'—এই বলে মৃদু হেসে জোনাকিটি উড়ে গেল— 'আঁধারের বুকে ছোট একটি আলেয়া।'

বনফুল এগল্পে এটিই যেন বলতে চেয়েছেন যে জীবনের সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করা উচিৎ, নচেৎ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না, চাইলেও না। সময় অমূল্য এবং প্রবহমান।

১৩। নিয়তি প্রধান গল্প ঃ নিয়তি বা 'নেমেসিস' এমন এক অনির্দেশ্য শক্তি যা মানুষের জীবনকে কখন কোন্ মহাসংকটের বা সংগ্রামের মুখে বা বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেবে আগে থেকে তা কেউ বলতে পারে না। এই অনির্দেশ্য শক্তির প্রভাবে মানব জীবনের চরম পরিণতির কিছু নিদর্শন বনফুল ছোটগল্পে রূপায়িত করেছেন। মানুষ যতই বুদ্ধিমান, শক্তিমান, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পন্ন হোক না কেন এই নিয়তির অনির্দেশ্য শক্তির কাছে সে নেহাতই অসহায়। বনফুলের এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে আছে 'ক্যান্‌ভাসার', 'হাসির গল্প', 'অজান্তে', 'সমাধান', 'জৈবিক নিয়ম', 'খরমের দৌরাত্ম্য' প্রভৃতি। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলার আছে যে, বনফুলের গল্পে এই নিয়তি কখনো ঈশ্বরের কোন অনির্দেশ্য শক্তি, কখন আতিশয্যের বাড়াবাড়িতে বনফুল নিজেই নিয়তির অমোঘ শাস্তি বিধান করেছেন।

"ক্যান্‌ভাসার" গল্পে বনফুল যেন অমোঘ নিয়তির বিশ্বরূপ দেখিয়েছেন। যেখানে হাসি ও অশ্রু একই উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে। কাত্যায়ণীর অনেকদিন থেকে একটি শৌখিন শাড়ি কেনার সখ, কিন্তু বেকার ভৈরব অর্থাভাবে সে সখ মেটাতে অপারগ। ভৈরব স্ত্রীলোকের বাবুয়ানিভাব আর বিলাসিতার উপর যখন অগ্নিশর্মা তখন দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রোদে 'অভারক্যারেড্' হয়ে ক্যান্‌ভাসার হীরালাল এই পল্লীগ্রামে নীত হয়। সন্ধার পূর্বে কোন ট্রেন নেই, তাই যদি কিছু বিজনেস হয়, এই আশায় বেচারা দুপুরে রোদে চারিদিক ঘুরতে ঘুরতে ভৈরবের বাড়ি উপস্থিত হয়। হীরালাল

ভৈরবকে বলে তার কাছে দাঁতের ভাল মাজন আছে সে ব্যবহার করে দেখতে পারে বলে হীরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করে হাসতে থাকে। হঠাৎ ভৈরব উত্তেজিত হয়ে বলে, **'ওসব মাজন-ফাজন এখানে চলবে না'**, সে যেন এখান থেকে বিদায় নেয়, হীরালাল ক্যান্‌ভাসার হলেও রক্ত মাংসের মানুষ তো। তাই ভৈরবকে বলল **'আপনি কি এই গ্রামের মালিক?'** যুক্তিযুক্তি কথাটি ভৈরবে আত্মসম্মানে লাগল। উভয়ের বাক্‌বিতণ্ডা হতে হতে উত্তেজিত **'ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচন্ড এক চপেটাঘাত করিল!'** ভৈরবের এ ব্যবহার আশ্চর্যজনক সন্দেহ নেই, কিন্তু তদপেক্ষা আশ্চর্যজনক আর একটি কাণ্ড ঘটল তা হল— **'চড় খাইয়া হীরালাল সঙ্গে সঙ্গে ফোকলা হয়ে গেল। তাহার বাঁধানো দন্তপাটি ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।'** ভৈরব এতক্ষণ ভেবেছিল যে লোকটি ভণ্ড, জুয়াচোর। কিন্তু তার দাঁতগুলো যে নকল ছিল তা ভৈরব ভাবতেও পারে নি। স্তম্ভিত ভৈরব কালো কুচ্‌কুচে গোঁফ-জোড়াটার দিকে তাকিয়ে চেয়ে আছে দেখে হীরালাল বলল ওটাও নকল। এর পর ক্যান্‌ভাসার হীরালাল মুখে মৃদু হেসে করুণ সুরে ভৈরবকে বলে— **"কেন মারধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ— এই করেই কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে—"** একথা শুনে ভৈরবের মত আমরাও যেন হতবম্ব হয়ে পড়ি। তারপর **"হতবম্ব নির্বাক ভৈরবের বাক্যস্ফূর্তি হইলে সে বলিল, আচ্ছা, দিন একটা কৌটা মাজন।"**

ক্যান্‌ভাসার হীরালাল জীবনের সেই যন্ত্রণার শিকার, যার জন্য সে ঈশ্বর বা কোন অনির্দেশ্য শক্তি ছাড়া আর কাউকে তার এই জীবন পরিচিতির জন্য দায়ী করতে পারে না। এই অনির্দেশ্য শক্তির কাছে মানুষ নিতান্ত অসহায়। তবু জীবন তো থেমে থাকে না, এগিয়ে চলে। তাই ক্যান্‌ভাসার হীরালালকে পেট চালানোর তাগিদে ক্যান্‌ভাসারি করতে হয়। কোন দোষ না থাকলেও অপরের হাতে থাপ্পড় খেতে হয়। গল্পের শেষে বনফুল যে ব্যথা-বেদনা সঞ্চারিত করে দিয়েছেন ক্যান্‌ভাসার হীরালালের কথায়, তাতে আমাদের মনে অশ্রু জমাট বেঁধে যায়। হীরালাল কোন অন্যায় করে নি, পাপ করে নি, তবু তাকে অপরের কাছে লাঞ্ছিত হতে হল, এর চেড়ে বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে? তবে ভৈরব যে তার কৃতকর্মের জন্য যথেষ্ট অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে, তার সবিনয় নিরুত্তর এক কৌটা মাজন কেনার মধ্যে পরিস্ফুট। আসলে মানুষ ভুল করে, পাপ করে আবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। ভৈরবও তাই যেন করল। জীবনের এই হাসি-কান্না আনন্দ-বেদনার অনুতাপ-অনুশোচনার উৎস এক জায়গা থেকেই।

"সমাধান" গল্পেও নিয়তির সেই অনির্দেশ্য অঙ্গুলি হেলনে জীবনের বুঁচিকে নিয়ে নীহার রঞ্জনের ও ক্ষান্তমণির পরিবারের সমস্যা সমাধান হয়ে গেল। জন্মের পর থেকে যে বুঁচিকে নিয়ে এত আলোচনা, বছর দুই পরে সেই বুঁচির মাতুলালয়ে হঠাৎ মৃত্যুতে সকলের সমস্ত আলোচনারও সমাধান করে দিল। এগল্পে নিয়তির অনির্দেশ্য অঙ্গুলি নির্দেশের পাশাপাশি কুৎসিৎ কন্যাসন্তান জন্ম দিলে গ্রাম সমাজে কত রকম কথাবার্তা হজম করতে হয় পিতা-মাতাকে তার নগ্নরূপও

প্রকাশিত হয়েছে।

"জৈবিক নিয়ম" গল্পে নিয়তির নিষ্ঠুর কষাঘাতটি শিল্পী বনফুল যুবকটির অসংযমী আচরণে বীতশ্রদ্ধ হয়েই যেন হেনেছেন। **"হাসির গল্প"**– এ নায়ক হরিহরের জীবনটি হাসির পরিবর্তে অনির্দেশ্য নিয়তির কষাঘাতে করুন রসে পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

১৪। **অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার অবলম্বনে রচিত গল্প ঃ** অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার মানুষের মজ্জাগত। এথেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারকম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার মানুষের জীবনে চরম দুর্ভোগ ও দুর্গতি ডেকে আনতে পারে। বনফুল দেখেছেন মানুষের জীবনে এসব কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রভাবকে। বনফুলের এধরনের গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'কাকের কাণ্ড', 'দিবা দ্বিপ্রহর', 'জাগ্রত দেবতা', 'বাঘা', 'ছাত্র' প্রভৃতি।

"কাকের কাণ্ড" গল্পে কাকের ডাক অশুভ—এই কুসংস্কার বশেই জগত্তারিণীর জীবনে চরম দুর্ভোগ ডেকে এনেছে। কাকের কা-কা-কা-কা ডাক শুনে জগত্তারিণীর মনে হল **'কর্তা যে অসুখে মারা যান, সেই অসুখটি হইবার পূর্বে ঠিক এমনিই ভাবে কাক ডাকিয়াছিল।'** তাই বয়স্কা জগত্তারিণী বহু কষ্টে কদমগাছে কাকটি যখন এদিকে সেদিকে বার বার ডাকতে লাগল কিছু মারার ভান করলেও কাক ঐ একইভাবে ডেকে চলল। কিন্তু বাড়িতে বড় এমন কেউ নেই যে কাকটিকে তাড়াতে বলবে। অসহ্য কোমড় ব্যথা নিয়ে কাকের পিছনে লেগেছেন জগত্তারিণী। জগত্তারিণী কষ্টে সিঁড়ি ভেঙে উঠোনে নেমে, আরও কষ্ট করে একটি ছোট ঢিল কুড়িয়ে সক্রোধে সেটিকে কাকের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করতে গিয়ে পা পিছলে নিজে পড়ে কোমড়ে চোট পেয়েছেন, হাঁড় অল্পের জন্য ভাঙেনি। এর পরেই বাইরে চাকরিতে ব্যস্ত বড় মেজো সেজ ছেলে— সকলে ছুটে এসে জগত্তারিণীকে নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে সে এক হুলস্থুল কাণ্ড।

"জাগ্রত দেবতা" গল্পে বনফুল দেখিয়েছেন অন্ধ ভক্তি ও কুসংস্কার ভালো একটি মানুষকে কিভাবে পাগল করে তুলতে পারে। সনাতনপুরের মহাদেব বড়ই জাগ্রত দেবতা। প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় সেই দেবতা প্রাঙ্গণে মহোৎসব হয়ে থাকে। দেবতা যে কত জাগ্রত তার জ্বলন্ত প্রমাণ সে দিনই পাওয়া যায়। প্রমাণটা হল— প্রতিবারই ঐ বৈশাখী পূর্ণিমায় কেউ না কেউ পাগল হয়ে যায়। সে বছরও যথারীতি পূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হল, কিন্তু জানা গেল কেউ পাগল হয় নি। তখন সেই দেব বিশ্বাসীদের মনে সন্দেহ হল নিশ্চয় দেবতার পূজায় কোন ত্রুটি হয়েছে। অতএব মহাদেবের কোপে এগ্রামের কোন অমঙ্গল ঘটবেই। এই বিশ্বাসে ও আশঙ্কার মধ্যে অবিচলিত থাকলেন দৃঢ়বিশ্বাসী নীলমণি। তাঁর বিশ্বাস, কেউ কেউ না কেউ পাগল হয়েছেই, হয়তো তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বৈশাখের সেই প্রচণ্ড রৌদ্রদগ্ধ দিনে নীলমণি ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেউ পাগল হয়েছেন কিনা। খুঁজতে খুঁজতে নীলমণির চক্ষু রক্তাভ নাসাস্ফীত হয়ে

পড়েছে, পাগলের মত খুঁজে ফিরছে পাগলকে। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। নীলমণির এই অবস্থা দেখে **"সনাতনপুরবাসিগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে।"**

বনফুল এসব গল্পে আমাদের কোন ধর্মবোধকে আঘাত করতে চান নি। ভক্তির আতিশয্যে প্রকৃত ভক্তি দূরীভূত হয়ে পাগলামি পরিণত হয় অনেক সময়। বনফুল জীবনের কোন কিছুতেই বাড়াবাড়িকে সমর্থন করেন নি। বেশি বাড়াবাড়িতে কি পরিণাম হতে পারে তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন মাত্র।

১৫। জৈব প্রবৃত্তিমূলক গল্প ঃ মানব জীবন বিবিধ ভাবনা-চিন্তা সংস্কারের দ্বারা পরিশীলিত হলেও জীবনের সহজাত স্বাভাবিক প্রাণলীলাকে শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা কখনোই মার্জিত করা যায় না। কামনা-বাসনার জায়গায় মানুষ আর পশুতে কোন ফারাক নেই। প্রত্যেকেই প্রজনন ঘটায়, বংশ বিস্তার করে। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধিতে সংস্কারে মার্জিত হয়ে মানুষ 'মানুষ' হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই 'মানুষ' এর মধ্যেও সুপ্তভাবে থাকে জৈব-কামনা-বাসনা, উপযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতিতে তার প্রকাশ ঘটে। কামনা-বাসনা মানুষের মনের মধ্যে থাকে না, এমনটা হতেই পারে না। কিন্তু স্বাভাবিকতাকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি তার অতিরেক জীবন সংকটও সংশয়ের কারণও হতে পারে। বনফুল জীবনের সেই প্রাকৃতিক প্রাণলীলাকে সাবলীল ভাবে প্রকাশ ঘটিয়েছে কিছু গল্পে। এসবের মধ্যে আছে - 'বুধ্নী', 'ঐরাবত' প্রভৃতি। তবে এসব গল্পেও বনফুলের একটা 'মেসেজ' আছে।

"ঐরাবত" গল্পে প্রাকৃতিক প্রাণলীলার বিজয় বৈজয়ন্তী ঘোষিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের সর্বদ্বার রুদ্ধ করে ব্রহ্মচারী ত্রিগুণানন্দ নিজস্ব পন্থায় সমস্ত 'বখেরা' মেটাতে গিয়ে গঙ্গার তোড়ে কিভাবে ঐরাবতের মত ভেসে গেল তা মজাকর ঘটনার মধ্য দিয়ে রূপায়িত হয়েছে।

'ত্রিগুণানন্দ শুধু ত্রিগুণ নয়—বহুগুণেরই আকর ছিলেন। প্রচণ্ড ধার্মিক, প্রচণ্ড সংযমী, অথচ বয়স চল্লিশের নীচেই।' শরীরে প্রতি তার ভীষণ যত্ন। ত্রিগুণানন্দবাবুর প্রসিদ্ধির প্রধান কারণ— **"তাঁর মৌলিকতা। এবং তাঁর মৌলিকতার মূল কথা সকল জিনিসের গোড়া বাঁধিয়া কাজ করা।"** জীবনে স্বাভাবিক কামনা-বাসনাকে অস্বীকার করে সাধু হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়। সে ভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু দৈহিক কামনা-বাসনা মাঝে মধ্যেই উঁকি দেয় ত্রিগুণানন্দবাবুর। তাঁর **'সিনেমায় দেখা নায়িকা, কোনদিন মাসিকে দেখা ছবি, কোনদিন রাস্তায় দেখা তরুণী, একটা না একটা কেহ প্রত্যহই আসিয়া স্বপ্নে দেখা দিতে লাগিলেন।'** তার কিছু দিন অতিবাহিত হবার পর এ সত্যটি তার কাছে পরিস্ফুট হল যে, **"আমার মনের কামনা মরে নাই, ঘুমাইয়াছিল। সেই সুপ্ত কামনা এখন ক্ষুধিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার দাবি করিতেছে।"** শেষে দেখা গেল ত্রিগুণানন্দ স্টেশনে অবতরণ করেছেন,

"সঙ্গে একটি হাল-ফ্যাশান তন্বী তরুণী। ঐরাবতের ক্লীন শেভড্, গোঁফ দাড়ি একেবারেই নাই। মাথায় দশ-আনা ছয় আনা চুল ছাটা। মুখে একটি সুদৃশ্য পাইপে জ্বলন্ত সিগারেট। পরিধানে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি এবং জরিপাড় মিহি ধুতি। পায়ে পেটেন্ট লেদারের কুচকুচে কালো পাম্পসু। হাতে সোনার রিষ্টওয়াচ্। সর্বাঙ্গ হইতে ভুরভুর করিয়া এসেন্সের গন্ধ ছাড়িতেছে।" গল্পকথক নির্বাক হয়ে দেখতে লাগলেন, ত্রিগুণানন্দ বললেন— 'হাঁ করে দেখছিস কি? এই তোর বৌদি। বখেড়া মিটিয়ে ফেলেছি।' এইভাবে পৌরাণিক গল্পে গঙ্গার তোরে ঐরাবত যেমন ভেসে গিয়েছিল, ত্রিগুণানন্দবাবুও জীবনের স্বাভাবিক জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায় ভেসে গেলেন।

এ পর্যন্ত আলোচনায় বনফুলের গল্পের **'মোটমুটি'** একটি শ্রেণী বিভাগ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বনফুলের গল্পের সংখ্যা ও বিষয় বৈচিত্র্য এত বেশি যে তাঁর সমস্ত গল্পের আলোচনা কোন একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় বেঁধে করা সম্ভব নয়। আমি পূর্বেই বলেছি বনফুলের প্রত্যেকটি গল্পই এক একটি শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য। শিল্পীর মানস প্রবণতাটি সংক্ষেপে অনুধাবন করার জন্যই আমার এই প্রচেষ্টা। কেননা, এমন অনেক গল্পই দেখা যাবে দুই বা ততোধিক শ্রেণীতে বিবেচিত হবার যোগ্য। তাই এই বিভাগগুলিও একেবারে অবিভাজ্য বিভাগ নয়। বনফুলের সৃষ্টি সম্ভারের বিচিত্র নমুনা বিশেষ কিছু প্রবণতা ধরে বিশেষ কিছু ছাঁচে ঢালা হয়েছে মাত্র। এর উদ্দেশ্য, শিল্পীর মানস প্রবণতাটি ধরা। তবে এতেও যে বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়ের বিভিন্ন মধ্যে এই শ্রেণী বিভাজিত আলোচনা কিছুটা হলেও তাঁর গল্প পাঠকের তাঁর গল্প সম্পর্কে একটা পরিস্কার ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে— একথা বলাই বাহুল্য।

–ঃ উল্লেখপঞ্জী ঃ–

১। 'বনফুল ঃ জীবন, মন ও সাহিত্য'— ড. ঊর্মি নন্দী। করুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ: কলিকাতা পুস্তকমেলা – ১৯৯৭। পৃ .– ৭৫।

২। 'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র'— পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা ও সংকলন– চিরন্তন মুখোপাধ্যায়। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ২০০৫। পৃ. – ১৩।

৩। 'জীবন-শিল্পী বনফুল' (প্রবন্ধ)— বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ, ৬ ও ১৩ই আগষ্ট, ১৯৯৯। বনফুল শতবর্ষ স্মরণ ক্রোড়পত্র।পৃ. – ১০৭।

৪। 'সাহিত্যে ছোট গল্প'– নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। চতুর্থ মুদ্রন, শ্রাবণ ১৪১৬। পৃ. – ২০১।

৫।'বনফুল-এর গল্প সংগ্রহ'- এর দ্বিতীয় শতকে অন্তর্ভুক্ত ভূমিকা — পরিমল গোস্বামী। 'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র'- পরিকল্পনা, প্রস্তাবনা ও সংকলন- চিরন্তন মুখোপাধ্যায়। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ২০০৫-এ মুদ্রিত। পৃ. - ৭৫৪।

৬। 'বনফুলের ছোটগল্প'(প্রবন্ধ)— উজ্জ্বল কুমার মজুমদার। ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' - গ্রন্থে মুদ্রিত। বাণীশিল্প প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৮২। পৃ.- ৫১।

৭। 'আত্মশুদ্ধ জীবন দৃষ্টির আলোকে বনফুল'(প্রবন্ধ)— দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' - গ্রন্থে মুদ্রিত। বাণীশিল্প প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৮২। পৃ.- ৮৫।

৮। 'বৃন্তলগ্ন বনফুল'(প্রবন্ধ)— বীতশোক ভট্টাচার্য। ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' - গ্রন্থে মুদ্রিত। বাণীশিল্প প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৮২। পৃ.- ৮১।

৯। 'The Theory of Drama'--- Allardyce Nicoll. Doaba House Pub lishers, Reprinted: 2002. Page - 36.

১০। 'বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প'—জগদীশ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। বাণীশিল্প সংস্করণ, জুলাই ২০০১, ভূমিকা, পৃ - ১৭।

চতুর্থ অধ্যায়

বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী

চতুর্থ অধ্যায়

"বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী"

'ভাষা' পারস্পরিক সংযোগ স্থাপনের বা জ্ঞাপনের (Communication) একটি বিশেষ মাধ্যম। তবে ভাষা শুধু পারস্পরিক সম্পর্কই স্থাপিত করে না, সেই ভাষা, ব্যবহারকারী বক্তার স্বকীয়তাও নির্দেশ করে। কেননা, একই বক্তব্য ও বিষয় ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হাতে লিখিত হলে তার প্রকাশভঙ্গি আলাদা আলাদা হতে বাধ্য। কারণ, লেখকের কাল, মানসিকতা, পরিবেশ, পরিস্থিতি সেই বাচনিক ভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করে এবং লেখককে বিশিষ্ট করে তোলে। এই অধ্যায়ে বনফুল তাঁর বিভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের চরিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তাঁদের স্বভাব, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সে ভাষার স্বরূপ কেমন, তা চরিত্রের সঙ্গে কতটা সাজুয্য লাভ করেছে, সেই ভাষা ব্যবহারের বিশেষত্ব, রীতি বনফুলকে কিভাবে বিশেষ করে তুলেছে, ভাষা শৈলীর সেই বিশিষ্টতার বিচার বিশ্লেষণ করা হবে।

বিখ্যাত রীতি বিজ্ঞানী জর্জ লুই বুঁফো তাঁর 'Discourse Sar Le Style' (1753) গ্রন্থে বলেছিলেন **'Style is the man himself.'** অর্থাৎ 'স্টাইল' হচ্ছে **'লেখক - মানুষটি'**। স্টাইল সম্পর্কে বুঁফোর এই উক্তি সম্পর্কে যত বিতর্কই থাক না কেন, এই উক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা, 'লেখক-মানুষটির' অনুভূতির প্রকাশ তার রচনা নিরপেক্ষ নয়। 'স্টাইল' হ'ল ভাষার সেই বিশেষ ধর্ম বা গুণ যা দিয়ে লেখকের বিশিষ্ট চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি প্রভৃতিকে যথার্থরূপে পাঠকমনে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে, কিংবা বলতে পারি, পাঠক ও লেখকের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তবে সেই ভাষা অবশ্যই লেখ্যভাষা হতে হবে।

যে কোন লেখকের লেখায় তাঁর বিশেষ কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তবে সেগুলি পৃথকভাবে দেখানো যায় না, অথচ অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায়। এইসব গুণের যোগফল হল 'লেখক-মানুষটির' ব্যক্তিত্ব। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এই একাত্মতায় যে বিশিষ্ট ভঙ্গিটি প্রকাশ পায় তাকেই বলে 'স্টাইল'। এই 'স্টাইল' **'লেখকের অন্তরশায়ী চেতনা'**।[১] এই চেতনা প্রকাশ লাভ করার জন্য বিশেষ ধরনের শব্দ প্রকল্প গ্রহণ করে। এক-এক লেখকের ভাষা প্রকাশ ভঙ্গিমা এক-এক রকম। আবার স্থান-কাল-পাত্র ভেদে লেখকের রচনারীতিরও নানা বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন ঘটে যায়। ভাষা শৈলীতে (**Language Style**) সেই বিষয়ের সঙ্গে লেখকের বাহ্যিক নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও কিভাবে এক আভ্যন্তরীণ-যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে লেখককে বিশিষ্ট করে তোলে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়। একই লেখক প্রসঙ্গ ভেদে (**Contextual Variation**) ভাষা শৈলীরও পরিবর্তন ঘটান। যে-কারণে বনফুলের উপন্যাসের ভাষাভঙ্গি যেমন, ছোটগল্পের ভাষাভঙ্গি তেমন নয়। তাঁর উপন্যাসের ভাষার চাইতে ছোটগল্পের ভাষা অনেক বেশি শ্লেষাত্মক, তির্যক, ব্যঞ্জনাগর্ভ, কটাক্ষতায়পূর্ণ। প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভাষার এই পরিবর্তনকে সমাজ

ভাষা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'রেজিস্টার' (**Register**) বা 'ভাষামুদ্রা'।

'স্টাইল' কি, এর বৈশিষ্ট্য কি হওয়া উচিৎ এ সম্পর্কে বিভিন্ন পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সমালোচকেরা তাঁদের সুচিন্তিত মত প্রদান করেছেন। ফ্লোবেয়ারের মতে, স্টাইল হল সেই বিশেষ ভঙ্গি, যা বিভিন্ন বস্তুকে লেখক একান্ত নিজস্বতায় প্রকাশ করেন। কার্ডিনাল নিউম্যানের মতে, শিল্পীর চিন্তা ও চেতনার যথার্থ ভাষারূপ হল স্টাইল। ফরাসী লেখক স্তাঁধালের মতে, লেখক-ব্যক্তিত্বের মনোভাবের যথার্থ শিল্পরস সমৃদ্ধ প্রকাশই স্টাইল। শোপেনহাওয়ের মতে, স্টাইল হল লেখকের মনের বিভিন্ন ভাবনার ভাষাশ্রয়ী বহিঃপ্রকাশ। লেখকের মনোভাবের সেই শিল্পরস সমৃদ্ধ প্রকাশে **"শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ অলংকার প্রভৃতির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে ওঠে। তাই শব্দ, বাক্য, চিত্রকল্প, অলংকারের আবরণে মণ্ডিত যে লেখক-ব্যক্তিত্ব, তারই নাম স্টাইল। তা ব্যক্তির পোশাক নয়, তার রক্ত-মাংস-হাড়। চিন্তা-অনুভূতি-উপলব্ধি থেকেই স্টাইলের উৎপত্তি, সুতরাং স্টাইলকে এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না।"**[২] ড. পবিত্র সরকারের মতে, 'শৈলী' (**Style**) হল লেখকের দ্বারা সচেতন বা অজ্ঞাতসারে নিয়োজিত ভাষাগত উপায় (**Means**), যার সাহায্যে পাঠক ও লেখকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

লেখকের ব্যক্তিত্ব ও লেখনি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে স্টাইলের গুরুত্ব আজ সর্বজনবিদিত। এই স্টাইলের প্রকাশ ঘটে লেখককৃত ভাষাশ্রয়ী সাহিত্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। ভাষা যেহেতু মনোভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম সেইহেতু সেই ভাষার স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা একান্ত প্রয়োজন। এই স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা স্টাইলের মূলভিত্তি। অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা,ধোঁয়াটে ভাব আমাদের মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না। তাই গদ্য-স্টাইলের বর্ণনা দিতে গিয়ে আনাতোল ফ্রাঁস বলেছেন — গদ্যের প্রধান গুণ স্বচ্ছতা, অশেষ স্বচ্ছতা, গভীর স্বচ্ছতা। চিন্তার শৃঙ্খলা থেকেই ভাষার এই স্বচ্ছতা আসে। চিন্তাদৈন্য, বক্তব্যের অস্পষ্টতা ও অত্যধিক অলংকারপ্রিয়তা স্টাইলকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। স্টাইলের পরবর্তী গুণগুলি হলো সংক্ষিপ্ততা, পরিমিতিবোধ, সংহতি (ব্রেভিটি), বৈচিত্র্য, নাগরিকতা (আরবানিটি), সরলতা (সিম্প্লিসিটি)। স্টাইলের এই ছয়টি বৈশিষ্ট্যই ব্যক্তি-লেখককে পাঠকের সামনে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তোলে। ফরাসী গদ্যশিল্পী মঁতেন স্টাইলের তিনটি গুণের কথা বলেছেন— ১। স্বচ্ছতা (ক্ল্যারিটি), ২। সংহতি (ব্রেভিটি), ৩। সরলতা (সিম্প্লিসিটি)। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরলতা ও স্পষ্টতাকে স্টাইলের প্রধান গুণ বলে বর্ণনা করেছেন।

প্রত্যেক লেখকই নিজের মানসিক প্রবণতা, বিষয়, পরিবেশ-পরিস্থিতি নির্বাচনের, ভাষা সংস্থানের (System of Language) মধ্য দিয়ে নিজস্ব একটি শৈলী রচনা করেন এবং সেই শৈলীর কারণে তিনি অন্যান্য লেখকবৃন্দ থেকে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন। তবে একই লেখক প্রসঙ্গের (Context) পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু ভাষার পরিবর্তন ঘটান, সেহেতু কোন একটি বিশেষ শৈলী কোন বিশেষ লেখকের ভাষারীতি না হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ঔপভাষিক

শৈলী, আঞ্চলিক শৈলী, স্বসৃষ্ট কিছু শব্দাবলী, উপমা, রূপক, প্রভৃতি অলংকার বাক্যের বিশেষ ধরন, চরিত্রের মুখে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষার প্রকৃতি প্রভৃতি সবকিছু মিলেই লেখকের স্টাইলের সামগ্রিক রূপচিত্র ধরা পড়ে। কেননা, স্টাইল শুধু ভাষার ব্যাকরণ সম্মত বা বিজ্ঞান সম্মত বিচার-বিশ্লেষণই নয়, তা রচনা ও রচনাকারের মিলিত সামগ্রিক রূপের বহিঃপ্রকাশ।

একজন লেখকের মধ্যে এভাবে একাধিক স্টাইলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে এর কারণ অনুসন্ধান করা যায়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কারণে এক মানুষকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ভাষায় কথা বলতে হয়। যেমন কোন একজন অধ্যাপক তাঁর শিক্ষায়তনে যে ভাষায় ছাত্র-ছাত্রীদের ভাষণ দেবেন, বাড়িতে সে ভাষায় কথা বলেন না, আবার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডার ভাষাও তাঁর আলাদা। তাই বলে ব্যক্তিটি তো বিভিন্ন নয়, একই ব্যক্তি প্রয়োজন অনুসারে, পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেন মাত্র। সেই ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন ভাষা বৈশিষ্ট্য নয়, সামগ্রিক ভাষারূপই তাঁর ব্যক্তিত্ব ও ভাষাশৈলীর পূর্ণ পরিচয় বাহক। একজন লেখকের ভাষা বিশ্লেষণে এই সামগ্রিকতার বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হয়। ভাষার এই রকমফেরের কারণ হল— সামাজিক সম্পর্ক। এই সামাজিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে শৈলী বা রীতির পরিবর্তন। তাই লেখক পরিস্থিতি অনুযায়ী কোথাও সাধুভাষা, কোথাও মান্য চলিত ভাষা, কোথাও আঞ্চলিক ভাষা (Dialect) কোথাও সমাজ উপভাষার (Sociolect), কোথাও শ্রেণী উপভাষা (Class Dialect), কোথাও ভিন্ন ভাষা থেকে শব্দাবলী ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। লেখকের এতসব সাধ্য-সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য পাঠকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। সেই সংযোগ স্থাপনে স্টাইল বা শৈলী একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম। লেখক তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্টরূপে পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই তাঁর কর্তব্য শেষ।

একজন লেখক তাঁর স্বকীয় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ভাষাশৈলীর রূপ দিয়ে থাকেন। সেই ভাষা শরীরে ভাষারূপই নয়, ব্যক্তি লেখকের বিশেষ মানসপ্রবণতাটিও ধরা পড়ে। আবার ব্যক্তি লেখকের অভিজ্ঞতা ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি শৈলীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়। তাই শৈলী ও লেখক ব্যক্তিত্বটি একে অপরের পরিপূরক।

তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলার যে, সাহিত্য যেহেতু ভাষাশ্রয়ী প্রকাশ মাধ্যম, আবার ভাষা যেহেতু সমাজ-সংস্কৃতি বিন্যাসের সঙ্গে যুক্ত, আর সমাজ-সংস্কৃতি যেহেতু সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল, সেহেতু ভাষাশৈলীর সুনির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই। স্থান-কাল-পাত্র লেখকের বক্তব্য-বিষয় ও মানসিকতা অনুসারে ভাষাশৈলীও পরিবর্তনশীল। সেইভাষা শৈলীর মধ্যে যে ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যগুলি সবচেয়ে আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেগুলি চিহ্নিত করা এবং লেখকের ব্যক্তি লক্ষণ রচনার মধ্যে আবিস্কারের পর রচনায় তা কিভাবে অন্বিষ্ট হয়েছে বা আদৌ হয়েছে কি না তা খুঁজে দেখতে হবে। একথা স্পিৎজার বলেছেন। কোন লেখকের সাহিত্যকৃতির ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ যে বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করতে হয় সেগুলি হল — ১। ধ্বনিগত প্রসঙ্গ (Phonologi

cal Context) ২। রূপতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ (Morphological Context) ৩। বাহ্যিক প্রসঙ্গ (Syntactic Context) ৪। শব্দ বা শব্দার্থগত প্রসঙ্গ (Lexical & Semantic Context) ৫। লেখরীতিগত প্রসঙ্গ (Graphological Context) প্রভৃতি।

এবারে বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ করে তাঁর বিশেষ মানস প্রবণতাটি গল্পকথার ভাষাশরীরে কিভাবে প্রকাশ লাভ করে একাত্মতা ঘটিয়েছে তা বিশ্লেষণে অগ্রসর হতে পারি—

'বনফুল' এই নামটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি ব্যক্তিত্বের ছবি আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে যিনি সংক্ষিপ্ত পরিসরে, মিত বাক্য বিন্যাসে, জ্যা-মুক্ত তীরের গতিতে সংযত, সংহত ভাষায় এক-একটি মহাকাব্যোপম ছোটগল্প রচনা করেছেন। অবশ্য বড় মাপের গল্পও তিনি লিখেছেন, তবে সেখানেও তাঁর শিল্পের সেই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। বনফুল জীবনে বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এক ঋদ্ধিমান লেখক-ব্যক্তিত্ব। পড়াশোনা ও চাকুরি সূত্রে তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছেন, বিভিন্ন মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন, তাদের মানসিকতা, ক্রিয়াকলাপ, জীবনযাত্রা শিল্পরসবোধে জারিত করে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল। তাদের ভাষা-ভঙ্গিমা জীবনবোধ ইত্যাদি রূপায়িত করেছেন তাঁর গল্পে **" বনফুলের বাংলা জলের মতো, তেমনি সহজ আর বহমান,খরটান আছে তবু বোঝা যায় জলের মতন কোনো রং নেই তার, কোনোই রূপ নেই, যখন যে প্রসঙ্গের সংরাগ এসে লাগে তাতেই সে হয়ে ওঠে রঞ্জিত"**[৩] বনফুলের ছোটগল্পের সেই ভাষাশৈলী কিভাবে রূপলাভ করেছে তা তাঁর **'ছোট' 'মাঝারি'** ও **'বড়'**— এই তিন আকৃতির ও বিভিন্ন শ্রেণীর গল্পের আলোচনা করে দেখে নিতে পারি—

প্রথমে 'ছোট' আকৃতির গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—

ঃ"নিমগাছ" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণঃ

"নিমগাছ" গল্পটির ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্য সংখ্যা	=	২৯ টি
বাক্যের আয়তন	=	১) হ্রস্ব ২৭ টি
		২) দীর্ঘ২ টি
অনুপাত	=	২৭ : ২

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	=	১৭৮ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	২৩ টি
	শতকরা হার	=	১২ %
২)	অর্ধ্ব-তৎসম শব্দ	=	১ টি
	শতকরা হার	=	০.৫৬ %
৩)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	১৫০
	শতকরা হার	=	৮৪ %
৪)	ইতর শব্দ	=	২ টি
	শতকরা হার	=	১ %
৫)	আরবী-ফার্সী	=	২ টি
	শতকরা হার	=	১ %

গ। গল্পটি ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। মান্য চলিত রীতির ব্যবহার।

২। ছোট ছোট সরল বাক্যের ব্যবহার।

৩। সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার ।

৪। অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে দীর্ঘ জটিল বাক্যের সৃষ্টি।

৫। পদাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি।

৬। অনির্দেশক কর্তার ব্যবহার।

৭।বাক্য গঠন ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV),উদ্দেশ্য + ক্রিয়া + বিধেয় (SVO), বিধেয় + ক্রিয়া (OV), ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৮। সংযত, সংহত ভাষা নির্মাণ।

৯। বিরাম চিহ্ন ঃ পূর্ণচ্ছেদ(।), কমা(,), ড্যাস(—), বিস্ময়বোধক চিহ্ন (!), ডট্ ডট্ চিহ্ন ব্যবহার(. . . . .), বিসর্গ চিহ্নের (ঃ) ব্যবহার।

১০। সিদ্ধান্ত অংশ ও হেতু অংশের বাক্য সৃষ্টি।

১১। উপমা, রূপক অলংকারের ব্যবহার।

১২। অনুগামী শব্দের ব্যবহার।

১৩ । বিপ্রতীপতা সৃষ্টি।

১৪ । লেখক-ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত ।

"নিমগাছ" গল্পটির ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ- বনফুল তাঁর গল্পের শরীর নির্মাণে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের সুচিন্তিত বিচিত্র বিন্যাস করেছেন। এতে গল্পের অবয়বগত বৈচিত্র্য এসেছে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের বিচিত্র সমাবেশে গল্প গতি লাভ করেছে। আমরা হ্রস্ব বাক্যের মধ্যে সেই সব বাক্যকে রেখেছি যার মধ্যে বারো থেকে তেরোটি শব্দ আছে। আর দীর্ঘ বাক্যের মধ্যে সেই সব বাক্যকে রেখেছি যেগুলিতে তেরোটি শব্দের ওপরে আছে। এই গল্পে বনফুল ২৭টি হ্রস্ব বাক্য এবং ২টি দীর্ঘ বাক্যে গল্পের শরীর নির্মাণ করেছেন।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—

বনফুলের ছোটগল্পে তৎসম শব্দের তুলনায় তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, আঞ্চলিক উপভাষা, সামাজিক শ্রেণী উপভাষা, ইতর শব্দ প্রভৃতির ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যায়। সন্ধি-সমাসবদ্ধ শব্দের ব্যবহারও বনফুলের গল্পে কম। এগল্পে বনফুলের তৎসম, তদ্ভব, দেশী শব্দের ব্যবহার বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন —

খ-১) তৎসম শব্দ — অব্যর্থ, সিদ্ধ, চর্ম, মহৌষধ, যকৃত, প্রশংসা, কবি, কবিরাজ, পঞ্চমুখ, যত্ন, মুগ্ধ, দৃষ্টি, গৃহকর্ম, লক্ষ্মী, নূতন, সুন্দর, নক্ষত্র, স্তূপ, নিপুণা, বিজ্ঞ। ইত্যাদি ।

খ-২) অর্ধ-তৎসম শব্দ — পিষছে।

খ-৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত) — ভিতর, ছিঁড়ে, দাঁত, বাঁধিয়ে, ঝাঁক, নীল, দাঁড়িয়ে, দাদ, ডাল, বেগুন, হঠাৎ, আকাশ, সবুজ, ঠক, ফুল, সবুজ, ছাল, শিল, কাঁচা, খোস, হাজা, চুলকানি, কচি, পাতা, খুশি, শান, লোক, থোকা, শিকড়, বাড়ি, দশা। ইত্যাদি ।

খ-৪) ইতর শব্দ — বউটা, গজালে, জন্মানো।

খ-৫) আরবী-ফার্সী — বাহার, সায়র।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ—

গ-১) বনফুল তাঁর ছোটগল্পের ভাষাশরীর নির্মাণে সাধু ও চলিত — উভয়রীতির ভাষা ব্যবহার করলেও 'নিমগাছ' গল্পটিতে 'মান্য চলিত' (Standard Coloqual Language) রীতি ব্যবহার করেছেন। তবে সেই চলিত ভাষা মৌখিক বা কথ্য রীতির এত কাছাকাছি যে তা যেন মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে। যেমন—

১। 'কেউ ডালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।'

২। 'পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।'

৩। 'কেউবা ভাজছে গরম তেলে।'

৪। 'খোস দাদ হাজা চুলকানিতে লাগাবে।'

৫। 'চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।'

৬। 'কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।'

৭। 'এমনি কাঁচাই..... '

৮। 'কিংবা ভেজে বেগুন সহযোগে।'

৯। 'যকৃতের পক্ষে ভারি উপকার।'

১০। 'কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোকে...দাঁত ভাল থাকে।'

১১। 'কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

১২। 'বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হ'ন।'

১৩। 'বলে— নিমের হাওয়া ভালো, থাক, কেটো না।'

১৪। 'কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।'

১৫। 'আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।'

১৬। 'শান দিয়ে বাঁধিয়ে দেয় কেউ— সে আর এক আবর্জনা।'

১৭। 'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা।'

গ-২)'নিমগাছ' গল্পটি যেন গল্প নয়, গদ্য কবিতা। কবিতাকারে ছোট ছোট সরল বাক্যে গল্পটির ভাষা বুনোট। যেমন—

ক) 'কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।'

খ) 'পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।'

গ) 'হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল।'

ঘ) 'নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়।' —ইত্যাদি।

গ-৩) আবার 'কিন্তু' এই সংযোগমূলক অব্যয়টি দিয়ে দু'টি বাক্যকে যুক্ত করে যৌগিক বাক্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন—

১। 'নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না।'

২। 'কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।'

গ-৪) অসমাপিকা ক্রিয়াকে যুক্ত করে করে দীর্ঘ জটিল বাক্য তৈরিও বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি লক্ষণ, যা 'নিমগাছ' গল্পে লভ্য। যেমন— 'ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।'

গ-৫) এছাড়া প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্যে পদাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে গল্পের পরিণতির দিকে যাত্রা করা অথচ বক্তব্য বিষয়কে এতটুকুও গৌণ না হতে দেওয়া বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলীর বৈশিষ্ট্য, যা 'নিমগাছ' গল্পে উপস্থিত।

গ-৬) অনির্দেশক কর্তার ব্যবহার করা হয়েছে কোন কোন বাক্যে। যেমন— 'কেউ' 'কেউবা'।

এতে বক্তব্যের ব্যাপ্তি ঘটেছে।

গ-৭) বনফুলের বাক্য গঠন বিবিধ প্রকার। কোন বাক্যে উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV) বা উদ্দেশ্য + ক্রিয়া + বিধেয় (SVO) ইত্যাদি ধরনের। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা বাক্য গঠন করা হয়েছে 'কিন্তু' সংযোগমূলক অব্যয় দিয়ে। যেমন—

১) 'কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।'

২) 'হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এল।'

৩) 'কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

৪) 'নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়।'

৫) 'কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।' — ইত্যাদি

গ-৮) সংযত, সংহত, নির্মেদ ভাষা নির্মাণ ও গল্প গঠন বনফুলের আরেকটি ভাষাশৈলীর বৈশিষ্ট্য, যা এগল্পে দেখা যায়।

গ-৯) কমা (,), ড্যাস (—), ডট্ ডট্ (....), বিস্ময়বোধক চিহ্ন (!) প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার গল্পের ভাববস্তুকে ভাবান্তরে সঞ্চারিত করে। বনফুলের ছোটগল্পে এই যতিচিহ্নের ব্যবহার ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'নিমগাছ' গল্পের ভাষাশরীর নির্মাণে ড্যাস (—), ডট্ ডট্ চিহ্নের (....) বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

১। 'বলে উঠিল, —বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি, ...কি রূপ!',

২। 'কবি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।'

৩। 'এমনি কাঁচাই.....'

৪। 'শান দিয়ে বাঁধিয়ে দেয় কেউ— সে আর এক আবর্জনা।'

গ-১০) এ গল্পে এমন বাক্য পাই যার স্পষ্টত দুটি অংশ— একটি সিদ্ধান্ত অংশ, শেষেরটি হেতু অংশ। যেমন—

১। 'কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কতলোক.....দাঁত ভাল থাকে।'

২। 'বলে—নিমের হাওয়া ভাল, থাক, কেটো না।'

গ-১১) 'নিমগাছ' গল্পে রূপক, উপমা অলংকারের ব্যবহার লেখকের বক্তব্য-বিষয়কে আরো স্পষ্ট, ভাব গভীরতা দিয়েছে। যেমন—

রূপক ঃ 'নিমগাছ আর গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটি' গল্পের শেষে অভিন্ন হয়ে গেছে।

উপমা ঃ ১। 'থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার .....এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে।'

গ-১২) বনফুল এগল্পে একটি অনুগামী শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেটি হল —— 'থোকা থোকা'।

গ-১৩) গল্পের মধ্যে বিপ্রতীপতা বা বিরূদ্ধভাব সৃষ্টির জন্য বনফুল উপযুক্ত ভাষা ও পরিবেশ

রচনা করেন। 'নিমগাছ' গল্পে সাংসারিক প্রয়োজনে নিমগাছের ছাল, পাতা, ডালের ব্যবহারে নিমগাছের অত্যাচারের চিত্রের পাশাপাশি এমন এক চরিত্রের আমদানি করলেন যে 'কবিরাজ নয়, কবি।' সে 'মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। বলে উঠল— বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি..... কি রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার।' নিমগাছটির ইচ্ছে করল লোকটার সঙ্গে চলে যায়, কিন্তু পারল না। কারণ তার 'মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে।'গল্পের মধ্যে বিপ্রতীপতা বা বিরূদ্ধভাব সৃষ্টির জন্য বনফুল উপযুক্ত ভাষা ও পরিবেশ রচনা করেন। 'নিমগাছ' গল্পে সাংসারিক প্রয়োজনে নিমগাছের ছাল, পাতা, ডালের ব্যবহারে নিমগাছের অত্যাচারের চিত্রের পাশাপাশি এমন এক চরিত্রের আমদানি করলেন যে 'কবিরাজ নয়, কবি।' সে 'মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু। বলে উঠল— বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি..... কি রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার।' নিমগাছটির ইচ্ছে করল লোকটার সঙ্গে চলে যায়, কিন্তু পারল না। কারণ তার 'মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে।' এভাবে কবিরাজের সঙ্গে কবি চরিত্রের আমদানিতে বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি হয়েছে।

গ–১৪) কোন সাহিত্যকৃতির ভাষাশৈলী বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লেখকের ব্যক্তিত্ব ও রচনার অভিপ্রায়টি ধরা পড়ে। কেননা, লেখক সুচিন্তিত ভাষাকে আশ্রয় করেই তাঁর সাহিত্য রচনা করেন। বনফুলের গল্পগুলির ভাষাশৈলী অন্বেষণেও আমরা শিল্পী বনফুল ও ব্যক্তি বনফুলের মানস প্রবণতা অনুধাবন করতে পারি। বনফুল যে অত্যন্ত সংযত ব্যক্তিত্বের অধিকারী, অথচ নিরহংকারী, তা তাঁর নিরহংকার সাদামাটা কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলির ব্যবহারেই বোঝা যায়। বিষয় নির্বাচনেও বনফুলের নিরহংকার অথচ দৃপ্ত মানসিকতাটি ধরা পড়ে। **"গল্পমাত্রেরই একটা না একটা পয়েন্ট থাকে। সেটা খুবই সূক্ষ্ম। সমস্ত গল্পটাই সেই পয়েন্টটুকুর জন্যেই তাৎপর্যবান। সেটুকু বাদ গেলে গল্প ঠিক ওতরায় না । বনফুলের বহু গল্প এই পয়েন্টেড কনক্লুশনের রসোত্তীর্ণ উদাহরণ। তাঁর ভাষা এ কাজে সাহায্য করেছে।"**[৪] বনফুল মনে করতেন, কোন গভীর কথা বলা জন্য কঠিন বিষয় নির্বাচনের প্রয়োজন হয় না, অনেক সহজ–সাধারণ বিষয় দিয়েও গভীর জীবনভাবনাকে রূপ দেওয়া যায়, **'ইহার জন্য রাম বা রাবণ হইবার প্রয়োজন নাই।'**[৫]

"বুধনী" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"বুধনী" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্য সংখ্যা		=	৫১ টি
বাক্যের আয়তন =	১) দীর্ঘ	=	১৩ টি
	২) হ্রস্ব	=	৩৮ টি
	৩) অনুপাত	=	১৩:৩৮

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	=	৪৯৫ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	১৪৯ টি
	শতকরা হার	=	৩০ %
২)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	৩৩৮ টি
	শতকরা হার	=	৬৮ %
৩)	ইংরেজি শব্দ	=	১ টি
	শতকরা হার	=	০.২০%
৪)	আরবী-ফার্সী শব্দ	=	৭ টি
	শতকরা হার	=	১ %

গ। গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাধু ভাষারীতির ব্যবহার

২। বাক্য গঠন ঃ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV), কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া (OSV), কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম (SVO), ইত্যাদি।

বাক্যাংশের স্পষ্টতা।

৩। ছোট ছোট সরল বাক্যের পাশাপাশি দীর্ঘ জটিল বাক্যের ব্যবহার।

৪। উপমার প্রয়োগ।

৫। প্রতীকের ব্যবহার।

৬। ফ্ল্যাস্ ব্যাক্ পদ্ধতির প্রয়োগ।

৭। বিপ্রতীপতা।

৮। অনুকার শব্দের ব্যবহার।

৯। লেখকের অঙ্গীকৃত হওয়া।
১০। ক্রিয়ার রূপ ঃ সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক।
১১। কার্য-কারণ সম্পর্কে বাক্য গঠন।

"বুধ্‌নী" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ-

'বুধ্‌নী' গল্পে বনফুল হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এগল্পে তেরোটি দীর্ঘ বাক্য ও আটত্রিশটি হ্রস্ব বাক্য রয়েছে।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ-বনফুল এ গল্পে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হল—
খ-১) তৎসম শব্দ—সহিত, তৈল, শিখা, মঙ্গলার্থে, বহির্ভূত, চক্ষে, কণ্ঠে, ক্রমাগত, পার্বত্য, প্রদেশে, সন্ধান, নৃশংস ইত্যাদি।
খ-২) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—সিঁদুর, ফুৎকারে, পুরাই, সলিতা, ফাঁসি, মাথা, মিনতি, গাছ ইত্যাদি।
খ-৩) ইংরেজি শব্দ—ড্রইংরুম।
খ-৪) আরবী-ফার্সী—গোলা, সড়কি, আদবকায়দা ইত্যাদি।
গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-
গ-১) 'বুধ্‌নী' গল্পে বনফুল সাধু ভাষারীতি অনুসরণ করেছেন। তবে সে ভাষারীতি তত তৎসম শব্দগন্ধী নয়। মূলতঃ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে দীর্ঘরূপ রেখে সেই সাধুভাষা রীতির শৈলী নির্মিত। তবে বিষয়বস্তুর অনুরোধে কোন কোন গল্পের কোন কোন অনুচ্ছেদে তৎসম শব্দ ব্যবহারের বাহুল্য যে নেই তা বলা সমীচীন হবে না। যেমন—"যাহারা গুহা-নিবাসী সুপ্ত শার্দুলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে, মৃগের সঙ্গে ছুটিয়া পাল্লা দেয়, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে অহরহ অবলীলাক্রমে ওঠে নামে, পূর্ণিমা নিশিতে মহুয়ার মদে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়—তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নাই।"— ইত্যাদি।
গ-২) এগল্পের বাক্য নির্মিতিতে বনফুল বিভিন্নভাবে বাক্য বিন্যাস করেছেন। যেমন— কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV), কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম (SVO), কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা (OVS) প্রভৃতি ধরনের। নমুনা—

১। 'বুধ্‌নী তাহার স্ত্রীর নাম।'
২। 'বিল্টুর ফাঁসি দেখিতে গিয়াছিলাম।'

৩। 'হাজারীবাগের পার্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস।'—ইত্যাদি।

গ-৩) বনফুল তাঁর গল্পের ভাষাশরীরে একাধিক ছোট ছোট সরল বাক্যের পাশাপাশি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ জটিল বাক্যে তৈরি করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন—

হ্রস্ব বাক্য ঃ ১। 'বুধ্নী তাহার স্ত্রীর নাম।'

২। 'তাহার পর সেই বাঞ্ছিত দিবস আসিল।'

৩। 'সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল।

৪। 'বুধনী এক সন্তান প্রসব করিল।'

৫। 'অসহায় ক্ষুদ্র এক মানব শিশু।' —ইত্যাদি।

দীর্ঘ বাক্য.ঃ

১। 'জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমাটা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্টুর জীবন প্রদীপের তৈল নিঃশেষ প্রায় হইয়াছে— একথা কিছুতেই বলা চলিবে না।'

২। 'যাহারা গুহা-নিবাসী সুপ্ত শার্দুলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে, মৃগের সঙ্গে ছুটিয়া পাল্লা দেয়, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে অহরহ অবলীলাক্রমে ওঠে নামে, পূর্ণিমা নিশীথে মহুয়ার মদে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়—তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নাই।' —ইত্যাদি।

গ-৪) গল্পের ভাষাশরীরে উপমার প্রয়োগ বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল উপমার প্রয়োগ করেছেন। যেমন —'জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্টুর জীবন-প্রদীপের তৈল.....।'

উপমা অলংকার প্রয়োগের পাশাপাশি অনুপ্রাস অলংকারের ব্যবহারও বনফুলের গল্পে লক্ষ্য করা যায়। যেমন— 'নিকষ কালো-কৃশাঙ্গী কিশোরী বুধ্নী।' এই বাক্যটি বৃত্ত্যনুপ্রাস অলংকারের একটি নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা যায়। যেহেতু এখানে 'ক' বর্ণটি বিযুক্ত ভাবে চার বার আবর্তিত হয়েছে (বৃত্যনুপ্রাসে একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের যুক্ত বা বিযুক্ত ভাবে কমপক্ষে তিনবার আবর্তন আবশ্যক)।

গ-৫) অলংকার প্রয়োগের পাশাপাশি প্রতীকের ব্যবহার বনফুলের গল্পের ভাষাশৈলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য। এগল্পে 'বুধনীর খোঁপায় টকটকে লাল পলাশ ফুল' যৌনতা ও আকর্ষণের প্রতীক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর বিল্টুর হাতের 'বাঁশের বাঁশি' তাঁর প্রেমিক মনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ-৬) বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী নির্মাণের একটি বিশিষ্ট কৌশল হল 'ফ্ল্যাস্ ব্যাক্' পদ্ধতির প্রয়োগ। এই 'ফ্ল্যাস্ ব্যাক্' পদ্ধতিতে গল্পের প্রথমেই উপসংহারের বর্ণনা থাকে। তারপর মূল কাহিনীতে ঘটনা বিস্তারে সেই প্রথমে বর্ণিত কাহিনীর পরিণামের কারণ বর্ণনা করা হয়। এগল্পেও বনফুল প্রথমে বিল্টুর ফাঁসির খবর দিয়েছেন, তারপর বিল্টু ও বুধ্নীর জীবন কথা বর্ণনা করেছেন। তারপর বিল্টুর কেন ফাঁসি হল তা নির্দেশ করেছেন।

গ-৭) বিপ্রতীপতা বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশরীরের একটি বিশিষ্ট শৈলী। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল বিপ্রতীপতা সৃষ্টি করেছেন। এই বিপ্রতীপতা সৃষ্টি হয়েছে বুধ্‌নীর সন্তান হওয়া ও বিল্টুর তাকে হত্যা করার মধ্যে।

গ-৮) গল্পে অনুকার শব্দের ব্যবহার বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি দিক। বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পে অনুকার শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 'বুধ্‌নীর খোঁপায় টকটকে লাল পলাশ ফুল'

গ-৯) গল্পে সর্বজ্ঞ গল্পকথক তথা লেখকের অঙ্গীকৃত হওয়া একটি বিশিষ্ট শৈলী। বনফুল অন্যান্য গল্পের মত এগল্পে নিজেকে একীভূত করেছেন। যেমন— 'আমি ড্রইংরুম-বিহারী সভ্যলোক, বর্বর বন্যদম্পতির আদবকায়দা আমার জানা নাই।'

গ-১০) সমাপিকা ক্রিয়া—'হাজারীবাগের পার্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস।', 'বুধ্‌নী তাহার স্ত্রীর নাম।' ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়া—'তাহার পর সেই বাঞ্ছিত দিবস আসিল।', 'সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল।' ইত্যাদি।

যৌগিক ক্রিয়া—'ভীত মিনতিভরা কণ্ঠে সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া চলিয়াছে।' ইত্যাদি।

গ-১১) বনফুল অন্যান্য গল্পের মতো এ গল্পেও কার্য-কারণ সম্পর্কে বাক্য গঠন করেছেন। যেমন—"জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমাটা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্টুর জীবন-প্রদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে—এ-কথা কিছুতেই বলা চলিবে না। কারণ বিল্টুর জীবন-প্রদীপের তৈল পুরাই আছে, সলিতাও ঠিক আছে, শিখাও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে।"—ইত্যাদি।

"ক্যান্‌ভাসার" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"ক্যান্‌ভাসার" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্য সংখ্যা			=	৭৩ টি
বাক্যের আয়তন =	১)	দীর্ঘ	=	৫ টি
	২)	হ্রস্ব	=	৬৮ টি
		অনুপাত	=	৫ : ৬৮

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

মোট শব্দ সংখ্যা		=	৫৭৬ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	৬৮ টি
	শতকরা হার	=	১২ %
২)	অর্ধ্ব-তৎসম শব্দ	=	১ টি
	শতকরা হার	=	০.১৭%
৩)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	৪৮৫ টি
	শতকরা হার	=	৮৪ %
৪)	আরবী-ফার্সী	=	১৩ টি
	শতকরা হার	=	৩ %
৫)	ইংরেজি শব্দ	=	৯ টি
	শতকরা হার	=	২ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাধু ও চলিত — উভয় ভাষারীতি অনুসৃত।
২। বাক্য গঠন ঃ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV), কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম (SVO), কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া (OSV) ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলি স্পষ্ট।
৩। সক্রিয় কর্তার ব্যবহার।
৪। শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation)।
৫। ধ্বন্যাত্মক, অনুকার, অনুগামী শব্দের ব্যবহার।
৬। বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব।
৭। বিপ্রতীপতা।
৮। কার্য-কারণ সূত্রে কাহিনী বিশ্লেষণ।
৯। উপমা অলংকারের প্রয়োগ।
১০। বাগ্‌ধারার প্রয়োগ।
১১। ক্রিয়া রূপ ঃ সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক।

ক্যান্‌ভাসার" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ—বনফুল এ গল্পে ৭৩টি হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের সন্নিবেশ করেছেন। হ্রস্ব বাক্যের সংখ্যা ৬৮টি এবং দীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা ৫টি ।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—বনফুল এ গল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হল—

খ–১) তৎসম শব্দ—প্রচণ্ড, গণ্ডদেশ, গ্রাসাচ্ছাদন,কলহ, বাক্য, স্ফুলিঙ্গ, মূল, শৌখিন, দন্ত, সুন্দর ইত্যাদি।

খ–২) অর্ধ-তৎসম শব্দ—উচ্ছন্ন।

খ–৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—কাণ্ড, শখ, শাড়ি, হঠাৎ, দাঁতন, মাজন, গোঁফ, ছেলে, গাঁ, কচু, ঢের ইত্যাদি।

খ–৪) আরবী-ফার্সী—বাবুয়ানি, দুনিয়া, বুজরুকি, গরিব ইত্যাদি।

খ–৫) ইংরেজি শব্দ—সুটকেশ, ট্রেন, ওভারক্যারেড, বিজনেস ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-

গ–১) "ক্যান্‌ভাসার" গল্পের শরীর নির্মাণে বনফুল সাধু ও চলিত— উভয় রীতি অনুসরণ করেছেন। বিবৃতি অংশে সাধু ভাষা এবং প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। যেমন— "স্তম্ভিত ভৈরব তাহার কালো কুচকুচে গোঁফ-জোড়াটার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া হীরালাল একটু হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও । ভাল কলপও আমি রাখি। নেবেন? কেন মার-ধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ—এই করে কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চালাই।" ইত্যাদি ।

গ–২) 'ক্যান্‌ভাসার' গল্পের বাক্য গঠন বিবিধ প্রকারের। যথা—

১। 'কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যয়ণী।' (OS)

২। 'হীরালাল সুন্দর দন্তগুলি বিকশিত করিয়া আর একবার হাসিল।' (SOV)

৩। 'নিমের দাঁতনটা চিবাইতে চিবাইতে ভৈরব বলিল কচু—' (SVO) ইত্যাদি।

গ–৩) বনফুলের গল্পে সক্রিয় কর্তার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এগল্পেও তার নমুনা আছে। যেমন— 'ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল !', 'ভৈরব নিমগাছটার একটা ডাল নোয়াইয়া মটাস্ করিয়া একটা দাঁতন ভাঙিল।' ইত্যাদি ।

গ–৪) শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation) লেখকের একটি বিশেষ ভাষাশৈলী। বনফুলের গল্পের শব্দবিচ্যুতি তাঁকে বিশেষভাবে চেনায়। এই শব্দ বিচ্যুতি আবার অর্থ বিচ্যুতি ঘটাতে সাহায্য করে। যার ফলে বিচ্যুত শব্দটি ব্যঞ্জিত অর্থ নিয়ে হাজির হয়। যেমন— এগল্পের 'কচু' 'খাসা' 'মিঞা' শব্দগুলি।

গ–৫) বনফুলের গল্পলেখার ধরনটি হল কথকতার। সে কারণে তাঁর গল্পে কথ্যভঙ্গি আনয়নে

প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ, অনুগামী শব্দ পাই। এগল্পেও এ ধরনের কিছু শব্দ আছে। যেমন— 'বিলাস-লালসা', 'ঝক্‌ঝকে' 'হন্‌হন্' 'মাজন-ফাজন' 'মার-ধর' 'কষ্টে-সৃষ্টে'।

গ-৬) বনফুলের গল্পের ভাষাশৈলীর একটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১। 'ক্যান্‌ভাসার হীরালাল।'

২। '.....কিন্তু ট্রেনে ঘুমাইয়া পড়াতে বেচারা 'অভারক্যারেড' হইয়া এই পল্লীগ্রামে নীত হইয়াছে।'

৩। 'সন্ধার আগে ফিরিবার ট্রেন নাই।'

৪। 'যদি কিছু বিজনেস হয় এই আসায় বেচারা দুপুরে রোদেও চতুর্দিকটা একবার ঘুরিয়া দেখিতেছে।'

গ-৭) বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বিপ্রতীপতা সৃষ্টি হয়েছে। ক্যান্‌ভাসার হীরালালের প্রসঙ্গে ভৈরবের ভাবনার মধ্যে এই বিপ্রতীপতা বিদ্যমান। যে হীরালালকে ভৈরব জুয়াচোর ভেবেছিলেন, শেষে তিনি জানতে পারলেন যে ক্যান্‌ভাসারের উপযুক্ত ছেলেটি মারা যাওয়ায় বুড়ো বয়সে পেট-চালানোর তাগিদে তার এই ক্যান্‌ভাসারি। তাই যে ভৈরব প্রচণ্ড রেগে গিয়ে হীরালালের গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করলেন, তিনি নির্বাক হতবম্ব হয়ে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত এক কৌটা মাজন কিনলেন।

গ-৮) বনফুলের গল্পের একটি বিশেষ শৈলী হ'ল— কার্য-কারণ সূত্রে কাহিনী বিশ্লেষণ। এগল্পের প্রথম বাক্যে বনফুল জানিয়ে দিচ্ছেন—

"কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়ণী।

কাত্যায়ণীর বাক্যস্ফুলিঙ্গ যখন ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া অন্তর্বিপ্লব ঘটাইতেছিল, সে সময়টিতেই ক্যান্‌ভাসার হীরালালের সহিত যদি ভৈরবের দেখা না হইত এই কাণ্ডটি ঘটিত না।"—এর পর বনফুল সেই 'কাণ্ড' ঘটার কারণ বিশ্লেষণ করলেন।

গ-৯) বনফুলের গল্পের একটি বৈশিষ্ট্য হল বিবিধ অলংকারের প্রয়োগ। এগল্পে বনফুল একটি উপমা অলংকার প্রয়োগ করেছেন। সেটি হ'ল— '....ভৈরবের চিত্ত-বারুদে নিপতিত হইয়া ....।'

গ-১০) বনফুলের গল্পের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল বাগধারার প্রয়োগ। এগল্পেও ভৈরবের অর্থাভাবপ্রযুক্ত শৌখিন শাড়ি কেনার অসামর্থের প্রসঙ্গে কাত্যায়ণীর মুখ দিয়ে দুটি বাগ্‌ধারা নিজের মত করে ব্যবহার করেছেন—

১। 'যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল্ ধরে তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন?'

২। 'এক কড়ার মুরোদ নেই, বিয়ে করতে যাওয়া কেন তার?'

গ-১১) বনফুল এ গল্পে সমাপিকা, অসামাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'বেকার ভৈরব অর্থাভাবপ্রযুক্ত সে শখ মিটাইতে পারে নাই। (সমাপিকা ক্রিয়া), 'বলিয়া সে

নির্বিকারভাবে দাঁতন ঘষিতে লাগিল।' (যৌগিক ক্রিয়া), 'মুখে মৃদু হাসি' (অসমাপিকা ক্রিয়া), ইত্যাদি।

"অজান্তে" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"অজান্তে" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্যের সংখ্যা			=	২৭ টি
বাক্যের আয়তন =	১)	হ্রস্ব	=	২৮ টি
	২)	দীর্ঘ	=	১ টি
		অনুপাত	=	২৮ : ১

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	=	২২৭ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	১৭ টি
	শতকরা হার	=	৮ %
২)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	১৯২ টি
	শতকরা হার	=	৮৫ %
৩)	ইংরেজি শব্দ	=	৩ টি
	শতকরা হার	=	১ %
৪)	আরবী-ফার্সী	=	১২ টি
	শতকরা হার	=	৫ %
৫)	ইতর শব্দ	=	৩ টি
	শতকরা হার	=	১ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। চলিত ভাষা রীতির ব্যবহার।
২। বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব।
৩। শব্দগত বিচ্যুতি (Word Deviation)।
৪। সন্ধি সমাসবদ্ধপদ যথাসম্ভব পরিহার।
৫। অনুগামী শব্দের ব্যবহার।
৬। ইতর শব্দের ব্যবহার।
৭। সম্বোধন পদের ব্যবহার।
৮। অধিবাক্যের (Surface Sentence) ব্যবহার।
৯। বিপ্রতীপতা সৃষ্টি।
১০। পদাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি।
১১। ক্রিয়াপদের রূপ ঃ সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক।
১২। বিরাম চিহ্নের ভাব অনুযায়ী ব্যবহার।
১৩। রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য।
১৪। বাক্য গঠন ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV),বিধেয়+উদ্দেশ্য+ক্রিয়া (OSV), ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

'অজান্তে' গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ-

বনফুল 'অজান্তে' গল্পের শরীর নির্মাণে ২৭টি বাক্য ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে ২৮টি হ্রস্ব বাক্য এবং একটি দীর্ঘ বাক্য।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ-বনফুল গল্পে তৎসম শব্দের তুলনায় তদ্ভব, দেশী, ইংরেজি, হিন্দি প্রভৃতি শব্দই বেশি ব্যবহার করেন। এগল্পেও তার নমুনা আছে। তবে এগল্পে হিন্দি শব্দের নমুনা নেই।

খ-১) তৎসম শব্দ— 'আরম্ভ', 'বৃষ্টি', 'অন্ধকার', 'অন্যমনস্ক', 'উপক্রম', 'সর্বাঙ্গ', 'অন্ধ' ইত্যাদি।
খ-২) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—'দাঁড়াতে', 'কাঁপছে', 'মার', 'বোবা' 'খুঁজে' 'বগলে', 'গলি', 'হঠাৎ', 'লাথি', 'কাতর', 'মুখ' ইত্যাদি।

খ-৩) ইংরেজি শব্দ—রাস্কেল, অফিস্ ইত্যাদি।

খ-৪) আরবী-ফার্সী—'অফিস', 'গোলমাল', 'বেচারি' 'মাপ' 'বোবা' ইত্যাদি।

খ-৫) ইতর শব্দ—'শুয়ার', 'বডিস্' ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-

গ-১) বনফুল তাঁর 'ছোট' আকৃতির বেশিরভাগ গল্পে চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। এগল্পেও বনফুল কথ্য চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে সে ভাষা মৌখিক ভাষার খুব কাছাকাছি। যেমন—

১। 'সেদিন অফিসে মাইনে পেয়েছি।'

২। 'এ-দোকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল।'

৩। 'বেচারি অনেক দিন থেকেই বলছে।'

৪। 'এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল।'

৫। 'মারলাম এক লাথি।'

৬। 'রাস্তা দেখে চলতে পার না শুয়ার।'

৭। 'রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি করে দিলে।' — ইত্যাদি।

গ-২) এগল্পে বনফুল এমন দু'-একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেছেন যার মধ্যে দিয়ে সংকীর্ণমনা মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী মানুষদের রিরংসার মানসিকতা ফুটে উঠেছে। যেমন—

১। 'বাড়ি ফেরার পথে ভাবলাম 'ওর' জন্য একটা 'বডিস্' নিয়ে যাই।'

২। 'রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি করে দিলে।'

গ-৩) শব্দের বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ যে শুধু লেখকের মানসিকতাকে বুঝতে সাহায্য করে তা নয়, তা যুগ প্রবণতারও দ্যোতক হয়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীর বিশ্বযুদ্ধোত্তর অবক্ষয়িত মূল্যবোধের পরিচায়ক হিসেবে পরিগণিত হতে পারে এই শব্দগুলো। আবার এই শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation) থেকে লেখকের স্বাতন্ত্র্যও চিহ্নিত হয়, এক লেখক অন্য লেখক থেকে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন এ গল্পের— 'শুয়ার', 'রাস্কেল', 'বডিস্' শব্দগুলি বনফুলের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করেছে।

গ-৪) বনফুল গল্পে যতটা সম্ভব সন্ধি-সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার এড়িয়ে চলতেন। সহজ সরল কথ্য ভাষায় গল্পের ভাষাশরীর নির্মাণ করতেন। গোটা 'অজান্তে' গল্পে একটি মাত্র সন্ধিবদ্ধ পদ ব্যবহার করেছেন বনফুল। যেমন—'সর্বাঙ্গ'।

গ-৫) বনফুলের প্রায় সব গল্পেই অনুকার শব্দ, অনুগামী শব্দ, ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এসব শব্দের ব্যবহারে পরিবেশ-পরিস্থিতি-অবস্থা আরো স্পষ্ট ও মূর্ত হয়ে ওঠে। এগল্পের দু'একটি অনুগামী শব্দের ব্যবহার করেছেন বনফুল। যেমন— 'মাখামাখি' 'গা-ময়' 'গোলমাল'

ইত্যাদি।

গ-৬) এছাড়া আছে দু'একটি ইতর শব্দের ব্যবহার। যেমন— 'শুয়ার', 'রাস্কেল'।

গ-৭) এগল্পে সম্বোধন পদের যে ব্যবহার বনফুল করেছেন তাও পাত্র-পাত্রীর মানসিক পরিস্থিতি ও অবস্থা ব্যাখ্যায় যথাযথ হয়েছে। 'ও' 'ওর' 'বেচারি' 'বেচারা' এই সম্বন্ধসূচক পদগুলি এগল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—গল্পের নায়কের কাছে তার স্ত্রী 'বডিস্' কেনার জন্য বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও যে তা সে পায় নি, তা বোঝানোর জন্য 'বেচারি', আবার অসহায় ভিখারির অবস্থা বোঝাতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন 'বেচারা'।

গ-৮) বনফুলের গল্পে অধিবাক্যটি (Surface Sentence) সমগ্র গল্পের দেহ গঠনে বড় ভূমিকা পালন করে প্রায়ই। এগল্পেও তা উপস্থিত। এ গল্পের অধিবাক্যটি হল 'আনন্দ'। এই আনন্দের কারণ বুঝতে হলে পূর্বের ঘটনাক্রমকে বুঝতে হয়। এই আনন্দের কারণ, গল্পের নায়কের আজ মাইনে হয়েছে। স্ত্রীর বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত 'বডিস্' সে কিনে তাকে উপহার দিবে, তাতে উভয়ের আনন্দের ফোয়ারা ঝরবে।

গ-৯) বিপ্রতীপতা কোন কোন শিল্পীর বিশেষ লক্ষণরূপে বিবেচিত হতে পারে। বনফুলের গল্পের একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই বিপ্রতীপতা সৃষ্টি। সমান্তরলতার (Parallelism) ও বিপ্রতীপতার (Inversion) মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়েছে এগল্পে। মাইনে পেয়ে গল্পের নায়ক তার স্ত্রীর জন্য 'বডিস্' বা অন্তর্বাস কিনলেন। বাড়ি গিয়ে তাকে উপহার দেবেন। কিন্তু জামাটি কেনা হলেও বৃষ্টির জন্য তাকে থামতে হল। বৃষ্টি থামার পর গলির ভিতর দিয়ে চলতে শুরু করলেন, অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে 'এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল।' রাগের মাথায় লোকটিকে মারলেন এক লাথি, পরে জানলেন লোকটি এক অন্ধ বোবা ভিখারি।

গ-১০) এভাবে সমান্তরলতা ও বিপ্রতীপতার মধ্য দিয়ে গল্পের ভাব গঠনে বাক্যগুলির মধ্যে একটি পদাকাঙ্ক্ষা (Ellipsis) তৈরি হয়েছে।

গ-১১) বনফুল সরল বাক্য ও জটিল বাক্যের সমন্বয়ে, সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়ার সহযোগে, কখনও অনির্দেশক কর্তায়, কখনও বিবৃতিমূলক বাক্যে এগল্পের ভাষাশরীর নির্মাণ করেছেন। যেমন— 'সেদিন অফিসে মাইনে পেয়েছি।', 'বেচারি অনেক দিন থেকেই বলছে।,' 'লণ্ঠন হাতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি মশাই?, ' এ-দোকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল।', 'আমি উঠে দেখি লোকটা তখনও ওঠেনি, ওঠবার উপক্রম করছে', 'এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল', ইত্যাদি।

গ-১২) বনফুলের গল্পের ভাষাশৈলীর আর এক বৈশিষ্ট্য ছেদ-যতি চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার। এগল্পেও তার পরিচয় আছে। কমা (,), পূর্ণচ্ছেদ (।), ড্যাস (—), বিস্ময়বোধক চিহ্ন (!), প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?), বিসর্গ চিহ্নের (ঃ) ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে গল্পের ভাব পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। যেমন— 'অনেকদিন পরে আজ নতুন জামা পরে তার মনে কি আনন্দই না হবে।'

'আজ আমি—', 'কে—ও? ওঃ, থাক মশাই, মাপ করুন, ওকে আর মারবেন না।'— ইত্যাদি।

বনফুলের গল্পে রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। যেমন— অভিশ্রুতি (এসে, জ্বলে) ও স্বরসঙ্গতির (মাইনে, ফেরবার) ব্যবহার, অল্পপ্রাণ ধ্বনির ব্যবহার, অতীতকালের প্রথম পুরুষে অকর্মক এবং সকর্মক দুটি ক্রিয়াপদেই 'ল' বা 'লে' – এর ব্যবহার ('মারের চোটে সে আবার পড়ে গেল, কিন্তু কোন জবাব করলে না।'), বহুবচনে 'দের' —এর ব্যবহার, 'লুম' 'লাম' যোগ করে উত্তম পুরুষের পদ গঠন (মারলাম একলাথি), অধিকরণ কারকে 'তে' 'য়' (কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে) বিভক্তি প্রভৃতি।

চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ও শব্দ ব্যবহার এগল্পে যথাযথ হয়েছে, যা বনফুলের বিশেষ দক্ষতার পরিচয়বাহক।

ছোটলোক' গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

'ছোটলোক' গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্যের সংখ্যা				=	৪৬ টি
বাক্যের আয়তন	=	১)	হ্রস্ব	=	৪২ টি
		২)	দীর্ঘ	=	৪ টি
			অনুপাত	=	৪২ : ৪

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	=	৩২৪ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	৬২ টি
	শতকরা হার	=	২০ %
২)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	২৫১ টি
	শতকরা হার	=	৭৭ %
৩)	বিদেশী শব্দ	=	১১ টি
	শতকরা হার	=	৩ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাধু ও চলিত উভয় প্রকার ভাষারীতি গ্রহণ।

২। সরল বাক্যের ব্যবহার, অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা দীর্ঘ জটিল বাক্য সৃষ্টি।

৩। নির্দেশক বিশেষ্যর ব্যবহার।

৪। প্রত্যয়ের ব্যবহার।

৫। অনুগামী শব্দের ব্যবহার।

৬। অবস্থান বাচক নির্দেশক বিশেষ্যের ব্যবহার।

৭। উত্তম পুরুষের প্রয়োগ।

৮। 'টা' বিভক্তির ব্যবহার।

৯। বাক্যান্বয় সৃষ্টি।

১০। মুখ্য কর্মের ব্যবহার। গৌণ কর্মেরও ব্যবহার।

১১। শ্লেষ ও তির্যকতা।

১২। বিপ্রতীপতা।

১৩। বাগ্‌ধারা।

১৪। বাক্য নির্মিতি ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV), বিধেয়+উদ্দেশ্য+ক্রিয়া (OSV), ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

১৫। ক্রিয়ার রূপ ঃ সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক।

'ছোটলোক' গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ

বনফুল এ গল্পে ৪৬টি বাক্য ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে ৪২টি হ্রস্ব বাক্য এবং ৪টি দীর্ঘ বাক্য রয়েছে।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ

বনফুল এগল্পে যেসব শব্দ ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নরূপ—

১) তৎসম শব্দ---উন্নতমস্তক' 'দ্বিপ্রহর' 'নিদারুন' 'রৌদ্র' 'উপেক্ষা' 'কন্টকসঙ্কুল' 'শরশয্যাশায়ী' 'স্কন্ধারূঢ়' ইত্যাদি।

২) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—'খদ্দর' 'মাথা' 'ছাতা' 'পা' 'জুতা' 'হাঁটা' 'কাঁধ' 'বাঁক' ইত্যাদি।

৩) বিদেশী শব্দ—'রিক্‌শা' 'বল্‌শেভিজম্' 'ডিভিশন্ অব্ লেবার' 'ফ্যাক্টরি'। ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ

গ-১) বনফুলের তাঁর 'ছোট' আকৃতির গল্পগুলিতে বেশির ভাগ চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন, কোন কোন গল্প (সার্থকতা, বুধনী) আবার পুরোটাই সাধু ভাষায় লেখা। আবার কোন কোন গল্প সাধু ও চলিত — উভয় রীতি অনুসৃত হয়েছে। 'ছোটলোক' গল্পে বনফুল বর্ণনা অংশে সাধু ভাষা

রীতি অবলম্বন করেছেন এবং প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষারীতি অবলম্বন করেছেন। তবে অন্যান্য **'ছোট'** আকৃতির গল্পের তুলনায় এগল্পটিতে সাধুভাষারীতি কিছুটা সংস্কৃতগন্ধী। যদিও সেটা চরিত্র অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা রাঘব সরকার যে গোত্রের তার স্বরূপ উন্মোচনে এভাষা যথাযথ নির্বাচন হয়েছে। যেমন— রাঘব সরকারের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন— "তিনি কখনও যাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। স্বকীয় মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।" প্রত্যক্ষ উক্তি বিনিময়ে ব্যবহৃত চলিত ভাষার নমুনা — "ওই শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক' পয়সা নিবি? ছ' পয়সা।" ইত্যাদি।

গ-২) বনফুলের ছোটগল্পে ছোট্ ছোট সরল বাক্য নির্মাণের প্রতি ঝোঁক বেশি দেখা যায়। তাছাড়া ক্রিয়াহীন বাক্য নির্মাণেও বনফুলের প্রবণতা একটু বেশি। কারণ তাতে কাহিনীর ক্ষিপ্রতা আসে। তবে ছোট ছোট বাক্য নির্মাণের পাশাপাশি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ জটিল বাক্য নির্মাণও বনফুল করেন মাঝে মধ্যে। আবার দীর্ঘ বাক্য যেহেতু কাহিনীতে শ্লথতা নিয়ে আসে, সেহেতু দু'একটি দীর্ঘ বাক্যের পর আবার হ্রস্ব বাক্য যোগ করে কাহিনীর মধ্যে একটা গতি সঞ্চারের প্রবণতা বনফুলের মধ্যে দেখা যায়। এগল্পেও ভাষারীতির এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১। 'উন্নত মস্তক রাঘব সরকার দ্বিপ্রহরে নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতে ছিলেন।'

২। 'ওই শিবতলা পর্যন্ত যেতে ক' পয়সা নিবি?'

৩। 'আমি রিকশা চড়ি না।'

৪। 'তুই আয় না।'

৫। 'ছ' পয়সা।'

৬। 'তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না।'

গ-৩) নির্দেশক বিশেষ্য হিসেবে 'ওই' এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন— 'ওই শিবতলা পর্যন্ত ক' পয়সা নিবি?'

গ-৪) 'ওয়ালা' প্রত্যয় যোগে শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন— রিক্শা + ওয়ালা = 'রিক্শাওয়ালা'।

গ-৫) ভাষার কথ্যভঙ্গি সৃষ্টির একটি অন্যতম পদ্ধতি হ'ল ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুগামী শব্দ, অনুকার শব্দের ব্যবহার করা। এগল্পে দুটি অনুগামী আছে। যেমন— 'ঠুনঠুন', 'পিছুপিছু'।

গ-৬) অবস্থান বাচক নির্দেশক বিশেষ্য পদ রূপে রিকশাওয়ালাকে রাঘব সরকার 'তুই'-এর ব্যবহার। যেমন— 'তুই আয় না'।

গ-৭) কর্তা রূপে উত্তম পুরুষে 'আমি'র ব্যবহার। যেমন— 'আমি রিক্সা চড়ি না', 'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না'।

গ-৮) 'টা' বিভক্তি যোগে নির্দেশক বিশেষ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় এ গল্পে। যেমন— রিক্শাওয়ালাটা।

গ-৯) অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে বাক্যান্বয় সৃষ্টি বনফুলের ভাষারীতির আরেক বৈশিষ্ট্য, যা এগল্পেও দেখা যায়। যেমন —

১। 'আচ্ছা আয়।'

২। 'রাঘব সরকার চলিতে লাগিলেন'।

৩। 'আসুন, বাবু, চড়ুন।'

৪। 'রিক্শাওয়ালা পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল।' ইত্যাদি।

গ-১০) বাক্যে কখনো মুখ্য কর্ম, কখনো গৌণকর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। যে বাক্যে কোন 'মেসেজ' দিতে চান সেখানে মুখ্য কর্মের ব্যবহার করেছেন বনফুল। যেমন— 'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।'

গ-১১) বনফুলের গল্পে শ্লেষ আর তির্যকতা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হিসেবে লক্ষিত। এর পাশাপাশি থাকে রাড়াবাড়ির প্রতি ব্যঙ্গের খোঁচা। এগল্পের রিকশাওয়ালার বিদ্রূপশাণিত কথার ('আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না') মধ্যে সদা উন্নত মস্তক রাঘব সরকারের আইডিয়ালিজমকে মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।

গ-১২) বিপ্রতীপতা বনফুলের গল্পের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ যা এগল্পেও উপস্থিত। রাঘব সরকার তার আদর্শ নিয়ে (রিকশা চড়া পাপ) রিক্শাওয়ালাটিকে ভেবেছিল হয়তো সে পেটের ক্ষুধার তাড়নায় পয়সাটি নিয়ে নেবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দেখা গেল রাঘব সরকারের চাইতে আত্মসম্মানবোধ রিক্শাওয়ালাটিরও কম নেই। তার সদম্ভ পয়সা প্রত্যাখ্যানে সেই বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে।

গ-১৩) প্রত্যেক ভাষাতেই এমন কিছু বাক্যাংশ বা শব্দগুচ্ছ থাকে যা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করা হয়। এদের Idiom বা বাগ্‌ধারা বলা হয়। এই বাগ্‌ধারা ভাষার ভাববহনতা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। বনফুলের গল্পেও এমন প্রচুর বাগধারা, প্রবাদপ্রবচনের নিদর্শন পাই, যা গল্পের চরিত্রের মানসিকতা প্রকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এগল্পের এমন একটি বাগ্‌ধারা হ'ল — 'কারও কাছ থেকে ভিক্ষে না নেওয়া'। যদিও বনফুল বাক্যটিকে নিজের মত করে বলেছেন।

গ-১৪) বনফুল এই গল্পে বিবিধ প্রকার বাক্য গঠন করেছেন, যেমন—'রাঘব একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল' (SOV), 'ঠুন্‌ঠুন্ করিয়া ঘন্টা বাজাইয়া রিক্শাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে লাগিল।' (OSV), ইত্যাদি।

গ-১৫) বনফুল এই গল্পে সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।', 'রিক্শাওয়ালা পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল।' 'রাঘব

সরকার চলিতে লাগিলেন'। ইত্যাদি।

এইভাবে বনফুল চরিত্র, চরিত্রের মানসিকতা, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করে একটি অতুলনীয় গল্প করে তুলেছেন 'ছোটলোক' গল্পটিকে।

এবারে **'মাঝারি'** আকৃতির গল্পের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই শ্রেণীর গল্পে বনফুলের ভাষাশৈলী ব্যবহারের প্রবণতাটি অনুধাবনের পথে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে—

'দুধের দাম' গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"দুধের দাম" গল্পটির ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

	মোট বাক্যের সংখ্যা		=	১২৯ টি
বাক্যের আয়তন =	১)	দীর্ঘ	=	২৫ টি
	২)	হ্রস্ব	=	১০৪ টি
		অনুপাত	=	২৫ : ১০৪

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	=	১০৬৯ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	১৫৫ টি
	শতকরা হার	=	১৫ %
২)	অর্ধ-তৎসম শব্দ	=	৭ টি
	শতকরা হার	=	০.৬৫ %
৩)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	৭৯০ টি
	শতকরা হার	=	৭৪ %
৪)	ইংরেজি শব্দ	=	৬০ টি
	শতকরা হার	=	৬ %
৫)	হিন্দি শব্দ	=	৫৭ টি
	শতকরা হার	=	৬ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

২। বাক্য গঠন ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SVO), বিধেয়+উদ্দেশ্য+ক্রিয়া (OSV), বিধেয়+ক্রিয়া (OV), ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৩। বহুভাষিকতা।

৪। বিপ্রতীপতা।

৫। সরল বাক্যের ব্যবহার, অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা দীর্ঘ জটিল বাক্য ব্যবহার।

৬। প্রতিনির্দেশকের ব্যবহার।

৭। অধিবাক্যের ব্যবহার।

৮। সিদ্ধান্ত অংশ ও হেতু অংশের বাক্য সৃষ্টি।

৯। তির্যকতা।

১০। উপমা প্রয়োগ।

১১। বাগ্‌ধারা ব্যবহার।

১২। ব্যঙ্গ প্রবণতা।

১৩। ধ্বন্যাত্মক, অনুকার ও অনুগামী শব্দের ব্যবহার।

১৪। প্যারডিবক্র ভাষারীতি ব্যবহার।

১৫। ভাষামুদ্রা সৃষ্টি।

১৬। স্থান-কালের ছাপ।

১৭। হিন্দি ভাষায় ব্যাকরণ অনুযায়ী উচ্চারণে নাসিক্য ধ্বনির প্রাধান্য। ইত্যাদি।

'দুধের দাম' গল্পের ভাষাশৈলীর পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ-

বনফুল এ গল্পে ১২৯টি বাক্য ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে দীর্ঘ বাক্য আছে ২৫টি এবং হ্রস্ব বাক্য ১০৪টি।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—

বনফুল এ গল্পে যে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল-

—

খ-১) তৎসম শব্দ —সুতন্বী, অর্ধনগ্না, হাস্যমুখী, সুরূপা, বৃদ্ধা, জ্ঞাতসারে, বিকশিত, শিক্ষিত, সংগ্রহ, পদাঘাত, বিজ্ঞ, সমীচীন, মন্তব্য,স্থান, যথারীতি, কর্ণকুহরে ইত্যাদি ।

খ-২) অর্ধ-তৎসম শব্দ — বুড়ি, বড্ড, পাচ্ছি, ইত্যাদি।

খ-৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত) — ছোক্‌রা, ভিড়, ছিঁড়ে, কাঁদিয়া, দাঁড়াইল, চঞ্চল, লঙ্কা, ইত্যাদি ।

খ-৪) ইংরেজি শব্দ— ট্রেন, স্টেশন, শিভ্যাল্‌রি, ইন্টার ক্লাশ, হোলড্-অলের স্ট্র্যাপ, প্যাসেঞ্জার, টিকিট, সুটকেশ, ওয়েটিং রুম, হেল্পলেস ইত্যাদি।

খ-৫) হিন্দি শব্দ— হটো, দরোয়াজেসে, আপ, কাঁহা, জায়েগা, চলিয়ে, হাম, আপকো, লে, থোড়া, দেঙ্গে, কিরপা, বৈঠিয়ে, মাইজি ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ—

গ-১) 'দুধের দাম' গল্পে বনফুল সাধু ও চলিত —উভয় ভাষারীতির প্রয়োগ করেছেন। বর্ণনা অংশে সাধু গদ্যরীতি আর প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত গদ্যরীতি। তবে সাধু গদ্যরীতিতে —

সংস্কৃতগন্ধী তৎসম শব্দের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায় না। শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে মূলত এ রীতি অনুসৃত হয়েছে। আর চলিত ভাষা প্রয়োগে কথ্যভঙ্গি অনুসরণ করা হয়েছে। এতে ভাষা মুখের ভাষা হয়ে উঠেছে। যেমন—

বর্ণনা অংশের সাধু ভাষারীতির নমুনা ঃ ১। 'বুড়ির ডান পা-টা বেশ মচকাইয়া গিয়াছিল।'

২। 'তাঁহাকে একটা স্থান সংগ্রহ করিতেই হইবে।'

৩। 'সিগারেটে টান দিতে দিতে তিনিও নামিয়া গেলেন।' ইত্যাদি।

প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষারীতির নমুনা ঃ ১। 'পথ দেখে চলতে পার না? আর একটু হলে আমার ষ্ট্রাপটা ছিঁড়ে যেত যে!'

২। 'পায়ে লেগেছে বড্ড বাবা, নামতে পাচ্ছি না।'

৩। 'ভিখারী মাগীর অস্পর্ধা দেখেছেন? যাচ্ছে তো উইদাউট টিকিটে, তার উপর আবার—'

৪। 'এই সব হেল্পলেস বুড়িকে রাস্তায় একা ছেড়ে দিয়েছে, এর স্বামী ছেলে নেই না কি, আশ্চর্য কাণ্ড!'

৫। 'সত্যি, ভিখারীতে ভরে গেল দেশটা। স্বাধীনতার পর ভিখারীর সংখ্যা আরও বেড়েছে। সবাই আবার মুখফুটে চাইতেও পারেনা।'

৬। 'আমি ভিখিরী নই বাবা, আমি আপনাদের মত একজন প্যাসেঞ্জার।'

৭। 'আমার সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট আছে।'

৮। 'আরে, এ আবার কোত্থেকে এসে জুটল এখানে?'

৯। 'দয়াময়ি, পথ ছাড়ুন। দরজার কাছে বসে কেন!'

১০। 'তোমরা বর্বরই বাছা। তোমাদের শিভ্যালরি অবশ্য আছে, কিন্তু তার প্রকাশ কেবল যুবতী মেয়েদের বেলা।'

১১। 'আমি নামতে পাচ্ছি না বাবা, পায়ে চোট লেগেছে—'

ইত্যাদি।

গ-২) এগল্পের বাক্যগুলি উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া, বিধেয়+উদ্দেশ্য+ক্রিয়া, বিধেয়+ক্রিয়া ইত্যাদি রূপে গঠিত। যেমন—

১। 'তিনি বৃদ্ধাকে ভিখারিণীই মনে করিয়াছিলেন।'

২। 'বুড়ির এই করুণ অনুরোধ সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল।'

৩। 'ভিখারী মাগীর অস্পর্ধা দেখেছেন?'

৪। 'এক মারোয়াড়ি যাত্রী বৃদ্ধার গায়ে প্রায় পদাঘাত করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন।'

৫। 'তিনি বুড়িকে স-ধমক উপদেশ দিলেন একটা।' ইত্যাদি।

গ-৩) বহুভাষিকতা বনফুলের একটি বিশিষ্ট ভাষাশৈলী। গল্পের প্রয়োজনে তিনি হিন্দি, ইংরেজি ভাষাও ব্যবহার করেন। এগল্পেও করেছেন মারোয়াড়ি যাত্রী, কুলি, ও অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের কথাবার্তায়।

যেমন—১। 'এই বুড়ি, হটো দরোয়াজাসে—'

৪। 'চলিয়ে, হাম আপকো লে যাতে হেঁ।'

৫। 'আপ হিঁয়া পর বৈঠিয়ে, মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জারকা থোড়া দেরি হ্যায়। হাম ঠিক টাইম পর আকে আপকো ট্রেনমে চড়া দেঙ্গে।'

৬। 'পয়সা উঠা লেও। তুমহী কো দিয়া।'

৭। 'চলিয়ে মাইজি গয়া-প্যাসেঞ্জার আ গিয়া।'

অবশ্য গল্পের শেষে কুলি ও বৃদ্ধার কথোপকথনটি হিন্দি হলেও সারমর্ম বাংলাতে দেওয়া হয়েছে।

গ-৪) বৈপরীত্যের মাধ্যমে কাহিনীর ভাব পরিমণ্ডলে চমক সৃষ্টি করা বনফুলের গল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এগল্পেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। গল্পের প্রথমে সুবেশা, সুতন্বী, সুরূপা যুবতীর যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন তাদের পাশে বৃদ্ধার উপস্থিতি বৈপরীত্যের ভাব সৃষ্টি করেছে। এছাড়া হিন্দি ও বাংলা এই দ্বৈত ভাষার ব্যবহারে সেই বৈপরীত্য আরো বেশি প্রকট হয়েছে।

গ-৫) এগল্পে বনফুল বর্ণনামূলক বাক্য বেশি ব্যবহার করেছেন। গল্পটিতে সরল বাক্য যেমন

আছে, তেমনি অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে জটিল বাক্যের ব্যবহার এক ভিন্ন ধরনের ভাষাশৈলী হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ সরল বাক্য খর্বাকৃতি। অনেক সময় পরপর সরলবাক্যও ব্যবহার করেছেন। যেমন—

সরল বাক্য ঃ ১। 'বুড়ির ডান পা-টা মচ্‌কাইয়া গিয়াছিল।'

২। 'তাঁহাকে একটা স্থান সংগ্রহ করিতেই হইবে।'

জটিল বাক্য ঃ ১। 'গাড়িতে যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদের মধ্যে জন-দুই টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া আহারে মন দিয়াছিলেন, বুড়ির কথা তাঁহাদেরও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করা তাঁহারা সমীচীন মনে করিলেন না।'

২। 'বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে-নারীমূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।'

বনফুল শুধু বিবৃতিধর্মী বাক্যই নয়, প্রয়োজনে সব শ্রেণির বাক্যই ব্যবহার করেন। এগল্পে কুলিটি বৃদ্ধার পুত্রের মত কর্তব্য করায় তাকে আশীর্বাদ দিয়েছে এই বলে— 'দীর্ঘজীবী হও, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।' (প্রার্থনা সূচক বাক্য)

গ-৬) এগল্পে বাক্য-সম্পর্কসূচক নিত্যসম্বন্ধযুক্ত পদযুগ্ম বা প্রতি নির্দেশক (Correlatives) ব্যবহার করে জটিল বাক্য তৈরী করা হয়েছে। যেমন —

১। 'যে পায়ে স্ট্যাপটা আটকাইয়া গিয়াছিল সেই পা-টা বেশ ব্যথা করিতে লাগিল।'

২। 'বৃদ্ধা যে স্টেশনে নামিবেন, সে স্টেশন একটু পরেই আসিয়া পড়িল।'

৩। 'যে বলিষ্ঠ কুলিটা মাল মাথায় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়াছিল, সে বাহিরে যাইবার জন্য দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।'

৪। 'বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে-নারীমূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।'

গ-৭) এগল্পে একটি অধিবাক্যও (Surface Sentence) ব্যবহৃত হয়েছে। সেটি হল- 'অসম্ভব'। এই অধিবাক্যটি অনুধাবন করতে হলে পূর্বের বাক্যগুলির সাহায্য নিতে হয়।

গ-৮) বনফুল এগল্পে কিছু এমন বাক্য সৃষ্টি করেছেন, যাদের দু'টি অংশ — একটি সিদ্ধান্ত অংশ, অন্যটি হেতু অংশ। যেমন—

১। 'করিবার কথাও নয়, বিদেশাগত শিভ্যাল্‌রি জিনিসটা, যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়।'

২। 'অসুবিধা তেমন কিছুই হইল না, কারণ বৃদ্ধা ছোটখাটো আকারের মানুষ গুটিশুটি হইয়া বসিয়াছিলেন।'

গ-৯) তির্যকতা সৃষ্টি বনফুলের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই তির্যকতা কখনো কখনো কোন বিশেষ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। এগল্পে 'ছোকরা' শব্দটির মধ্য দিয়ে সেই তির্যকতা প্রকাশ

করেছেন। যেমন—

১। 'তাঁহাদেরই আশেপাশে কয়েকজন বাঙালি ছোকরাও, কেহ অন্যমনস্কভাবে, কেহবা জ্ঞাতসারে ঘোরাফেরা করিতেছিল।'

২। 'ছোকরা' ভিড়ে অন্তর্ধান করিল, আর ফিরিল না।'

৩। 'কুলীর পিছনে চপ্পল পায়ে নীল-চশমা-পরা লক্কা গোছের এক ছোকরা।'

গ-১০) উপমার ব্যবহার গল্পের ভাব বিস্তারে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এগল্পেও বনফুল একটি উপমা ব্যবহার করেছেন। যেমন—'বলিষ্ঠ বয়স্ক ব্যক্তি যেমন করিয়া ছোট শিশুকে দুই হাতে করিয়া বুকের উপর তুলিয়া লয়, কুলিটি সেইভাবে বৃদ্ধাকে বুকে তুলিয়া লইল।'

এই উপমাটি একটু অন্যরকমভাবে আর একবার ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—'তাহার বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা পুনরায় বৃদ্ধাকে শিশুর মত বুকে তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।'

গ-১১) বাগ্‌ধারা, প্রবচনের ব্যবহারও গল্পের তাৎপর্য বিষয়ান্তরে উন্নীত করে। এগল্পে প্রবচনের প্রসঙ্গে এসেছে মনুর কথা— 'নার্য্যস্ত যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা'। এছাড়া আছে একটি Idiom বা বাগ্‌ধারা - 'শক্তির জয় সর্বত্র।' যা গল্পের ভাব পরিমণ্ডলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গ-১২) বনফুল যেখানেই বাড়াবাড়ি কিছু দেখতেন, সেখানেই ব্যঙ্গের কশাঘাতে তাকে জর্জরিত করতেন। এগল্পেও উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতী ও আত্মভিমানী বাঙালি সন্তানদের প্রতি কটাক্ষবাণ নিক্ষেপ করেছেন। যেমন—

১। 'বইটির মলাটের উপর অর্ধনগ্না হাস্যমুখী যে নারী মূর্তিটি ছিল, বৃদ্ধার মনে হইল, সেটি যেন তাহার দিকে চাহিয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে।'

২। 'ভিড়ের মধ্যে এক বৃদ্ধা যে একজনের হোলড্ অলের স্ট্র্যাপে পা আটকাইয়া পড়িয়া গেলেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না। করিবার কথাও নয়, বিদেশগত শিভাল্‌রি জিনিসটা যুবতীদের কেন্দ্র করিয়াই বিকশিত হয়।'

৩। 'শ্বেতবর্ণ সাহেব সম্ভবত এই সাহেবি পোশাক পরা কৃষ্ণচর্ম বঙ্গসুন্দরকে বর্বর বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন।'

৪। 'তখন রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করিলেন। চাকুরির অনুরোধে কিছুদিন পূর্বেই রাষ্ট্রভাষায় পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন।'

৫। 'যে দুইটি ইজিচেয়ার ছিল, সে দুইটিতেই সাহেবি পোশাক-পরা দুইজন বঙ্গসন্তান হাতলের উপর পা তুলিয়া দিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া ছিলেন।'

গ-১৩) এগল্পে কথ্যভঙ্গিকে আনবার জন্য বনফুল ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ, অনুগামী শব্দেরও ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'হুড়মুড়', 'খোঁড়াইয়া-খোঁড়াইয়া', 'গুটিশুটি', 'হাঁ-হাঁ', 'ভিখিরী-টিকিরী', 'ধমক-ধামক' 'ঘ্যাঁস্‌টাইয়া'।

গ-১৪) এছাড়া এগল্পে বনফুল প্যারডিবক্র ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন। যাতে বনফুলের ব্যঙ্গের

ঝাঁঝালো আস্বাদ পাওয়া যায়। যেমন— 'বঙ্গ সুন্দর', 'বঙ্গ সন্তান' ব্যবহার করেছেন। এটি বনফুলের একটি নিজস্ব ভাষাশৈলী যাতে বনফুলের লেখনী ভঙ্গি খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়।

গ-১৪) পরিবেশ -পরিস্থিতি, চরিত্র, মানসিকতা, অনুযায়ী শব্দের পরিবেশন গল্পের আবহসৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এগল্পে বনফুলের 'ভাষামুদ্রার' (Register) নমুনা আছে। যেমন— রেল সংক্রান্ত অনেক শব্দ এগল্পে বনফুল ব্যবহার করেছেন। শব্দগুলি হল— স্টেশন, ট্রেন, ইন্টারক্লাস, প্লাটফর্ম, ট্রেনের কামরা, প্যাসেঞ্জার, সেকেণ্ডক্লাস, ফার্স্টক্লাস, ওয়েটিং রুম, কুলি, গয়া-প্যাসেঞ্জার, উইদাউট টিকিট।

গ-১৬) ভাষা ব্যবহার শুধুমাত্র লেখকের বিশিষ্টতাকেই চিহ্নিত করে না, স্থান-কালের ছাপও তা থেকে পাওয়া যায়। এগল্পে শুধু বনফুলের ভাষাশৈলীর বিশিষ্টতাকেই ফুটে ওঠে নি, সেই সঙ্গে গল্পের প্রেক্ষাপট যে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের উন্নাসিকতার, তার চিত্রও ফুটে উঠেছে এবং গল্পটি যে বিহারের কোন এক স্টেশনের ঘটনা অবলম্বনে রচিত তাও স্পষ্ট।

গ-১৭) বনফুল তাঁর এ গল্পে হিন্দি ভাষার ব্যাকরণ অনুযায়ী উচ্চারণে নাসিক্যধ্বনি ব্যবহার করতেও ভোলেন নি। যেমন—

১। 'আপ কাঁহা জায়েগা—'

২। 'চলিয়ে, হাম আপকো লে যাতে হেঁ।'

৩। 'আপ হিঁয়া পর বৈঠিয়ে, মাইজি, গয়া প্যাসেঞ্জারকা থোড়া দেরি হ্যায়। হাম ঠিক টাইম পর আকে আপকো ট্রেনমে চড়া দেঙ্গে।' ইত্যাদি।

"শ্রীধরের উত্তরাধিকারী" গল্পের ভাষাশৈলী বিচার ঃ

"শ্রীধরের উত্তরাধিকারী" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্যের সংখ্যা			=	১৬৭ টি
বাক্যের আয়তন =	১)	দীর্ঘ	=	২১ টি
	২)	হ্রস্ব	=	১৪৬ টি
		অনুপাত	=	২১ : ১৪৬

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

মোট শব্দ সংখ্যা = ১৪৫৪ টি

১)	তৎসম শব্দ	=	২৪১ টি
	শতকরা হার	=	১৭ %
২)	অর্ধ্ব-তৎসম শব্দ	=	১ টি
	শতকরা হার	=	০.০৬৮ %
৩)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	১২০৪ টি
	শতকরা হার	=	৮৩ %
৪)	ইংরেজি শব্দ	=	৬ টি
	শতকরা হার	=	০.৪১ %
৫)	আরবী-ফার্সী	=	৩ টি
	শতকরা হার	=	০.২০ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাধু ও চলিত ভাষারীতি অনুসরণ।

২। বাক্য নির্মিতি ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV), বিধেয় + ক্রিয়া + উদ্দেশ্য (OVS), বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV),ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৩। ছোট ছোট সরল বাক্য ব্যবহারের পাশাপাশি অসমাপিকা ক্রিয়া ও সংযোজক অব্যয় দ্বারা দীর্ঘ জটিল বাক্য তৈরি করা হয়েছে।

৪। বাক্যের মধ্যে বাক্য নিরপেক্ষ খণ্ড বাক্য (Parenthetic Clause)-এর ব্যবহার।

৫। বিপ্রতীপতা।

৬। নির্দেশক বিশেষিত বিশেষণের ব্যবহার।

৭। পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা।

৮। ধ্বন্যাত্মক, অনুগামী শব্দের ব্যবহার ।

৯। রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উপভাষার ব্যবহার।

১০। শব্দের দ্ব্যর্থকতা ও অনেকার্থে প্রয়োগ।

১১। ছেদ-যতির সুষম প্রয়োগ।

১২। বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার।

"শ্রীধরের উত্তরাধিকারী" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ

বনফুল এ গল্পের শরীর নির্মাণে ১৬৭টি বাক্য ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে হ্রস্ব বাক্য রয়েছে ১৪৬টি এবং দীর্ঘ বাক্য রয়েছে ২১টি ।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ

বনফুল এ গল্পে যে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল–

১) তৎসম শব্দ—স্থানীয়, আখ্যা, ব্যক্তি, অদ্ভুত,মহাত্মা, আহরণ, পশ্চাৎপদ,কৃপণ, শোষন, পটুতা, আত্মসাৎ, ভৃত্য, ক্ষুদ্র, মৃৎপ্রদীপ ইত্যাদি।

২) অর্ধ-তৎসম শব্দ—মিত্তির।

৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—গুড়, উপবাস, মক্ষিচুস, পুরাতন, সুদ, খরচ, পোশাক, রাত্রে, মাটি, শাঁসালো ইত্যাদি।

৪) ইংরেজি শব্দ—কোম্পানি, সিগারেট, হাই-হিল, লাইব্রেরি, ব্যাঙ্ক, ব্লাউজ।

৫) আরবী-ফার্সী—মতলব, উকিল, সেলাই।

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ

গ-১) বনফুল তাঁর ছোটগল্পে সাধু ও চলিত উভয় রীতির ভাষা ব্যবহার করেছেন। তবে কোথাও কোথাও শুধু সাধু ভাষা আবার কোথাও শুধু চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। আলোচ্য গল্পে বর্ণনা অংশে সাধু ভাষা রীতি এবং প্রত্যক্ষ উক্তিতে চলিত ভাষারীতি অবলম্বন করেছেন। তবে আমরা পূর্বেই বলেছি যে, বনফুলের সাধু ভাষারীতিতে তৎসম শব্দসঙ্কুল বাক্য তেমন নেই বললেই চলে। তাঁর সাধু ভাষারীতিতে প্রধানত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দীর্ঘরূপ ব্যবহারের প্রবণতা বা ঝোঁকই প্রবল। যেমন—

১। 'জলধরবাবু লোকটি কেবল যে উকিল তাহাই নহে স্বদেশ হিতৈষীও।'

২। 'সকাতরে শ্রীধর বললেন— আমি দরিদ্র মানুষ। এত বড় বৃহৎ ব্যাপারে, সাহায্য করা আমার সাধ্যে যে কুলোবে না জলধরবাবু !'

৩। 'তিলক কুড়িয়েই তো তাল। সবাই কিছু কিছু সাহায্য না করলে হবে কি করে!' ইত্যাদি।

গ-২) এগল্পে বাক্য নির্মিতে বনফুল উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV), বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV) এবং বিধেয় + ক্রিয়া + উদ্দেশ্য (OVS), ইত্যাদি রীতিকে অনুসরণ করেছেন ভাব ও প্রয়োজনানুযায়ী। যেমন—

১। 'জলধরবাবু বিশ্বাস করিলেন না'। (SOV)

২। 'স্থানীয় বেহারিগণ শ্রীধর মিত্রকে এই আখ্যাই দিয়াছিলেন।' (OSV)

৩। 'সেদিন গিয়াছিলেন জলধরবাবু।' (OVS) ইত্যাদি।

বনফুল সমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে ছোট ছোট সরল বাক্য যেমন তৈরী করেছেন, তেমনি অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ সরল বাক্য এবং সংযোজক অব্যয় দ্বারা দীর্ঘ ও জটিল বাক্যও তৈরী করেছেন। যেমন —

সরল বাক্য ঃ ১। 'শ্রীধরের তিন কুলে কেহ নাই।'

২। 'সেদিন গিয়েছিলেন জলধরবাবু।'

৩। 'জলধরবাবু কোনদিন গণেশের দিক দিয়া স্ত্রী-শিক্ষার কথা চিন্তা করেন নাই।' ইত্যাদি।

দীর্ঘ ও জটিল বাক্য ঃ ১। ' গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীর দল, খদ্দরধারী স্বদেশীর দল, হার্মোনিয়ামধারী বন্যা সাহায্যকারী দল, স্বাস্থ্যোন্নতি বিধায়িনী সভার সভ্যগণ, লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠাতাগণ, কন্যাদায়গ্রস্থ দুঃস্থ ব্রাহ্মণ —— সকলের আবেদনই শ্রীধর মিত্র ধৈর্য্য সহকারে শুনিয়া যাইতেন।'

২। 'তিলে তিলে, ক্ষণে ক্ষণে, দিনে দিনে, মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে, ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইয়া শ্রীধর মিত্রের ধনরাশি এমন একটা অঙ্কে গিয়া পৌঁছিল যে শেষকালে শ্রীধর মিত্রেরই চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইল।' ইত্যাদি।

৩। 'শ্রীধর মিত্রের দীর্ঘ জীবনের ইহাই বিশেষত্ব যে তিনি কখনো কাহাকেও এক কপর্দকও দান করেন নাই; কিন্তু বহু কপর্দক বহু লোকের নিকট হইতে বহুভাবে আত্মসাৎ করিয়াছেন।'

৪। 'শ্রীধর মিত্রের হৃদয় বিগলিত করিবার জন্যই সম্ভবত তিনি স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ওজস্বিনী একটি বক্তৃতা করিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ শ্রীধর মিত্র তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিলেন, খাল কেটে কুমীর ডেকে আনার দরকার কি?'

গ-৪) বাক্যের মধ্যে বাক্য নিরপেক্ষ খণ্ড বাক্যের ব্যবহার (Parenthetic Clause) বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন গল্পে তিনি তা ব্যবহার করেছেন। এগল্পেও তার কিছু নিদর্শন মেলে। যেমন —

১। 'টাকা সুতরাং জমিতেছিল। ব্যাঙ্কে নয় —— মাটির তলায়, ইহাই জনশ্রুতি।'

২। 'শ্রীধর থাকিতেন শহরের বাহিরে নিজেরই একটা শ্রীহীন পোড়ো বাড়িতে অর্থাৎ সেই বাড়িতে —— যাহার ভাড়া সহজে জুটিত না।'

গ-৫) বনফুল অন্যান্য বহু গল্পের মতো এগল্পেও বিপ্রতীপতা সৃষ্টি করেছেন। শ্রীধরের উত্তরাধিকারী যার হবার কথা, দেখা গেল শেষ পর্যন্ত সে হল না, হল অন্য জন।

গ-৬) বনফুলের গল্পের আর এক বিশেষত্ব হল—বিশেষিত বিশেষণের ব্যবহার। এর ফলে চরিত্রগুলির বা চরিত্রটির স্বধর্ম আপনা-আপনি পাঠক অনুধাবন করতে পারে। যেমন—— আলোচ্য

গল্পটি শুরু হয়েছে 'মক্ষিচুষ'—এই বিশেষিত বিশেষণ দিয়ে। এটি সূচক শব্দ (Key Word)-ও বটে। শ্রীধর যে মক্ষিচুষ, কেন মক্ষিচুষ, কিভাবে মক্ষিচুষে পরিণত হলেন তা ঘটনান্তরে বনফুল চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

গ-৭) চরিত্রের ব্যাখ্যা ও ঘটনা বিশ্লেষণে পৌরাণিক প্রসঙ্গের ব্যবহার বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যা এগল্পে লক্ষ্য করি শ্রীধর শঙ্কিত হওয়ার সময় পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণায় —— "সহসা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি রাবণের মৃত্যুকালীন উপদেশের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। অশুভস্য কাল হরণম।"

গ-৮) গল্পে অনুকার, অনুগামী, ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার চরিত্রের, ঘটনার, পরিবেশ-পরিস্থিতির আবহকে মূর্ত করে তোলে। এগল্পেও কিছু এধরনের শব্দ আছে। যেমন— 'পোশাক-পরিচ্ছদ', 'খচ্‌খচি', 'কাণ্ড-কারখানা'।

গ-৯) বনফুলের গল্পে রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উপভাষা ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যে পরিলক্ষিত হয় তা আমরা পূর্বেই বলেছি। এগল্পেও তার কিছু নমুনা আছে। যেমন— স্বরসঙ্গতি ঘটিত —— বিহারি > বেহারি, নকুড়> নোক্‌ড়ো। 'অ্যা' ধ্বনির ব্যবহার, যেমন —'ব্যাটাদের', স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষের ব্যবহার, যেমন——ব্লাউজ >বালাউস্ ইত্যাদি। এছাড়া আছে উপসর্গের ব্যবহার, যেমন— সকাতর, অ-উকিল ইত্যাদি।

নকুড় যে অল্প শিক্ষিত ব্যক্তি, তা তার শব্দ বিচ্যুতি থেকেই বোঝা যায়— ব্লাউজ> বালাউস্। চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহারে বনফুল দক্ষ। তার একটি ছোট্ট নিদর্শন এটি।

গ-১০) বনফুল তাঁর গল্পে দ্ব্যর্থকতা প্রকাশে সিদ্ধকাম পুরুষ। এগল্পেও তার পরিচয় আছে। গণেশের দিক দিয়ে স্ত্রী শিক্ষাকে যেভাবে শ্রীধর ওরফে বনফুল চিন্তা করেছেন, জলধরবাবুর মত আমরাও তা চিন্তা করতে পারি নি। বনফুলের গল্পে বুদ্ধির এই মার-প্যাঁচ আখ্যানে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি তা উপভোগ্যও বটে। **"শব্দের দ্ব্যর্থকতা এবং অনেকার্থ সংক্রান্ত আলোচনা আধুনিক শৈলী বিজ্ঞান চর্চায় তাৎপর্যপূর্ণ। উলম্যান লক্ষ্য করেছেন দ্ব্যর্থকতা শুধু Wit সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রয়োজনীয় নয়, বিশেষ ভাবনা বা তাৎপর্যের প্রকাশে, চরিত্রাঙ্কনে কিংবা আখ্যানের সামগ্রিক গঠনের স্বার্থে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।"**[৬]

গ-১১) ড্যাস্ (——), হাইফেন (-) সেমিকোলন (;) ডট্ ডট্ (....) প্রভৃতি যতি চিহ্নের সুপ্রয়োগ ভাষার আকর্ষণীয়তা ও বিশিষ্টতাকে তুলে ধরে। বনফুলের বিভিন্ন গল্পে এসবের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এগল্পের তার কিছু ব্যবহার গল্পের ভাব সঞ্চরণে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যেমন— ১। 'সুতরাং টাকা জমিতেছিল। ব্যাঙ্কে নয় —— মাটির তলায়, ইহাই জনশ্রুতি।' ২। 'জামাগুলোর কি নাম যে ভালো—মনেও থাকে না ছাই!' ৩। 'নকুড় বলিল—বালাউস্' ইত্যাদি।

গ-১২) গল্পে বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচণের ব্যবহার লেখকের ভাষাশৈলীগত নিপুণতার একটি বিশিষ্ট প্রয়োগ। বনফুল তাঁর প্রায় প্রতিটি গল্পে প্রচলিত বাগ্‌ধারা , প্রবাদ-প্রবচনকে ব্যবহার করেছেন

কাহিনীর ভাব-পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে, তবে সেগুলিকে কিছুটা কোথাও কোথাও পরিবর্তন করেছেন। আবার সেই প্রচলিত বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচন থেকে নিজেও কিছু বাগ্‌ধারাও প্রবাদ-প্রবচন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাঁর বুদ্ধি প্রধান মানসিকতাটিকে বুঝতে অসুবিধে হয় না। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল বেশ কিছু বাগ্‌ধারাও প্রবাদ-প্রবচণ ব্যবহার করেছেন তাঁর কাহিনী বিশ্লেষণে, বিস্তারে, রসসৃষ্টিতে। এতে বনফুলের বিশিষ্টতাও বিশেষভাবে চিহ্নিত। যেমন-

১। 'খাল কেটে কুমীর ডেকে আনবার দরকার কি?'

২। 'গণেশই তো উল্টে যাবে'

৩। 'ছেলেরা লেখাপড়া শিখেই গণেশকে কাত করেছে'

৪। 'কত ধানে কত চাল...'

৫। 'মাথার ঘাম পায়ে ফেলে...'

৬। 'ছাগকে দিয়ে যব মাড়িয়ে নেওয়া...'

৭। 'নয়-ছয়'

৮। 'তিল কুড়িয়েই তো তাল।'

বনফুল তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু অনুযায়ী যে ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন, চরিত্রানুযায়ী যে ভাষা বৈশিষ্ট্য চরিত্রগুলির মুখে বসিয়েছেন, প্রয়োজনে বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচনের গ্রহণ, বর্জন ও সংযোজন ঘটিয়েছেন তা তাঁর বিশিষ্টতাকেই তুলে ধরে।

"মুহূর্তের মহিমা" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

'মুহূর্তের মহিমা' গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যা।গত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্যের সংখ্যা			=	৯৮ টি
বাক্যের আয়তন	১)	দীর্ঘ	=	৫ টি
	২)	হ্রস্ব	=	৯৩ টি
	অনুপাত		=	৫ : ৯৩

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

মোট শব্দ সংখ্যা	=	৫৬৮ টি

১)	তৎসম শব্দ	=	৬৫ টি
	শতকরা হার	=	১২ %
২)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	৪৭৬ টি
	শতকরা হার	=	৮৪ %
৩)	ইংরেজি শব্দ	=	৮ টি
	শতকরা হার	=	১ %
৪)	আরবী-ফার্সী শব্দ	=	১৫ টি
	শতকরা হার	=	২ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাধু ও চলিত উভয় ভাষারীতি অনুসৃত।

২। বাক্য গঠন ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV), বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV), প্রভৃতি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৩। কর্তা ও ক্রিয়াহীন ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগ।

৪। লেখরীতির প্রয়োগ ।

৫। বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব।

৬। অনুগামী শব্দের ব্যবহার।

৭। উপমার প্রয়োগ।

৮। শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation)।

৯। ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার ।

"মুহূর্তের মহিমা" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ

বনফুল এ গল্পের শরীর নির্মাণে ৯৮টি বাক্য ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে হ্রস্ব বাক্য রয়েছে ৯৩টি এবং দীর্ঘ বাক্য রয়েছে ৫টি ।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ

বনফুল এ গল্পে যে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল—

১) তৎসম শব্দ—সম্মুখ, প্রসিদ্ধ, দ্রুত, হৃৎস্পন্দন, বর্তমান, বয়ঃক্রম, অভিনয়, চরিত্র, চক্ষু, তীক্ষ্ম, নিতান্ত, শিক্ষিত, শক্তিমান, দন্ত, অপত্নীক ইত্যাদি।

২) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—পঁচিশ, হাত, খাঁ, মুখে, দাড়ি, গোঁফ, চুল, রঙ, বাদামী, রোগা, ছোকরা ইত্যাদি।

৩) ইংরেজি শব্দ—ফ্রেঞ্চকাট, স্মো, এসেন্স, কেৎলি, রিভলবার, টেবিল, ড্রয়ার ইত্যাদি।

৪) আরবী-ফার্সী—আয়না, গুলি, জুলফি, খুন, রুমাল ইত্যাদি।

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ

গ-১) বনফুল অন্যান্য গল্পের মতো এই গল্পেও বর্ণনা অংশে সাধু ভাষারীতি এবং প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"হঠাৎ গুরগন ক্ষেপিয়া উঠিলেন।

অকস্মাৎ তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা রিভলবার বাহির করিয়া গোবিন্দলালী ভঙ্গিতে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—

শ্রীমতীকে তাঁহার চাই,

আজই চাই,

এখনই চাই,

তাহা না হইলে—এই রিভলবার।

তাঁহার খুন চাপিয়া গিয়াছিল।

শ্রীমতী হাস্যদীপ্ত চক্ষে গুরগনের পানে চাহিয়া রহিল।

তার পর সে ধীরে ধীরে বলিল, অত চেঁচাবেন না। আমি আপনাকে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। আমাকে যদি না পান, কি করবেন আপনি?

ভীম গর্জনে গুরগন কহিলেন, তিনুকে খুন করব।"—ইত্যাদি।

গ-২) বনফুল এগল্পে বাক্যের রূপ নির্মাণ করেছেন এভাবে— উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া যেমন— 'বর্তমান গুরগন খাঁর বয়ঃক্রম পঁচিশের উপর হইবে।' আবার বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV) ধরনের বাক্যও বনফুলের গল্পে লক্ষ্য করা যায়। যেমন—'শ্রীমতী নাম্নী যুবতীটির প্রতি গুরগন আকৃষ্ট হইয়াছেন।' ইত্যাদি।

গ-৩) বনফুল ছোট ছোট বাক্যে, একটি শব্দ দিয়ে একটি বাক্যের রূপ নির্মাণ করে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাহিনীকে নাটকীয় ভঙ্গিতে রূপ দিয়েছেন এগল্পে। তাতে কাহিনী যেমন গতিলাভ করেছে, তেমনি বর্ণিত চরিত্র বা বিষয় সম্পর্কে বিশেষ স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পেরেছেন। যেমন, এগল্পে গুরগন খাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে যে ভাষা স্টাইল ব্যবহার করেছেন বনফুল, তাতে গুরগন খাঁ চরিত্র সম্পর্কে পাঠকের লেখকের উদ্দিষ্ট শৈলীটি বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে। যেমন—

"বর্তমান গুরগন খাঁর বয়ঃক্রম পঁচিশের কিছু উপরে হইবে। (১)
মুখে সূচালো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। (২)
তদুপযুক্ত গোঁফ। (৩)
রঙ বাদামি। (৪)
চক্ষু তীক্ষ্ণ। (৫)
বুকময় চুল। (৬)
–ইহা নিতান্তই বাহ্যিক পরিচয়। (৭)
আসল পরিচয়, গুরগন শাঁসালো শক্তিমান, শিক্ষিত। (৮)
জমিদার। (৯)
অপত্নীক। (১০)
মাংসাশী।" (১১)

গ–৪) উক্ত অংশে বনফুল বাক্যগুলিকে এমনভাবে সাজিয়েছেন এবং শব্দবিন্যাস করেছেন যাতে একটি বিশেষ শৈলী ফুটে উঠেছে। কাটাকাটা বাক্যগুলি বা একটি শব্দ দিয়ে গড়া বাক্যগুলি যেন একটি দীর্ঘ বাক্যের নির্যাস। এগারো বাক্যের উদ্ধৃতাংশটিতে (১) নং বাক্য থেকে (২) নং বাক্য কিছুটা ছোট হতে (৩) নং বাক্য আরেকটু ছোট (৪) নং বাক্য আরেকটু ছোট, পাঁচ নং বাক্যে আরও ছোট করা হয়েছে। তারপর আবার (৬) নং বাক্য থেকে একটু বড়, (৭) নং বাক্য আরেকটু বড়, (৮) নং বাক্য আরেকটু বড় হয়েছে। (৯), (১০), (১১) নং বাক্য আবার ছোট করা হয়েছে। অংশটির বাক্য বিভাজনের মধ্য দিয়ে দৃশ্যময় করে তোলার চেষ্টা আছে। বাক্যগুলি বাঁ দিকের মার্জিনে সমান, এক রৈখিক (Linear)। কিন্তু ডানদিকে একরৈখিক বজায় রাখা হয়নি। বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে লেখরীতির (Graphological Context) মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন আকারে প্রতীয়মান হলেও পদাকাঙ্ক্ষার (Ellipsis) মাধ্যমে সংবদ্ধতা তৈরী হয়েছে। বাক্যগুলির জ্যামিতিক আকার দিলে হবে এরকম—

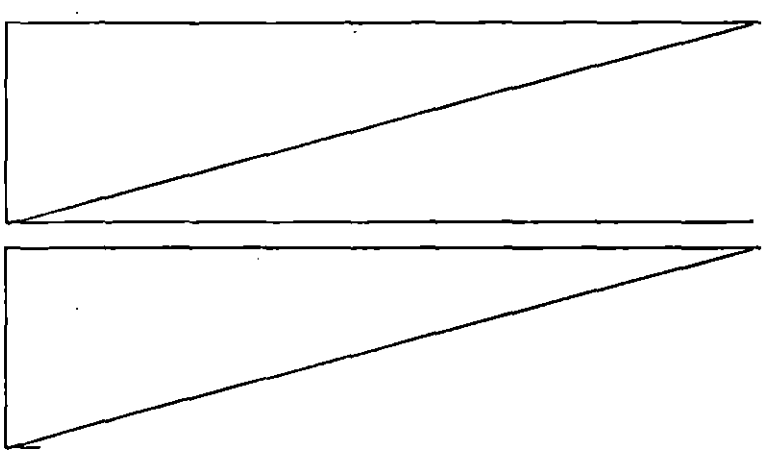

বাক্যগুলি উক্ত দু'রকম লেখরীতি গড়ে তুলেছে।

গ-৫) গল্পটির বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করেছেন বনফুল। যেমন—

১। 'স্নো ঘষিয়াছেন।'

২। 'অকস্মাৎ তিনি টেবিলের ড্রয়ার হইতে একটা রিভলবার বাহির করিয়া.....'

৩। 'ফরসা রুমালটাতে এসেন্স ঢালিতে ঢালিতে.....' ইত্যাদি।

গ-৬) বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও সমার্থক অনুগামী শব্দ বা পদগুচ্ছের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন— 'ধীরে ধীরে' 'ঢালিতে ঢালিতে' ইত্যাদি।

গ-৭) কথায় বলে 'উপমা কালিদাসস্য', কেননা উপমা প্রয়োগে কালিদাস অদ্বিতীয়। কবি জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন — 'উপমাই কবিত্ব।' একথাগুলিকে একটু অন্যরকমভাবে বলা যায়, 'উপমাই গল্পত্ব।' কারণ গল্পে উপমার প্রয়োগে ভাববস্তুর সৌন্দর্য ও তাৎপর্য বহুগুণ বেড়ে যায়। বনফুল তাঁর বেশির ভাগ গল্পে উপমা প্রয়োগ করেছেন। এগল্পের গুরগন খাঁর রাগের উপমা দিতে গিয়ে বলেছেন— 'যেন কেৎলিতে জল ফুটিতেছে।' এছাড়া আরেকটি উপমা হল 'গোবিন্দলালী ভঙ্গিতে'। বনফুলের উপমাগুলি সাধারণ ও স্বতঃস্ফূর্ত, সুন্দর ও অনিবর্চনীয়। তবে উপমাগুলি চরিত্রধর্ম, পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে একেবারে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গ-৮) শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation) অনেক সময় লেখককে বিশেষভাবে চেনায়। 'বিচ্যুতি' কোন হানিকর কিছু নয়, ভিন্ন অর্থে, বিশেষ অর্থে বিশেষ শব্দ ব্যবহার। যা বনফুলের গল্পে দেখা যায় এবং যা বনফুলের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করে। যেমন— ছেলে-র বদলে 'ছোক্‌রা' শব্দটি। এছাড়া অরেকটি শব্দ এগল্পে আছে। তা হল- 'বাঁদরটা'। এমন বহু শব্দের ব্যবহার বনফুল তাঁর গল্পে করেছেন। এই শব্দ ব্যবহার শুধু ব্যক্তি নয়, যুগের লক্ষণও চিহ্নিত করে। যেমন— ভারতচন্দ্রের কাব্য ভাষা, আধুনিক কবি-সাহিত্যিকদের বিশিষ্ট কাব্য ভাষা যুগ মানসিকতাকে তুলে ধরে। **"শব্দের জগৎকে আশ্রয় করে শব্দের সীমানাকে অতিক্রম করতে চান লেখক। কিন্তু শব্দের নির্বাচনে তাঁর উৎকণ্ঠাও কম নয়। একদিকে তাঁর সামনে থাকে কোন ভাষার শব্দের অফুরান ভাণ্ডার, অন্যদিকে শুদ্ধতা, যাথার্থ্য এবং স্বচ্ছতা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। স্বাধীন আর সংযমের অন্তর্লীন দ্বন্দ্বকেই"**[৭] রূপ দিতে সাহিত্যিকেরা বিশেষ বিশেষ শব্দভঙ্গি চয়ন করেন।

গ-৯) এগল্পে একটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেটি হ'ল— 'কড়ুমড়ু'।

বনফুলের চরিত্রানুযায়ী যথাযথ ভাষা ব্যবহারে গল্পটি রস সৃষ্টিতে সফল হয়েছে।

"তাজমহল" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"তাজমহল" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্যের সংখ্যা			=	১০৭ টি
বাক্যের আয়তন	১)	দীর্ঘ	=	১১ টি
	২)	হ্রস্ব	=	৯৬ টি
		অনুপাত	=	১১ : ৯৬

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	=	৭৫৭ টি
১)	তৎসম শব্দ	=	১০২ টি
	শতকরা হার	=	১৩ %
২)	তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)	=	৫৯২ টি
	শতকরা হার	=	৭৮ %
৩)	ইংরেজি শব্দ	=	১৬ টি
	শতকরা হার	=	২ %
৪)	আরবী-ফার্সী শব্দ	=	৪৭ টি
	শতকরা হার	=	৬ %

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। চলিত ভাষা রীতির ব্যবহার।

২। বাক্য গঠন ঃ উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV), কর্তা উহ্য, বিধেয় ও ক্রিয়া দিয়ে (OV) বাক্য তৈরী, বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৩। ছোট ছোট সরল বাক্যের ব্যবহার এবং একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা দীর্ঘ বাক্য তৈরী।

৪। উত্তম পুরুষে কথকের জবানীতে কাহিনী বর্ণিত কথকতার ভঙ্গিতে।

৫। গুলা, গুলো দিয়ে বহুবচনের পদ সৃষ্টি।

৬। 'ওয়ালা' প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন।

৭। বাক্য গঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব।

৮। বাক্য গঠনে আরবী-ফার্সী শব্দের প্রভাব।

৯। ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রয়োগ।

১০। শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation)।

১১। মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্মের ব্যবহার।

১২। অপহ্নুতি অলংকারের প্রয়োগ।

১৩। সর্বজ্ঞকর্তার ব্যবহার ।

১৪। 'ভাষামুদ্রা' সৃষ্টি ।

১৫। ড্যাস্ (—), কমা (,) সেমিকোলন (;) প্রশ্নবোধক (?) ডট্ ডট্ (.....) চিহ্নের উপযুক্ত ব্যবহার।

"তাজমহল" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ-

বনফুল এ গল্পের শরীর নির্মাণে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাকের বিচিত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এগল্পে মোট বাক্য সংখ্যা ১০৭টি । তার মধ্যে হ্রস্ব বাক্য আছে ৯৬টি এবং দীর্ঘ বাক্য আছে ১১টি।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—

বনফুল এ গল্পে যে বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দ ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল—

খ-১) তৎসম শব্দ —দর্শন, বিস্ময়, নির্নিমেষে, অবসন্ন, অপরাহ্নে, পূর্ণিমা, জ্যোৎস্না, পূর্বাভাস, পূর্বদিগন্ত, স্পষ্ট, অস্ফূট, মর্মর, পুঞ্জীভূত, মুগ্ধ, দৃষ্টি, নির্বাক ইত্যাদি ।।

খ-২) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত) — মাঠ, পেটে, রোজ, ইঁট, টাঙা, চাঁদ, গড়গড়া ইত্যাদি ।

খ-৩) ইংরেজি শব্দ— স্টেশন, ট্রেন, আউটডোর, কল, ফি, ক্যাংক্রাম অরিস, কন্ট্রাক্টর ইত্যাদি।

খ-৪) আরবী-ফার্সী শব্দ—বেগম, সাহেবা, কবর, সেলাম, চোস্ত, ফকির,চুনকাম,তাজমহল, মসজিদ ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ—

গ-১) বনফুল এগল্পে চলিত ভাষারীতি অনুসরন করেছেন। পূর্বেই বলেছি, বনফুলের চলিত ভাষারীতি কথ্য বা মৌখিক ভাষারীতির খুব কাছাকাছি। এগল্পে সেই ধরণটি উপস্থিত। যেমন—

১। 'দূর থেকে দিনের আলোর তাজমহল দেখে দমে গেলাম।' ২। 'শুভ্র আভাসও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে।'

৩। 'তাজমহলের পাশ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয় আজকাল।'

৪। 'জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।' ইত্যাদি।

গ-২) এগল্পের বাক্যগুলির গঠন উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া গোছের, নিরপেক্ষ কর্তা সহ বিধেয়

+ ক্রিয়া ধরনের, বিধেয় + ক্রিয়া + উদ্দেশ্য ধরনের বাক্য গঠনও দেখা যায়। যেমন—

১। 'বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।'

২। 'বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।'

৩। 'দূর থেকে দিনের আলোয় তাজমহল দেখে দমে গেলাম।'

৪। 'আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি।' ইত্যাদি।

গ-৩) গল্পটিতে সমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে ছোট ছোট সরল বাক্য যেমন নির্মাণ করা হয়েছে, তেমনি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ জটিল বাক্যও তৈরী করা হয়েছে। যেমন—

সরল বাক্য ঃ ১। 'বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।'

২। 'বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর' ইত্যাদি।

জটিল বাক্য ঃ 'কোন্ কন্ট্রাক্টার তাজমহল থেকে কত টাকা উপার্জন করে, কোন্ হোটেলওয়ালা তাজমহলের দৌলতে রাজা বনে গেল, ফেরিওয়ালাগুলো বাজে পাথরের ছোট ছোট তাজমহল আর গড়গড়ার মত সিগারেট পাইপ বিক্রি করে কত পয়সা পেটে রোজ, নিরীহ আগন্তুকদের ঠকিয়ে টাঙাগুলো কি ভীষণ ভাড়া নেয়— এসব খবরও পুরনো হয়ে গেছে।'

গ-৪) গল্পটি উত্তম পুরুষে কথকের জবানীতে বর্ণিত। বনফুলের গল্পগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য—বৈঠকী মেজাজ। উত্তমপুরুষে গল্প-কথকের জবানীতে বর্ণিত গল্পগুলিতে এই শৈলীটি দেখতে পাওয়া যায়। এগল্পেও সেই বৈঠকী চাল প্রয়োগ করেছেন বনফুল। যেমন— 'আগ্রার কাছেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ডাক্তার হয়ে এসেছি আমি। তাজমহল সম্বন্ধে আর মোহ নেই। একদিন কিন্তু —গোড়া থেকেই শুনুন তাহলে.....।'

গ-৫) 'গুলা' 'গুলি' 'গুলো' দিয়ে বহুবচনের পদ সৃষ্টি বনফুলের গল্পে লক্ষ্য করা যায়। যেমন— 'ফেরিওয়ালাগুলো', 'লোকগুলো' 'পাখিগুলি', 'মানুষগুলা'। ইত্যাদি।

গ-৬) 'ওলা' 'ওয়ালা' প্রত্যয় দিয়ে শব্দ গঠন বনফুলের ভাষারীতির একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন— 'ফেরিওয়ালা' 'হোটেল ওয়ালা' 'মেওয়াওলা' ইত্যাদি।

গ-৭) বনফুলের গল্পের বাক্য গঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি এমন সব প্রচলিত ইংরেজি শব্দ বাক্যে প্রয়োগ করেছেন, যেগুলি খুব অনায়াসে সুন্দরভাবে বাক্যে খাপ খেয়ে গেছে এবং অর্থবোধে স্বচ্ছতা এনেছে। যেমন— এগল্পে তিনি লিখেছেন—

১। 'সেদিন 'আউটডোর' সেরে বারান্দা থেকে নামছি।'

২। 'সেদিনও 'কল' থেকে ফিরছি ....।'

৩। 'আমাকে বাড়িতে নিয়ে 'ফি' দিয়ে দেখাবার সামর্থ্য তার নেই।'

৪। '...ব্যাপারটা বোঝা গেল 'ক্যাংক্রাম অরিস্!' ইত্যাদি।

গ-৮) এগল্পে তুলনামূলকভাবে বেশ একটু আরবী-ফার্সী শব্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বাক্য গঠনে। হয়তো তা মুঘল আমলের বাদশাহদের জীবন কাহিনী অবলম্বনে গল্প রচিত হওয়াতে।

যেমন—

১। 'বেগম সাহেবা দেখলাম আপাদমস্তক ভিজে গেছে।'

২। 'বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।'

৩। '....আমাকে সেলাম করে চোস্ত উর্দু ভাষায় বললে—— নিজের বেগমকে পিঠে করে বয়ে এনেছে সে আমাকে দেখাবে বলে।'

৪। 'চুনকাম করা সাধারণ একটা মসজিদের মত ——ওই তাজমহল।'

৫। 'ফকির শা-জাহান।' ইত্যাদি।

গ-৯) ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার অবস্থার ভাব পরিস্ফুটের দ্যোতক, আবার ভাষাকে কথ্যভাষার কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ারও একটি কৌশল। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন——

১। 'কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে।'

২। 'ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ।'

৩। 'গড়্‌গড়ার মত সিগারেট পাইপ।' ইত্যাদি।

গ-১০) শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation) লেখকের বিশিষ্টতাকে নির্দেশিত করে। বনফুল তাঁর গল্পে এমন কিছু শব্দচ্যুতি ঘটিয়েছেন, যা তাঁর বিশিষ্টতাকেই চিহ্নিত করে। এই শব্দ ব্যবহার আবার যুগলক্ষণকেও তুলে ধরে। রবীন্দ্র ভাবালুতা থেকে মুক্ত হবার জন্য 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'প্রগতি' ও অন্যান্য গোষ্ঠীর লেখকেরা বাস্তবতার আমদানী করতে বাস্তব ঘেঁষা শব্দও ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। বনফুলের গল্পেও সেই যুগ লক্ষণ চিহ্নিত হয়েছে কিছু বিশেষ শব্দের ব্যবহারে। যেমন— 'ছেলে' শব্দের বদলে 'ছোক্‌রা' শব্দের ব্যবহার, 'শরীরের' বদলে আটপৌরে 'গা' শব্দের ব্যবহার, ইত্যাদি। ভাষাশৈলী আলোচনায় এদিকগুলিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

গ-১১)অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল মুখ্য কর্ম সমন্বিত বাক্য যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি মুখ্য ও গৌণ উভয় কর্মের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১। 'বৃদ্ধ (মুখ্য কর্ম) সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে (গৌণ কর্ম)।'

২। 'নির্বাক (মুখ্য কর্ম) হয়ে দাড়িয়ে রইলাম।'

৩। 'চাঁদ উঠল।' (গৌণ কর্ম) ইত্যাদি।

"আধুনিক ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে বাক্য মাত্রেরই মূল বিভাগ দু'টি- 'নাম বাক্যাংশ' (Noun Phrase) যা কর্তার কাজ করে অর্থাৎ (Subject NP) এবং ক্রিয়া বাক্যাংশ (Verb Phrase = VP) যা কর্তার সক্রিয়তা বোঝায়। বাকি বাক্যাংশগুলি গঠন ও অর্থগতভাবে ক্রিয়া বাক্যাংশেরই অন্তর্গত।"[৮] বনফুলের গল্পে এই আধুনিক ব্যাকরণ সম্মত বাক্য গঠনের পরিচয় পাই। যেমন——১) 'প্রথম যখন আগ্রা গিয়েছিলাম, তাজমহল দেখতেই গিয়েছিলাম।' ২) 'বুড়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল'। ৩) 'আমি কল থেকে ফিরছি, হঠাৎ চোখে

পড়ল, বুড়ো দাঁড়িয়ে ভিজছে।' ইত্যাদি।

গ-১২) বনফুল তাঁর গল্পে শুধু মনোহারী উপমা প্রয়োগ করেন নি, অন্যান্য অলংকারেরও প্রয়োগ করেছেন। এগল্পে দু' একটি অপহ্নুতি অলংকারের নিদর্শন খুঁজে পাই। এই বাক্যালংকার প্রয়োগ তাঁর ভাষাশৈলীকে আরো আকর্ষণীয় ও হৃদ্য করে তুলেছে। যেমন —

১) 'ঝাউবীথি থেকে নয় — মনে হল যেন সুদূর অতীত থেকে'।

উপমেয় উপমান

২) 'মর্মর ধ্বনি নয় — যেন চাপা কান্না ' ইত্যাদি।

উপমেয় উপমান

অপহ্নুতি অলংকারে উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে তাই করা হয়েছে।

গ-১৩) বনফুলের গল্পে গল্পকথকের দু'টি রূপ দেখা যায়, এক, সর্বজ্ঞকর্তা, যিনি উত্তর পুরুষে (আমি) কাহিনী বর্ননা করেন, আর দুই, নিরপেক্ষকর্তা, যেখানে গল্পকথক নিরপেক্ষ থেকে কাহিনীর বিবরণ দিয়ে যান। এগল্পটি সর্বজ্ঞ কর্তায় বর্ণিত।

গ-১৪) 'ভাষামুদ্রা' (Language Register) ব্যবহার গল্পকারের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিতকরে। বলা বাহুল্য, যে কোন লেখকরই একাধিক রেজিষ্টার নিয়ন্ত্রনে থাকতে পারে। পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগের ভিন্নতাকে রেজিষ্টার বলে। সামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী রেজিষ্টার নির্বাচিত হয়। বনফুল ব্যক্তিগত জীবনে চিকিৎসক ছিলেন, তাই তাঁর গল্পে বিশেষত যেখানে গল্পকথক চিকিৎসক সেখানে চিকিৎসা সংক্রান্ত ও চিকিৎসালয় সংক্রান্ত বহু ভাষামুদ্রা ব্যবহার করেছেন। এগল্পেও তার নিদর্শন আছে। যেমন— 'কল' 'আউটডোর' 'ফি' 'ক্যাংক্রাম অরিস'।

গ-১৫) বনফুল অন্যান্য গল্পের মত এই গল্পেও ছেদ-যতির উপযুক্ত ব্যবহার। তাতে কাহিনীর ভাব আরও গভীরতা পেয়েছে। যেমন— "পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠেনি ; জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে পূর্বদিগন্তে। সেদিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্মর-ধ্বনি কানে এল। ঝাউবীথি থেকে নয়—মনে হল, যেন সুদূর অতীত থেকে ; মর্মর-ধ্বনি নয়—যেন চাপা কান্না।" ইত্যাদি।

"গণেশ জননী" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"গণেশ জননী" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্য সংখ্যা = ১৩১ টি

বাক্যের আয়তন ১) দীর্ঘ =২৭টি

২) হ্রস্ব = ১০৪ টি

অনুপাত = ২৭:১০৪

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

মোট শব্দ সংখ্যা = ১২০৫ টি

১) তৎসম শব্দ = ৯৫ টি

শতকরা হার = ৮%

২) অর্ধ-তৎসম শব্দ = ৫ টি

শতকরা হার = ০.৪১%

৩) তদ্ভব (দেশী সমেত) = ১০৫৬ টি

শতকরা হার = ৮৮%

৪) ইংরেজি শব্দ = ৩৬টি

শতকরা হার = ৩%

৫) আরবী-ফার্সী শব্দ = ১০ টি

শতকরা হার = ১%

৬) হিন্দি শব্দ = ৩ টি

শতকরা হার = ০.২৫%

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ-

১) সাধু ও চলিত ভাষারীতির প্রয়োগ।

২) বাক্য নির্মিত ঃ উদ্দেশ্য + বিবেধ + ক্রিয়া (SOV), বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV), উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (SV), বিধেয় + ক্রিয়া (OV) ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৩) ছোট ছোট সরলবাক্যের পাশাপাশি দীর্ঘ জটিল বাক্যের প্রয়োগ।

৪) বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব।

৫) উপমা অলংকারের প্রয়োগ।

৬) ড্যাস্ চিহ্নে (—), ডট্ ডট (. .. .) চিহ্ন, কমা (,) প্রশ্নবোধক (?) চিহ্ন, পূর্নচ্ছেদ (।),বিস্ময় বোধক চিহ্ন (!) - এর বিচিত্র প্রয়োগ।

৭) বাগ্‌ধারার প্রয়োগ।

৮) লেখকের অঙ্গীকৃত হওয়া।

৯) চিঠির ব্যবহার।

১০) শব্দার্থ তত্ত্ব ।

১১) 'ল'-কে 'ন' এবং 'ন'-কে 'ল' উচ্চারণ প্রবণতা।

১২) ধ্বন্যাত্মক, অনুকার, অনুগামী শব্দের ব্যবহার।

"গণেশ জননী" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ-

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ—বনফুল এ গল্পে ১৩১টি হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের সন্নিবেশ করেছেন। হ্রস্ব বাক্যের সংখ্যা ১০৪টি এবং দীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা ২৭টি ।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—বনফুল এ গল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হল—

খ-১) তৎসম শব্দ—সসম্ভ্রমে, অবগতি, নিমিত্ত,পরাধীন, অন্ন, সংস্থান, গন্তব্য, স্থান, পূর্বে, মান, বন্ধ, অসম্পূর্ণ, সুস্থ,সমস্ত ইত্যাদি।

খ-২) অর্ধ-তৎসম শব্দ—ছোট্ট, গেরস্ত, গেছল, গিন্নি, পোষবার।

খ-৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—গ্রাম, ঘোড়া, গাড়ি, ছেঁড়া, জুতা, ভদ্রলোক, গোঁফ, চাপর, আশা, মুখ, ঘর, হাতি ইত্যাদি।

খ-৪) ইংরেজি শব্দ—সুট্‌কেশ, স্টেশন, সাইকেল, স্টাইল, প্রাইভেট, প্র্যাক্‌টিস,কল্, ম্যাজিষ্ট্রেট্, টেবিল, ক্যালেণ্ডার,ক্যাম্বিস, সার্জেন ইত্যাদি

খ-৫) আরবী-ফার্সী—সাহেব, মালিক, গাড়োয়ান, গোমস্তা, মুশকিল, তুলকালাম ইত্যাদি।

খ-৬) হিন্দি শব্দ—খাটিয়া, গুম, চৌকি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-

গ-১) বনফুল এইগল্পে চলিত ও সাধু — উভয় ভাষা রীতি ব্যবহার করেছেন। বর্ণনা অংশে সাধুভাষা রীতি এবং প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষারীতি। পূর্বেই বলেছি, বনফুলের সাধুভাষারীতি তৎসমগন্ধী নয়, মূলত সর্বনাম ও ক্রিয়ার পূর্ণরূপটিই তাঁর সাধুভাষা রীতির প্রকৃতি, আর চলিত ভাষারীতি কথ্য ভাষার এত কাছাকাছি যে তা মুখের কথায় পরিণত হয়েছে যেন। যেমন —

"মিনিট খানেক পরেই তিনি হাতল-ভাঙা 'কাপে' এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিলেন। আগে চা-টা খেয়ে নিন, তারপর রুগী দেখবেন।

হয়েছে কি?

বিশেষ কিছু নয়, খাওয়া বন্ধ হয়েছে।

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, আমার দিক থেকে অবশ্য সুবিধে, হাতির খোরাক যোগাতে হচ্ছে না, কিন্তু গিন্নি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে, তাই মুশকিলে পড়ে গেছি— ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।"—ইত্যাদি।

বনফুল সাধু ভাষারীতির বাক্যে এমন সব শব্দ ব্যবহার করেন (সর্বনাম ও ক্রিয়া বাদে) যা আটপৌরে, সেকারণে তাঁর সাধুভাষারীতিও খুব সহজসরল স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ। কোথাও তৎসম শব্দের ভাড়ে ন্যুব্জ হয়ে পড়েনি। আর চলিতভাষায় কক্‌নি বুলি ব্যবহার করায় তর্ তর্ করে এগিয়ে চলেছে ভাষা।

গ-২) এ গল্পের সর্বাধিক বাক্যনির্মিতি—উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV), বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV),বিধেয় + ক্রিয়া (OV) ইত্যাদি ধরনের এবং বাক্যাংশ স্পস্ট।

১) 'আমি পশু চিকিৎসা করি।'

২) 'ভদ্রলোক চুপ করিলেন।'

৩) 'আমি সবিনয়ে শুনিতেছিলাম।'

৪) 'ভদ্রলোকের চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল।'

কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম(SVO) ক্রিয়া-কর্তা-কর্ম (VSO) ক্রিয়া-কর্ম-কর্তা (VOS) কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া(OSV) কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা(OVS)।

বাংলা বাক্যের সাধারণ সজ্জা (SOV) এবং ইংরেজি বাক্যের সাধারণ সজ্জা (SVO). . . . সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা সজ্জার ক্ষেত্রে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) র আর্বতন সর্বাধিক।"[৯] বনফুলের গল্পেও বাক্যগঠনের উক্ত বিচিত্র ধরন লক্ষ্য করা গেলেও কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV)-র গঠন সর্বাধিক।

গ-৩) বনফুলের গল্পের ভাষাশৈলীর একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য যা পূর্বেও আমি উল্লেখ করেছি, তাহল ছোট ছোট সরল বাক্যের ব্যবহার। দীর্ঘবাক্যের পর আবার কয়েকটি ছোট বাক্যের ব্যবহার, তারপর আবার কিছু দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার। এভাবে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের বিচিত্র সমাবেশে কাহিনীর গতিময়তা অক্ষুন্ন থেকেছে। বনফুলের ছোটছোট সরল বাক্যের নমুনা হল—

১) 'আমি পশু চিকিৎসা করি।'

২) 'একটি জরুরী তার পাইলাম।'

৩) 'স্টেশনটি ছোট।'

৪) 'আমার রুগি কোথায়।'

৫) 'প্রশ্নটা না করিলে পারিলাম না।' ইত্যাদি।

দীর্ঘ বাক্যের নমুনা ঃ- (১) 'যে দেশে অসুস্থ মানুষেরই ভাল করিয়া চিকিৎসা হয় না সে দেশে

পশুচিকিৎসা করিয়া কি প্রকারে আমার জীবিকা নির্বাহ হয়, এ প্রশ্ন যাঁহাদের মনে জাগিতেছে, তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আমি সরকারি পশু চিকিৎসা বিভাগে চাকুরি করি।'

(২) 'তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, আমার দিক থেকে অবশ্য সুবিধে, হাতির খোরাক যোগাতে হচ্ছেনা, কিন্তু গিন্নিও খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে, তাই মুশকিলে পড়ে গেছি— ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন।'

(৩) 'হাতি পোষার নানাবিধ অসুবিধার কথা সাড়ম্বরে বর্ণনা করিয়া গৃহিণীর ঘাড়ে তিনি দোষ চাপাইতেছেন বটে, কিন্তু গণেশকে লইয়া তিনি যে সত্যই বিব্রত তাহা তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া মনে হইল না।' — ইত্যাদি।

গ-৪) বনফুলের ভাষাশৈলী নির্মাণে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার। এগল্পেও সে বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। যেমন —

১) 'কমিশনার সাহেবের ঘোড়া,ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুকুর, পুলিশ সাহেবের গাভী প্রভৃতির স্বাস্থ্য তদারক করিয়া ছ্যাক্‌ড়া গাড়ির ঘোড়া 'পাস' করিয়া আমার অন্ন সংস্থান হয়।'

২) 'মনুষ্য চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাক্‌টিসের মতো নির্ভরযোগ্য 'প্র্যাকটিস' আমাদের নাই।'

৩) 'তবু মাঝে মাঝে দু-একটা 'কল' জোটে।'

৪) 'দুই শত টাকা 'ফি' পাওয়া যাইবে।'

৫) 'সেকেণ্ড ক্লাসে আমিই একমাত্র লোক।'

৬) 'স্টাইল জাহির করিবার নিমিত্ত সেকেন্ড ক্লাস টিকিট করিয়াছিলাম।'

৭) 'আপনি কি ভেটেনারি সার্জেন?'

৮) 'পায়ে মলিন ক্যাম্বিসের জুতা।'

৯) 'মিনিট খানেক পরেই হাতল-ভাঙা 'কাপে' এক কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিলেন।'

১০) 'সম্মুখে প্রকান্ড একটা বাথটব।' ইত্যাদি

গ-৫) অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল উপমার ব্যবহার করেছেন। যেমন — 'গণেশ কুলার কত কান দু'টি নাড়িয়া ফোঁশ করিয়া শব্দ করিল।'

গ-৬) বনফুলের গল্পের ছেদ-যতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ড্যাস (—) ও ডট্ ডট্ (. . .) চিহ্নের ব্যবহার। সমকালীন জীবনানন্দ দাশের কবিতার যার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই ড্যাস,ডট্ ডট্, চিহ্ন বিবিধ কারণে গল্পে ব্যবহৃত হয়। যেমন, দৃষ্টান্ত দিতে, একটি কথার মধ্যে অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে এলে দুপাশে ড্যাস বসে,যাকে ইংরাজিতে (Parenthetic Clause) বলে। ইতস্তত বা দ্বিধার ভাব বোঝাতে, প্লুতস্বর বোঝাতে, বৈপরীত্য ভাব সৃষ্টিতে। বনফুলের গল্পে এই বিবিধ অর্থে ড্যাস্ (—), ডট্ ডট্ (. . .) চিহ্নের ব্যবহার দেখা যায়। 'গণেশ জননী' গল্পেও এই ড্যাস ও ডট্ ডট্ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে বক্তার ভাব পরিস্ফুটনে। যেমন—

১) 'সামনেই পূজা . . . . . বিরাট পরিবার . . . . . ভগবান জুটাইয়া দিয়েছেন।'

২) '. . . . স্টেশন হইতে বাহির হইলাম।'

৩) ' ডাক্তারবাবু, আসুন—এই ঘরে —হ্যাঁ—তাঁহার বাহিরের ঘরটিতে বসিলাম।

৪) 'একটি চৌকি, একটি দড়ির ছেঁড়া খাটিয়া, এক নড়বড়ে টেবিল, গোটা দুই ক্যালেণ্ডারের ছবি—ইহাই সে ঘরটিতে সাজসজ্জা।'

৫) 'আমরাই হাতি . . . . . ভদ্রলোক ভিতরে চলিয়া গেলেন। আমি বিস্মিত হইলাম লোকটা রসিকতা করিতেছে না কি!'

৬) 'এই বাইরের ঘরটিই যা ছোট, এছাড়া আর দুটি ঘর আছে — এক রান্না ভাঁড়ার ঘর আর একটি শোবার — দুটোই বিরাট 'হল'— মানে 'হল' করতে হয়েছে . . . . . ওর জন্যে . . . . . বাইরের ঘরের দরজাই দেখুন না . . . . . এই দিক দিয়ে উনি বেরোন, কেটে বড় করতে হয়েছে . . . . . ।'

৭) 'একটু বকলে ঝকলেই খাওয়া বন্ধ করে দেয় . . . কিন্তু এরকম একটানা ছত্রিশঘন্টা খাওয়া দাওয়া বন্ধ আর কখনো করেনি . . . . . .তাছাড়া অতগুলো আম খেয়েছে তো — ভয় হয়ে গেছে আমাদের. . . . . " - ইত্যাদি।

গ-৭) বনফুল একটি বাগ্‌ধারাও ব্যবহার করেছেন এগল্পে। যেমন— 'গনেশের পান থেকে চুন খসবার জো নেই.....।'

গ-৮) বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও গল্পকথক ও বনফুল একাত্ম হয়েছেন যেন। বনফুল নিজেও একজন চিকিৎসক ছিলেন। তাই খুব সুন্দর ভাবে এগল্পে বনফুল নিজেকে ঢেলে দিয়েছেন। লেখকের অঙ্গীকৃত হওয়া লেখার একটি বিশেষ শৈলীকে চিহ্নিত করে, যা বনফুলের গল্পে আমরা দেখতে পাই।

গ-৯) বনফুলের গল্পের ভাষাশরীর তৈরীর আর একটি বিশিষ্ট স্টাইল হল — চিঠির ব্যবহার। 'চিঠি পরওয়ার পর', 'দেশ দরদী কেনারামের রোজনামচা' প্রভৃতি গল্পে চিঠি ও দিনলিপির ধাঁচে বিশেষ শৈলী প্রয়োগ করেছেন বনফুল। তাঁর সঙ্গে দেশদরদী কেনারামের রোজনামচা' গল্পে দিনলিপির তারিখ (০৮.০৭.৫০, ১০.৭.০৫, ১২.৭.৫০, ১৪.৭.৫০) সংযোজন গল্পের বাস্তবতা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। 'গনেশ জননী' গল্পের একটি চিঠির সন্নিবেশ করেছেন গল্পশরীর তৈরীতে। যা গল্পের বিষয় ভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চিঠিটি হল— 'আপনারা আমার প্রাণদান করেছেন, বিনিময়ে আপনাদের কি আর দিতে পারি, সামান্য উপহার পাঠালাম, গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব।' এই চিঠির সঙ্গেই ছোট্ট সুন্দর হাতির বাচ্চাটি নিঃসন্তান দম্পতিকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন গুজরাটি কচ্ছি, যাকে দেখে গৃহকর্ত্রী আর স্থির থাকতে পারেন নি, হাতির বাচ্চাটি তাদের সন্তানবৎ হয়ে উঠল।

গ-১০) ভাষাশৈলীর বিচারে শব্দার্থ তত্ত্ব (Semantics) একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

কেননা লেখকেরা কোন একটি শব্দকে বাচ্যার্থে প্রয়োগ করতে পারেন, লক্ষ্যার্থে প্রয়োগ করতে পারেন, আবার ব্যাঙ্গার্থে বা ব্যঞ্জনার্থেও প্রয়োগ করতে পারেন, শব্দটির কোন বিশেষ অর্থেপ্রয়োগ হচ্ছে তার 'ধরন' অনুসারে লেখকের বিশিষ্টতাও চিহ্নিত করে। **"একই ধ্বনি একই ভাষায় অনেক অর্থের জ্ঞাপন করে। আবার একই অর্থে একই ভাষায় অনেক ধ্বনি দ্বারা জ্ঞাপিত হয়। .....**

শক্তিশালী কবিগণ এবং পণ্ডিতগণ ধ্বনিতে কেবল নূতন অর্থই যোজনা করেন না নূতন অর্থে নূতন ধ্বনির প্রয়োগ করিয়া নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া থাকেন।"[১০] বনফুলের শব্দের বিশেষ অর্থে প্রয়োগও তাঁর বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করে। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল কিছু শব্দ প্রয়োগ করেছেন, যেমন—'গুম' 'দক্ষিণা' ইত্যাদি। গল্পের শেষে গৃহকর্তা যখন বলেন — 'আপনার দক্ষিণা কত দিতে হবে ডাক্তারবাবু — তখন 'দক্ষিনা' শব্দটি তার বাচ্যার্থ ছেড়ে লক্ষ্যার্থকে অর্থাৎ 'ফীজকে' নির্দেশিত করেছে।

গ-১১)আমরা পূর্বেই বলেছি যে বনফুলের গল্পে রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উপভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাওয়া যায়। রাঢ়ী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্টের মধ্যে একটি হল — 'ন' - কে 'ল' এবং 'ল' - কে 'ন' রূপে উচ্চারণ করা। এগল্পেও তার নমুনা আছে। যেমন — 'ন্যাংড়া আম' - এর পরিবর্তে 'ল্যাংড়া আম'

গ-১২) এ গল্পে বনফুল ভাষাকে মৌখিক ভাষার কাছাকাছি আনার জন্য বেশ কিছু ধ্বন্যাত্মক, অনুকার, অনুগামী শব্দ ব্যবহার করেছেন । যেমন—দুষ্টু দুষ্টু, খোঁচা খোঁচা, কাঁচা পাকা, তাড়াতাড়ি, নরবড়ে, খাওয়া-দাওয়া, ছেলে-পিলে, হা হা, সাজ-সজ্জা, বকলে-ঝকলে ইত্যাদি।

"শ্রীপতি সামন্ত" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"শ্রীপতি সামন্ত" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্যের সংখ্যা			= ১০৮ টি
বাক্যের আয়তন	১)	দীর্ঘ	= ১৮ টি
	২)	হ্রস্ব	= ৯০ টি
অনুপাত			= ১৮:৯০

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

মোট শব্দ সংখ্যা = ৯৭৫ টি।

১) তৎসম শব্দ = ৯৫ টি।
শতকরা হার = ১০%
২) তদ্ভবশব্দ(দেশী সমেত) = ৭৯৭ টি।
শতকরা হার = ৮২%
৩) ইংরেজি শব্দ = ৫৭ টি।
শতকরা হার = ৬%
৪) হিন্দি শব্দ = ১১ টি।
শতকরা হার = ১%
৫) আরবী-ফার্সী শব্দ = ১১ টি
শতকরা হার = ১%

গ) গল্পটির ব্যাকরনগত বৈশিষ্ট্য ঃ

১। সাধু ও চলিত ভাষারীতির ব্যবহার।

২। বাক্য গঠন ঃ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া (OSV) কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম(SVO), ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলি স্পষ্ট।

৩। ছোট ছোট সরলবাক্যের পাশাপাশি, দীর্ঘজটিল বাক্যের ব্যবহার।

৪। বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ, এমনকি ইংরেজি বাক্যের ব্যবহার।

৫। মিশ্র ভাষার প্রয়োগ।

৬। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার।

৭। উপমা অলংকার প্রয়োগ।

৮। বাগ্‌ধারা ব্যবহার।

৯। স্বরভক্তিগত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য।

১০। স্বরসঙ্গতির প্রয়োগ।

১১। 'অ্যা' 'উ' ধ্বনির এবং চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য।

১২। আরোহ, অবরোহ পদ্ধতির বাক্য গঠন।

১৩। ক্রিয়ার রূপ ঃ সমাপিকা, অসমাপিকা, যৌগিক।

১৪। বিপ্রতীপতা।

"শ্রীপতি সামন্ত" গল্পটির ভাষাশৈলীগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ—বনফুল এ গল্পে ১০৮টি হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের সন্নিবেশ করেছেন। হ্রস্ব বাক্যের সংখ্যা ৯০টি এবং দীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা ১৮টি ।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—বনফুল এ গল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হল—

খ-১) তৎসম শব্দ—অসম্ভব, স্থান, মনুষ্য সমস্ত, অধিকৃত, বিবাহ, অসহ্য, সহসা, স্বর্গীয়, কীর্তিমান, পুত্র, বিদ্যুৎ, বিজৃম্ভণ ইত্যাদি।

খ-২) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—ভিড়, তিল, লোক, পোশাক, রাত্রি, ঘুম, চোখ, পাতা, গরম, মাথা, ডাণ্ডা ইত্যাদি।

খ-৩) ইংরেজি শব্দ—বার্থ, স্টেশন, প্ল্যাটফর্ম, গার্ড, ফুলফোর্সে, পাইপ ইত্যাদি।

খ-৪) হিন্দি শব্দ—আপ, দ্যাখা, হ্যায়, জাত, তুলকে ইত্যাদি।

খ-৫) আরবী-ফার্সী—সাহেবী, গোলমাল, হুজুর, তরমুজ ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-

গ-১) ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা অনুধাবন করে আমরা লেখকের ভাবনার জগতে প্রবেশ করি। এই ভাষাব্যবহার লেখকের বিশেষ শৈলীকেও চিহ্নিত করে এবং দক্ষতাও প্রতিপন্ন করে। বনফুল তাঁর বিভিন্ন গল্পের মত এগল্পেও চরিত্রানুযায়ী যে ভাষাশৈলী ব্যবহার করেছেন তা গল্পের চরিত্রবৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যথাযথ হয়েছে। এগল্পে বনফুল ভাষাশরীর নির্মাণে সাধু ও চলিত —উভয়রীতি ভাষা ব্যবহার করেছেন — বর্ণনা অংশে সাধুভাষারীতি এবং প্রত্যক্ষ উক্তিরক্ষেত্রে চলিত ভাষা। যেমন—

" ও কুরু মহাশয়, বাজে কথার কচকচিতে আর কাজ কি? কটা টাকা লাগবে বলুন, আমিই দিয়ে দি। ঘুমটা আমার হওয়া আজ নিতান্তই দরকার, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন।

সাহেব ও ক্রু উভয়েই বিস্মিত হইলেন। বলে কি !

সামন্ত মহাশয় কিন্তু সমস্ত ভাড়াটা মিটাইয়া দিলেন এবং সাহেবকে বলিলেন, আপনিও তো হুজুর কোলকাতা যাচ্ছেন। আমার গদিতে টাকাটা জমা দেবেন সুবিধামত।

এই বলিয়া তিনি একটা ঠিকানা দিলেন।

তাহার পর ক্রু-র দিকে ফিরিয়া মাথা ঝাঁকিয়া সামন্ত মহাশয় রাষ্ট্রভাষায় বলিলেন, কটা বাঙালি আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতা রে বাপু !"

গ-২) বনফুল এগল্পের বাক্য গঠনে যে ধরনটি প্রয়োগ করেছেন তা হল — কর্তা + ক্রিয়া + কর্ম (SOV), কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া (OSV) কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম(SVO), কর্ম-ক্রিয়া (OV), কর্তা-ক্রির্য়া(SV), বিবৃতিধর্মী বাক্য, ইত্যাদি। বাংলা বাক্যগঠনে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার এবং ইংরেজি বাক্য নির্মাণে কর্তা+ক্রিয়া+কর্মের ব্যবহার করেছেন। যেমন—

বাংলা বাক্য ঃ- ১) 'সামন্ত মতিস্থির করিয়া ফেলিলেন।'

২) 'সামন্ত-ছোটবাবু-সংবাদ তিনি উপভোগ করিতেছিলেন।' - ইত্যাদি।

ইংরেজি বাক্য ঃ- ১) 'আই কান্ট পাঞ্চ ইওর ওয়ার্ড।'

২) 'মাই টিকিট ইজ্ ইন্ মাই সুট্‌কেস্।' ইত্যাদি।

গ-৩) বনফুল তাঁর গল্পে ছোট ছোট সরলবাক্যের পাশাপাশি দীর্ঘ ও জটিল বাক্য প্রয়োগে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন। এগল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। যেমন—

ছোট বাক্য ঃ- ১) 'ট্রেনে অসম্ভব ভিড়'

২) 'একটি স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে।'

৩) 'কাল তো অসহ্য গরম গিয়াছে।'-ইত্যাদি।

দীর্ঘ জটিলবাক্য ঃ- ১) 'শ্রীপতি সামন্ত নেপোলিয়ন নহেন,তাহা ঠিক; কিন্তু তিনি স্বর্গীয় ছিদাম সামন্তের কীর্তিমান পুত্র, যে ছিদাম সামন্তের প্রতিভার গুণগান এখনও ছেলে-বুড়ো সকলেই করিয়া থাকে।'

২) 'পরনে একটি আধময়লা থান, খালি গা, চোখে ধূলিধূসরিত একজোড়া দেশী মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাঁচ-ফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডানদিকে ডান্ডাটা নাই, সে দিকে সুতা বাঁধা।'

৩) 'হৈ-হৈ শব্দে কালীকিঙ্কর, শ্যামাপদ, বাঞ্ছা কয়েক বোঝা শালপাতা, এক বান্ডিল খালি বস্তা, দুই হাঁড়ি গুড়, একটি তরমুজ, একটি বঁটি, একটি ছিপ, দুইটা প্রকান্ড ঝুড়িতে নানাবিধ ছোট বড় বোঁচকা ও পুঁটলি ও একটিন ঘি সমেত সামন্ত মহাশয়কে ফার্স্টক্লাশেই তুলিয়া দিল।' ——ইত্যাদি।

গ-৪) বনফুল তাঁর গল্পের ভাষাশরীর নির্মাণে, বাক্য গঠনে শুধু ইংরেজি শব্দই নয়, প্রয়োজনে ইংরেজি বাক্যও ব্যবহার করেছেন। যা গল্পের ভাব-শরীরে খাপ খেয়ে গেছে। যেমন-

১) 'তিনি স-পাইপ মুণ্ড ভিতরে টানিয়া লইয়া ইলেকট্রিক পাখাটা ফুল ফোর্সে খুলিয়া দিলেন।'

২) 'দ্যাট্ কান্ট বি। আই কান্ট অ্যালাউ।'

৩) 'ইওর্ টিকিট প্লীজ্।'

৪) 'প্লীজ্ টেক্ মাই ওয়ার্ড ফর্ ইট্।'

৫) 'মাই টিকিট্ ইজ্ ইন্ মাই সুট্‌কেস্।'—ইত্যাদি।

—পাঞ্জাবি ক্রু এবং বাঙালি সাহেবটির সঙ্গে যে ইংরেজিতে বাক্যালাপ চলেছে তা চরিত্রানুযায়ী যথাযথ হয়েছে।

গ-৫) আবার বাংলা ও হিন্দি ভাষার মিশ্রণে মিশ্রভাষারও প্রয়োগ করেছেন বনফুল এগল্পে যা চরিত্র অনুযায়ী যথার্থ হয়েছে। পাঞ্জাবি ক্রুটি যখন বাঙালিদের সম্পর্কে কটূক্তি করেছিল, তখন স্বাজাত্যগর্বী সামন্ত মহাশয় হিন্দি ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে প্রতিবাদ মুখর হয়ে বলেছেন—"কটা বাঙালি আপ্ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতা রে বাপু!"

গ-৬) গল্পের ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকছি আনার একটি মাধ্যম হল ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুকার

শব্দ, অনুগামী শব্দের ব্যবহার করা। অন্যান্য গল্পের মত এ গল্পেও এজাতীয় শব্দের কিছু নমুনা আছে। যেমন— 'কচলাইতে কচলাইতে, 'গদি-মদি,' 'ঢংঢং,' 'ছুটাছুটি,' 'কচ্‌কচি,' 'ঘড়ঘড়ায়মান।'

গ-৭) এগল্পে উপমা অলংকারের প্রয়োগ করে বনফুল বাক্যসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করতে প্রয়াসী হয়েছেন এবং সফলও হয়েছেন। যেমন— 'বিদ্যুত চমকের মত একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।'

গ-৮) বনফুল অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও একটি বাগ্‌ধারা ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন।'

গ-৯) অল্পশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লিষ্ট হয়ে স্বরভক্তির উচ্চারণ প্রবণতা সৃষ্টি করে। এগল্পেরও সামন্ত মহাশয়ের কথাবার্তায় এই ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা চরিত্রানুযায়ী যথার্থ হয়েছে। যেমন— 'ক্রু' শব্দের পরিবর্তে 'কুরু' শব্দের ব্যবহার, 'ক্লাস' শব্দের পরিবর্তে 'কেলাস', 'ফার্স্ট' শব্দের পরিবর্তে 'ফাস্‌টো'। 'ট্রেন' শব্দের পরিবর্তে 'টেরেন' শব্দের ব্যবহার। এটি পূর্ববঙ্গীয় ভাষার উচ্চারণ প্রবণতাও বটে। নমুনা —

১) 'টেরেনেতো আজ্ঞে চড়াই দায়, হজুর।'

২) 'ওটা যে ফাস্‌টো কেলাস গো।'

৩) 'ও কুরু মহাশয়।' ইত্যাদি।

— এসব ঔপভাষিক ভাষারীতির ব্যবহারে বনফুলের দক্ষতা প্রশ্নাতীত।

গ-১০) এছাড়া এগল্পে স্বরসঙ্গতি ঘটিত বাক্ ব্যবহারেরও নিদর্শন আছে, যা বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি বিশিষ্ট লক্ষ্যণ। যেমন— দেশি → দিশি, দিবেন → দেবেন, ইত্যাদি।

গ-১১) এছাড়া 'ও' 'অ্যা' ধ্বনির, 'উ' ধ্বনির, চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ প্রবণতা বনফুলের এগল্পে লক্ষ্য করা যায়। যা রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য। যেমন— 'দ্যাখা', 'হ্যায়' 'অ্যালউ' 'ফাসটো', 'যাঁহা', 'তাঁহা', 'কুরু' ইত্যাদি।

গ-১২) আরোহ, অবরোহ পদ্ধতির বাক্যগঠন গল্পকারের একটি ভাষাশৈলী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল এ রীতির প্রয়োগ করেছেন। যেমন— 'সকলে নেপোলিয়ন নহেন। সামন্ত মহাশয়তো নহেনই। সুতরাং তাঁহার দ্বারা এ অসম্ভব হইল না।'

গ-১৩) অন্যান্য গল্পের মত এ গল্পেও বনফুল সমাপিকা, অসমাপিকা ও যৌগিক ক্রিয়া বিচিত্র সমাবেশ করেছেন। যেমন—'সামন্ত মহাশয় সশব্দে বিজৃম্ভণ করিলেন।', 'সামন্ত মহাশয়ের চুলহীন ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।' 'শ্রীপতি সামন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।', 'রাত্রি আটটা হইবে।' ইত্যাদি।

গ-১৪) **'বিপ্রতীপতা লেখকের সুনির্দিষ্ট শৈলী চিহ্নিত করে।'**[১১] বনফুলের গল্পে কাহিনীর বিপ্রতীপতা একটি বিশিষ্ট শৈলী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বিপ্রতীপতা বর্তমান। এই বিপ্রতীপতা সৃষ্টি হয়েছে হ্যাট-কোট পরিহিত বাঙালি সাহেবটির কথাবার্তা, আচরণ, মানসিকতার সঙ্গে শ্রীপতি সামন্ত মহাশয়ের কথাবার্তা, বাহ্যিক রূপ, আচরণ ও মানসিকতায়। পাঞ্জাব ক্রুর কথায় যার প্রতিবাদ করার কথা পাঠক ভেবেছিলেন, তাহল না, প্রতিবাদ করে উঠলেন

সামন্ত মহাশয়, এমনকি সাহেবটির ভাড়াও মিটিয়ে দিলেন তিনি, উপরন্তু 'সমস্ত পথটা' সাহেবটি 'আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না।' এই বিপ্রতীপতা বনফুলের গল্পের কাহিনীর আকর্ষণ ও টান্ টান্ উত্তেজনা বজায় রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে।

এবারে বনফুলের **'বড়'** আকৃতির গল্পের ভাষাশৈলীর বিশ্লেষণে দেখে নিতে পারি, এই শ্রেণীর গল্পের ভাষাশৈলী নির্মাণে তিনি কতটা মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন —

"অর্জুন মণ্ডল" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"অর্জুন মণ্ডল" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ

মোট বাক্য সংখ্যা			= ৬৯৩টি
বাক্যের আয়তন	১)	দীর্ঘ	= ১১০টি
	২)	হ্রস্ব	= ৫৮৩টি
অনুপাত			= ১১০:৫৮৩

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ

	মোট শব্দ সংখ্যা	= ৫২০৯ টি।
১)	তৎসম শব্দ	= ৩৯৭ টি।
	শতকরা হার	= ৮%
২)	অর্ধ-তৎসম শব্দ	= ৭টি
	শতকরা হার	= ০.১৩%
৩)	তদ্ভবশব্দ(দেশী সমেত)	= ৪৫২২ টি।
	শতকরা হার	= ৮.৭%
৪)	ইংরেজি শব্দ	= ১৮১ টি।
	শতকরা হার	= ৪%
৫)	হিন্দি শব্দ	= ১৫ টি।
	শতকরা হার	= ১%
৬)	আরবী ফার্সী শব্দ	= ৮৭ টি

শতকরা হার = ২%

গ) গল্পটির ব্যকরণগত বৈশিষ্ট ঃ

১। চলিত ভাষারীতির ব্যবহার।

২। বাক্য নির্মিতি ঃ কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া (OSV) কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম(SVO), কর্ম - ক্রিয়া (OV), কর্তা - ক্রিয়া (SV) ইত্যাদি ধরনের। বাক্যাংশগুলির স্পষ্টতা।

৩। ছোট ছোট সরলবাক্যের পাশাপাশি দীর্ঘ জটিল বাক্যের ব্যবহার।

৪। বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব ও ইংরেজি বাক্যের ব্যবহার।

৫। হিন্দি ভাষারীতির সংমিশ্রণ।

৬। রাঢ়ী ও বরেন্দ্র উপভাষার ধ্বনিগত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি বঙ্গালী ঔপভাষিক ভাষারীতির ব্যবহার।

৭। পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা।

৮। চিঠির ব্যবহার।

৯। সমসাময়িক, পূর্ববর্তী লেখকদের উল্লেখ।

১০। ইতর (Slang)শব্দ ব্যবহার।

১১। প্রবাদ-প্রবচণ ও বাগ্‌ধারার ব্যবহার।

১২। অনুকার, অনুগামী, ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার।

১৩। 'টা' অনুসর্গের ব্যবহার ।

১৪। বিপ্রতীপতা।

"অর্জুন মন্ডল" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয়ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ—বনফুল এ গল্পে ৬৯৩টি হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের সন্নিবেশ করেছেন। হ্রস্ব বাক্যের সংখ্যা ৫৮৩টি এবং দীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা ১১০টি ।

খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—বনফুল এ গল্পে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হল—

খ-১) তৎসম শব্দ—খর্বাকায়, কেশ, বিরল, ক্ষুব্ধ, কণ্ঠস্বর, বোধ, শুদ্ধ, ক্রিয়াপদ, ভবিষ্যত, উদ্যত, অবলীলাক্রমে, লৌকিকতা, দৃশ্য, আর্তনাদ ইত্যাদি।

খ-২) অর্ধ-তৎসম শব্দ—চিতুয়া, যাচ্ছি, পাচ্ছিল ইত্যাদি।

খ-৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—কড়া, নাড়া, কপাট, খদ্দর, বারান্দা, মাথা, শালা, ভুল, চিঠি,

ঝুড়ি, দড়াম, বগল, দাঁড়ান ইত্যাদি।

খ-৪) ইংরেজি শব্দ—সুইচ, কোট, পোস্ট, পাস, পেন্সিল, ফার্স্টবুক, চেয়ার, টেবিল,ডিক্শনারি, প্রাইভেটলি, কম্পাউণ্ডার, ড্রেসার, ব্যাণ্ডেজ, প্র্যাক্টিস ইত্যাদি।

খ-৫) হিন্দি শব্দ—মছলি, উসকো, দেনা, চাহিয়ে, মাহিনামে, রেওয়াজ, হ্যায় ইত্যাদি।

খ-৬) আরবী-ফার্সী—মজুরি, মঞ্জুর, গোলমাল, হুজুর, লুচ্চা, বদমাস ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-

গ-১) বনফুল তাঁর এই সর্ববৃহৎ গল্পটিতে চলিত ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন। পূর্বেই বলেছি, বনফুলের চলিত ভাষারীতি কথ্যভঙ্গির খুব কাছাকাছি। এ গল্পেও সে রীতির অনুসরণ করেছেন তিনি। যে ধরনের কথাবার্তা আমরা হামেশাই বলি বাক্ ব্যবহারে, সে ধরনের ভাষাশৈলীটি বনফুল তাঁর এ গল্পেও ব্যবহার করেছেন। যেমন—

"হাটে প্রচণ্ড একটা গোলমাল উঠল একদিন। চিৎকার চেঁচামেচি কলরব আর্তনাদে সমস্ত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল যেন। একটা জায়গায় ভিড়টা জমাট বেঁধে গেল। মনে হতে লাগল, তার কেন্দ্রে ভয়াবহ কি যেন একটা হচ্ছে। হঠাৎ ভিড় ঠেলে অর্জুন কাকা বেরিয়ে এলেন। তাঁর বগলে একটা রুইমাছ। বাবা হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন। অর্জুন কাকা ছুটে এসে মাছটা দড়াম করে সামনে ফেলে বাবার পা দুটো জড়িয়ে ধরলেন।

আমায় বাঁচান আপনি ডাক্তার বাবু, শালারা আমার সব কেড়ে নিচ্ছে।. . . ." ইত্যাদি।

গ-২) বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পে বাক্য নির্মিতির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য + বিধেয় + ক্রিয়া (SOV) উদ্দেশ্য + ক্রিয়া + বিধেয় (SVO) বিধেয় + উদ্দেশ্য + ক্রিয়া (OSV) ক্রিয়া + বিধেয় + উদ্দেশ্য (VOS) প্রভৃতি ধরনের বাক্য বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। বাক্যাংশগুলি স্পষ্ট। যেমন—

১) 'অর্জুনকাকা মাঝে মাঝে কথাবার্তাতেও শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন।'

২) 'ভুল ভুল—এ জীবনটা ভুল করতে করতেই কাটল বীরেনবাবু।'

৩) 'তারপর বাঁশ খড় দড়ি কাটারি শাবল কোদাল নিয়ে, অর্জুনকাকা এসে পড়লেন.....।' — ইত্যাদি।

শুধু তাইনয়, কোন কোন ছোট ছোট বাক্যে শুধু কর্তা+ক্রিয়া বা কর্ম+ক্রিয়া-র সহযোগে নির্মিত। যেমন —

১) 'আমরা হাসতাম'। ২) 'মাথার চুল ধরে টানতেন। ' ইত্যাদি।

গ-৩ বনফুল অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও ছোট ছোট বাক্যের পাশাপাশি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘবাক্য ও রচনা করেছেন। এই ছোট ও বড় বাক্যের বিচিত্র বিন্যাসের ফলে গল্প দ্রুত এগিয়েছে—দীর্ঘ বাক্য কাহিনীর গতিকে শ্লথ করে দেওয়ার যে একটা ত্রুটি ঘটতে পারত,

এক্ষেত্রে তা ঘটেনি। যেমন —

"জমিদারও বাবাকে খুব খাতির করতেন। অর্জুনকাকার কিছু হল না। বাবার খাতিরে জমিদার তার মাছ নেওয়াই মাফ করে দিলেন। অতিশয় সামান্য ব্যাপার। জমিদাররা মানীর মান রাখবার জন্যে হামেশাই এরকম করে থাকেন। অর্জুন কাকার কিন্তু তাক লেগে গেল। অতবড় দুধর্ষ রাবণ মিশির লিকলিকে রোগা এই ডাক্তার বাবুটির কাছে একেবারে কেঁচো। উঃ বিদ্যার কি প্রতাপ! কি হবে পয়সায়, কি হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস, বশিষ্টের তপোবল দেখে বিশ্বামিত্রের যে অবস্থা হয়েছিল অর্জুনকাকার অনেকটা তাই হল।

উক্ত ঘটনার দিন সাতেক পরে অর্জুনকাকা এসে একটু কাঁচুমাচু হয়ে বাবাকে বললেন আমার একটা আরজি আছে ডাক্তারবাবু।

কি বল?

আমি কিছু লেখাপড়া করতে চাই। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

এইবার বাবার তাক লাগল।

তুমি লেখাপড়া করবে! তোমার সংসার দেখবে কে?

আমার স্ত্রী। আমার জমি-জমা কিছু আছে, আমার স্ত্রী ধান কুটে, ছাতু পিষে—চলে যাবে কোন রকমে। আমিও রোজগার করব কিছু।" —ইত্যাদি।

গ-৪) বনফুলের গল্পের এমনকি বলতে পারি বনফুলের সমগ্র সাহিত্যের ভাষাশৈলীর একটি বিশিষ্ট প্রবণতা হল ইংরেজি শব্দের ব্যবহার। এই ইংরেজি শব্দগুলি তিনি এমনভাবে অনায়াসে বাক্যে ব্যবহার করেছেন, যাতে মনে হয়, ঐ শব্দটি ভাবকে যথাযথ ভাবে প্রকাশের জন্য সেখানে ব্যবহার করা যেন প্রয়োজন ছিল। যেমন—

১) 'সুইচ টিপে বারান্দার আলোটা জ্বালালাম'

২) 'চিতুয়া পোষ্ট করেনি তা হলে?'

৩) '. . .চিতুয়া এবারও ম্যাট্রিক পাস করতে পারেনি, বুঝলে?'

৪) 'তারপর ওকে আমি কম্পাউণ্ডারি পড়বার জন্যেও স্কলারশিপ যোগাড় করে দেব।'

৫) 'তিন-তিনখানা ডিকশনারি আনতে দিয়েছি আমি—'

৬) ক্লাস প্রোমোশন অবশ্য পেলে . . .।' - ইত্যাদি।

শুধু ইংরেজি শব্দ নয় গল্পের পরিবেশ পরিস্থিতি, পাত্র-পাত্রীর চরিত্র স্বরূপ উন্মোচনে ইংরেজি বাক্যেরও ব্যবহার বনফুল তাঁর ভাষাশৈলীতে করেছেন। এ গল্পে অর্জুনকাকা যথার্থ বিদ্যাচর্চা করে শিক্ষিত হয়ে সাহেবের সামনে যখন ইংরেজিতে বাক্য বিনিময় করেন, তখন এতটুকুও অস্বাভাবিক মনে হয় না। যেমন—সাহেবের মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে সে সাগ্রহে বলেছে— 'Yes Sir, I shall carry your things most gladly.' তারপর ষ্টেশনে মালপত্র পৌঁছে দিলে সাহেব তাকে পয়সা দিতে চাইলে অর্জুনকাকা পুনরায় বলেছে—'Thank you Sir, I

am a labourer, no doubt, but I shall not accept anything from you.' বিস্মিত সাহেবটি যখন প্রশ্ন করলেন —'Why?' তখন অর্জুনকাকা উত্তরে বলেছেন — - 'You are our Doctor Babu's honoured guest.' — এই কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে অর্জুনকাকার চরিত্র স্বরূপটিও উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন বনফুল।

গ-৫) বহুভাষিক বনফুল ইংরেজি শব্দ ও বাক্যের পাশাপাশি হিন্দি ভাষা ও চরিত্র, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন। তাতে করে গল্পের পটভূমি যে মণিহারী গ্রামের তাও স্পষ্ট হয়েছে। কেননা, এ গল্পে দেখা যায়, গল্পকথকের পিতা যখন হাসপাতালের বারান্দায় বসে কাজ করছিলেন, সে সময় অজুর্নকাকা স্থানীয় জমিদারের সিপাহীদের সঙ্গে গণ্ডগোল করে গল্পকথকের পিতার কাছে আশ্রয় নিলে তিনি যখন জানতে চাইলেন যে অর্জুনকাকার মাছ তারা জোর করে কেড়ে নিচ্ছে কেন। তখন সিপাহীরা বলেছে —

"এইসেই তো রেওয়াজ হ্যায় হুজুর। মাহিনামে একঠো বড়া মাছলি তো উসকো দেনাই চাইয়ে!" উত্তরে অর্জুনকাকা গর্জন করে বলেছে— 'নেহি দেগা—।'—এই সংলাপগুলি চরিত্রানুযায়ী যেমন যথাযথ হয়েছে, তেমনি চরিত্র বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে।

গ-৬) আমরা পূর্বেই বলেছি বনফুলের ভাষাশৈলীতে রাঢ়ী ও বরেন্দ্রী উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়। তবে বনফুল কোন চরিত্রকে বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করতে গিয়ে উক্ত দুই ঔপভাষিক অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তার বিস্তার ঘটিয়েছেন। অর্জুনকাকা যে পূর্ববঙ্গীয় তা তাঁর ভাষাব্যবহারের বিশিষ্টতা দিয়ে বনফুল বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন — বঙ্গালী, উপভাষার 'ও' ধ্বনি 'আ' ধ্বনি রূপে, 'প' কে 'ফ' রূপে উচ্চারণ হয়। অর্জুনকাকার 'বোঝার' পরিবর্তে 'বুঝা', 'দেবোর' পরিবর্তে 'দিব', 'মিছেমিছির' পরিবর্তে 'মিছামিছি', 'আপদকে' 'আফৎ' ব্যবহারের বিশেষত্ব তাঁর চরিত্র ও ভৌগোলিক এরিয়াকে চিহ্নিত করে।

গ-৭) গল্পের পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং চরিত্রের মানসিক অবস্থা বোঝাতে গিয়ে পৌরাণিক কোন ঘটনার অবতারণা বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি দিক। এ গল্পে অর্জুনকাকার গল্পকথকের পিতার কাছে জমিদারের সিপাহীদের পরাস্ত হওয়ার ঘটনায় গল্পকথক পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। যেমন— "উঃ বিদ্যার কি প্রতাপ! কি হবে পয়সায়, কি হবে জমিদারিতে, বিদ্যাই আসল জিনিস, বশিষ্ঠের তপোবল দেখে বিশ্বামিত্রের যে অবস্থা হয়েছিল, অর্জুনকাকার অনেকটা তাই হল।"

গ-৮) অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল গল্পশরীরে চিঠির আবতারণা করেছেন। তবে তা গল্পশরীরের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য লাভ করেছে।

গ-৯) শুধু পৌরাণিক প্রসঙ্গ নয়, সমসাময়িক, বা পূর্ববর্তী বিশিষ্ট লেখক বা ব্যক্তিত্বদেরও গল্পের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যবহার করা বনফুলের ভাষাশৈলীর আর একটি বৈশিষ্ট্য। যদিও অনেক সময় তা ব্যঙ্গ বাণে বিদ্ধ। যেমন—এগল্পে বঙ্কিমচন্দ্র ও কবি হেমচন্দ্রের কথা বলেছেন। এখানে

বঙ্কিমচন্দ্রকে আক্রমণ না করলেও হেমচন্দ্রকে একটু খোঁচা দিয়েছেন।

গ-১০) বনফুল বিষয়বস্তু ও চরিত্রের স্বভাবধর্ম ও কথাবার্তার ধরন অনুসারে প্রয়োজন এমনকিছু ইতর শব্দ প্রয়োগ করেন, যা গল্পের ভাবশরীরে খাপ খেয়ে যায় অনায়াসে। এবং তা চরিত্র-বৈশিষ্ট্য উন্মোচনেও সহায়ক হয়ে ওঠে। যেমন এগল্পে 'শালা' শব্দটি বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ তা আমাদের এতটুকুও বিরক্তির কারণ হয়নি বরং মনে হয় চরিত্র স্বরূপ উন্মোচনে যথাযথ হয়েছে।

গ-১১)বনফুল তাঁর গল্পে প্রয়োজনে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারাকে যেমন ব্যবহার করেছেন, তেমনি নিজেও অনেক সময় কিছু কিছু প্রবচন বাগধারা সৃষ্টি করেছেন। যা আটপৌরে অথচ যথাযথ ও ব্যঞ্জনাধর্মী। যেমন— 'দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি', 'গো-বেড়েন', 'জলের মত পয়সা খরচ' 'আমগাছে আমই ফলবে'—ইত্যাদি।

গ-১২) লেখ্যভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি আনার একটি মাধ্যম ধ্বন্যাত্মক, অনুকার,অনুগামী শব্দের ব্যবহার। মুখের ভাষাকে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করার এটি একটি বড় কৌশল অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল বহু এধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন— 'ছোটোখাটো', 'মিছামিছি', 'পাই-পয়সা', 'খাওয়া-দাওয়া', 'লুচি-টুচি', 'ঠাস্-ঠাস্, 'বাদ-প্রতিবাদ, 'আলাপ আলোচনা', 'খাবার টাবার', 'এক-আধ', 'কুচকুচে', 'হাসা হাসি', 'গোলমাল', 'লিকলিকে', 'পাততে পাততে', 'জমি জমা', 'বইটই', 'ঝকঝক', 'চেঁচামেচি' ইত্যাদি।

গ-১৩) এছাড়া নির্দেশক 'টা' অনুসর্গের ব্যবহারও এগল্পে রয়েছে। যেমন—দুইটা, মাছটা, কলাটা, মুলোটা ইত্যাদি।

গ-১৪) অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বিপ্রতীপতা বর্তমান। অর্জুন মণ্ডলের জীবন কাহিনীর মধ্যে এবং বড় বাক্স বানিয়ে তীর্থযাত্রা করতে গিয়ে সেই বিরাটাকার বাক্স নিয়ে ট্রেনে উঠতে না পারার মধ্যে বিপ্রতীপ ভাব সৃষ্টি হয়েছে।

এভাবে বনফুল এগল্পে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে যে ভাষা বসিয়েছেন, যে ভাষাশৈলী নির্মাণ করেছেন, তা পরিবেশ-পরিস্থিতি ও চরিত্রানুযায়ী যথাযথ হয়েছে এবং এতে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

"ঐরাবত" গল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণ ঃ

"ঐরাবত" গল্পের ভাষাশৈলীর পরিসংখ্যানগত পরিচয় ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির পরিচয় ঃ-

মোট বাক্য সংখ্যা			= ২১০ টি
বাক্যের আয়তন =	১)	দীর্ঘ	= ৩২টি
	২)	হ্রস্ব	= ১৭৮টি।
অনুপাত			= ৩২:১৭৮

খ) শব্দ ব্যবহারের পরিচয় ঃ-

	মোট শব্দ সংখ্যা	= ১৬৬৮ টি
১)	তৎসম শব্দ	= ৩০৫ টি
	শতকরা হার	= ১৮%
২)	অর্ধ্ব-তৎসম শব্দ	= ২টি
	শতকরা হার	= ০.১১%
৩)	তদ্ভবশব্দ (দেশী সমেত)	= ১২৮৬টি
	শতকরা হার	= ৭৭%
৪)	ইংরেজি শব্দ	= ৪৫টি
	শতকরা হার	= ১%
৫)	অন্যান্য	= ৭টি
	শতকরা হার	= ০.৪২%

গ) গল্পটির ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য ঃ-

১) সাধু ও চলিত — উভয় ভাষারীতি অনুসৃত।

২। বাক্য গঠন— কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV), কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম(SVO),কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া(OSV) ইত্যাদি। বাক্যাংশগুলি স্পষ্ট।

৩। ছোট ছোট সরল বাক্যের পাশাপাশি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ জটিল বাক্যের ব্যবহার।

৪। ধ্বন্যাত্মক, অনুকার,অনুগামী শব্দের ব্যবহার।

৫। গল্পের মধ্যে গল্প।

৬। বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার।

৭। চিঠির ব্যবহার।

৮। মহৎ ব্যক্তিত্বর উল্লেখ।

৯। পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা।

১০। বাক্য গঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব।
১১। শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation) এবং অর্থ বিচ্যুতি (Semantic Deviation)।
১২। বিপ্রতীপতা।

"ঐরাবত" গল্পের ভাষাশৈলীগত পরিচয়ঃ

ক) বাক্য নির্মিতির আলোচনা ঃ—বনফুল এ গল্পে শরীর নির্মাণে ২১০টি হ্রস্ব ও দীর্ঘ বাক্যের সন্নিবেশ করেছেন। হ্রস্ব বাক্যের সংখ্যা ১৭৮টি এবং দীর্ঘ বাক্যের সংখ্যা ৩২টি ।
খ) শব্দ ব্যবহারের নমুনা ঃ—বনফুল তাঁর গল্পের শরীর নির্মাণে বিভিন্ন শ্রেণীর সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। সাহিত্যের আত্মা যদি রস হয় তবে শব্দ অবশ্যই দেহ নির্মাণের একমাত্র উপাদান। 'সাহিত্য হ'ল শব্দ ও অর্থের পার্বতী-পরমেশ্বর মিলন।'[১২] শব্দ ও অর্থের উপযুক্ত বিন্যাসেই সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হয়। বনফুলও তাঁর গল্পে বিবিধ শ্রেণীর শব্দের ব্যবহারে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। আলোচ্য গল্পে যে সব শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন তার নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হল—
খ-১) তৎসম শব্দ—ত্রিগুণ, আকর, প্রচণ্ড, ধার্মিক, সংযমী, শরীর, লক্ষ্য, প্রত্যহ, স্বাস্থ্য, মৌলিকতা, পৈতৃক, দৈনন্দিন, প্রণালী, প্রসিদ্ধ ইত্যাদি।
খ-২) অর্ধ-তৎসম শব্দ—কিষণপুর, ছোকরা।
খ-৩) তদ্ভব শব্দ (দেশী সমেত)—গোড়া, মুগুর, কাজ, দাঁতন, খুব, জমি, শীত, বাঁধিয়া, ব্যায়াম, ভৈরোঁব ইত্যাদি।
খ-৪) ইংরেজি শব্দ—ডেভালাপার, পাস, কার্বলিক, লোশন, স্টোভ, ডাম্বেল, কমপ্লিট, ব্যাগ, টিঞ্চার, টেররিস্ট, কপিং, পেন্সিল ইত্যাদি
খ-৫) অন্যান্য শব্দ—পালোয়ান, চা, বখেরা, মামুলী, গুজব ইত্যাদি।

গ) ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা ও নমুনা ঃ-
গ-১) এগল্পে বনফুল সাধুও চলিত—উভয় ভাষারীতি ব্যবহার করেছেন বিবৃতি অংশে সাধুর ভাষারীতি। যেমন— "চমক ভাঙিল, যখন ত্রিগুণানন্দ বলিলেন, হাঁ করে দেখছিস কি? এই তোর বৌদি। বখেড়া মিটিয়ে ফেলেছি।
'হেঁট হইয়া বউদির পদধূলি গ্রহণ করিলাম।'
গ-২) এগল্পের বাক্য নির্মিতি বিচিত্র — কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV), কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম(SVO),কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া(OSV) ইত্যাদি। যেমন —
১) 'ত্রিগুণানন্দবাবু শুধু ত্রিগুণ নয়—বহুগুণেরই আকর ছিলেন।'

২) 'মিলিটারী বুট পরলে আরও যে সব আনুষঙ্গিক পরিচ্ছদ-পরিধান করা সাধারণ লোকে সঙ্গত মনে করেন ত্রিগুণাবাবু সে সবের ধার ধারিতেন না।' —ইত্যাদি।

গ-৩) বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হল ছোট ছোট সরলবাক্যের পাশাপাশি, একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ জটিল বাক্যের বিচিত্র সমাবেশ। এগল্পেও সেই বাক্য-বিন্যাস বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

১) 'শরীরের প্রতি তাঁহার ভীষণ লক্ষ্য ছিল।'

২) 'তিনি উঠিতেন খুব ভোরে।'

৩) 'বাড়ি ফিরিয়া তিনি স্টোভ জ্বালিতেন ।'

৪) 'স্নান শেষ করিয়া ভৈরোঁ রাগিণীতে একটি ভজন গাহিতে গাহিতে তিনি বাড়ি ফিরিতেন ; কি শীত, কি গ্রীষ্ম প্রাতঃকালে অবগাহম স্নান করা তাঁহার চা-ই।'

৫) 'তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমাদের দেশের সকলে যদি ব্রহ্মচর্যের মর্মবস্তুটির সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হয়, তাহা হইলে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা অচিরেই লুপ্ত হইবে।'ইত্যাদি।

গ-৪) অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বনফুল বেশ কিছু ধ্বন্যাত্মক, অনুকার, অনুগামী শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—'লেখা-পড়া' 'জমি-জমা' 'সকাল-সকাল' 'গাঁটে-গাঁটে' 'ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া' 'গোছা-গোছা, 'ছোট-ছোট'; 'ঝড়-বৃষ্টি', 'দ্বারে -দ্বারে', 'ক্রমে-ক্রমে', 'দেখতে-দেখতে', 'তন্ন-তন্ন','ধড়-মড়', 'টুকি-টাকি', 'যাওয়া-আসা', 'কুচ-কুচে' ইত্যাদি।

গ-৫) বনফুলের গল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল—গল্পের মধ্যে গল্প বলা। যদিও মূল কাহিনীর সঙ্গে ভাবগত দিক থেকে সেগুলি সাযুজ্যপূর্ণ। এগল্পে 'মরমী' পত্রিকার সম্পাদক চিত্রকার গল্পলেখকের যে কাহিনী বিবৃত করেছেন, তা গল্পের মূল কাহিনীর সঙ্গে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ।

গ-৬) বনফুলের ভাষাশৈলী নির্মাণের একটি বৈশিষ্ট্য হল, গল্পের চরিত্র ও অবস্থা অনুযায়ী বাগ্‌ধারা, প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার। তবে তা বনফুল নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছেন। এগল্পেও বনফুল বেশ কিছু বাগ্‌ধারা প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন। যেমন—

১) 'গ্রামস্থ যোগী ভিক্ষা পায় না'

২) 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।'

৩) 'ঠক্ বাছিতে গেলে গ্রাম উজার করিতে হয়।'

গ-৭) বনফুলের গল্পের ভাষাশরীর নির্মাণে চিঠির ব্যবহার একটি শৈলী হিসেবে চিহ্নিত।এগল্পেও চিঠির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ত্রিগুণানন্দবাবুর চরিত্র পরিবর্তনের সমস্ত বৃত্তান্ত এই চিঠিতে বিধৃত, যা ছয় নম্বর পরিচ্ছেদে গল্পকথককে ত্রিগুণাবাবু লিখেছেন।

গ-৮) এছাড়া ঘটনা বিন্যাসে প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের, ঘটনার উল্লেখ বনফুলের গল্পে লক্ষ্য করা যায়। এগল্পেও আছে। এগল্পে ঋষি অরবিন্দের, চট্টগ্রামের টেররিষ্ট দলের উল্লেখ আছে।

গ-৯) তাছাড়া গল্পের ঘটনাবিন্যাস প্রসঙ্গে পৌরাণিক চরিত্র ও ঘটনার উপমা টানা বনফুলের

গল্পের একটি শৈলী। এ গল্পেও সে শৈলী অনুসৃত হয়েছে। এগল্পে পৌরাণিক ঐরাবতের প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, স্বামী ত্রিগুণানন্দের কামনাগুনে ভেসে যাওয়ার প্রসঙ্গে।

গ-১০) বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বাক্যগঠনে ইংরেজি শব্দের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যা বনফুলের ভাষাশৈলীর একটি বিশিষ্ট দিক। যেমন—

১) 'কমপ্লিট।'

২) 'আর থাকিত চামড়ার একটি ব্যাগ পোস্টাপিসের পিওনরা সাধারণত যে জাতীয় ব্যাগ কাঁধে ঝুলাইয়া চিঠি বিলিকরে, সেই জাতীয় একটি ব্যাগ।'

৩) 'যথা —— কপিং পেন্সিল, একটি বাঁধানো নোটবুক, শুকনো খেজুর, টিঞ্চার আয়োডিন ইত্যাদি।

৪) 'সঙ্গে একটি হাল-ফ্যাশান-দুরস্ত তন্বী তরুণী।'

৫) 'ঐরাবত 'ক্লীন শেভড' গোঁফ-দাঁড়ি একেবারে নেই।

৬) 'পায়ে পেটেন্ট লেদারের কুচকুচে কালো পাম্পসু।'

৭) 'হাতে সোনার রিস্টওয়াচ।' - ইত্যাদি।

গ-১১) শব্দ বিচ্যুতি (Word Deviation) এবং অর্থ বিচ্যুতি (Semantic Deviation) ভাষাশৈলীর একটি বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করে। বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও শব্দ বিচ্যুতি ও অর্থ বিচ্যুতি ঘটেছে। 'ছোক্‌রা' 'বখেড়া' শব্দ দুটি তার নমুনা।

গ-১২) বনফুলের অন্যান্য গল্পের মত এগল্পেও বিপ্রতীপতা লক্ষ্য করা যায়। স্বামী ত্রিগুণানন্দের চরিত্রে সেই বিপ্রতীপতা সৃষ্টি হয়েছে। যে ব্যক্তিটি সমস্ত 'বখেরা' মিটিয়ে ফেলার জন্য ব্রহ্মচর্য ধর্ম গ্রহন করলেন, তিনি কিনা শেষ পর্যন্ত 'একটি হাল ফ্যাশন-দুরস্ত-তন্বী-তরুণী' বিয়ে করে বসলেন!

বনফুলের **'ছোট' 'মাঝারি'** ও **'বড়'** আকৃতির বিভিন্নগল্পের ভাষাশৈলী বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ্য করলাম যে, বনফুল শুধু প্রকরণকেই তাঁর বিশিষ্টতার নিদর্শন রূপে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, তিনি যে একজন সুকৌশলী ভাষা শিল্পী তা তাঁর ভাষাশৈলী বিশ্লেষণে আমরা অনুাধাবন করতে পারলাম। চরিত্রানুযায়ী, বিষয়বস্তু অনুযায়ী, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী, চরিত্র স্বরূপ উন্মোচনে, গল্পের ভাব-বিশ্লেষণে, প্রতীকে, ব্যঞ্জনায় যে ভাষাশৈলী তিনি ব্যবহার করেছেন তাতে তাঁর মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। কোথায় কোন্ পরিস্থিতি কোন্ চরিত্রের মুখে, কোন্ ভাষা বসালে ভাষা ও চরিত্রের যথার্থতা রক্ষিত হবে, তা বনফুল খুব ভালোভাবেই জানতেন। তাঁর গল্পের একটি বাক্য, এমনকি এক-একটি শব্দ সুনির্বাচিত, সুনিয়ন্ত্রিত, সুপরিবেশিত। সেকারণে তাঁর গল্পগুলি আমাদের মনের এত কাছাকাছি আসতে পেরেছে। ডঃ সুকুমার সেন একদা আক্ষেপ করে বলেছিলেন—"**আজ বাঙালি পাঠক বনফুলের গ্রন্থ উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতের পাঠক তা করবে না। এই আমার ভবিষ্যৎবাণী।**"[১৩] বস্তুতঃপক্ষে তাই। বনফুলের গল্পের বিচিত্রসম্ভার তাঁর

ভাষাশৈলীর কারুকার্য আজ আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায়, আমাদের মনে গভীর ভাবে দাগ কাটে। তাই বনফুলের বিশিষ্টতা শুধু ছোট ছোট গল্পিকা রচনাতেই সীমাবদ্ধ নয়, তাকে অতিক্রম করে গল্পের ভাষাশৈলী নির্মাণেও তাঁর বিশিষ্টতাকে খুঁজে পাব আমরা।

–ঃ উল্লেখপঞ্জী ঃ–

১) 'সমালোচনার কথা—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। পুনর্মুদ্রণ: ২০০৮–২০০৯, পরিশিষ্ট – ১, পৃ.– ২৮৪।

২) 'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস'— অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম দে'জ সংস্করণ : জুলাই ২০০০। পৃ.– ১৪।

৩) 'বনফুল ঃ শৈলী বিজ্ঞানের একটি সমীক্ষা' (প্রবন্ধ)— বীতশোক ভট্টাচার্য । ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত। বাণীশিল্প প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮২। পৃ.–২৬।

৪) 'বনফুল প্রসঙ্গে' (প্রবন্ধ) — অন্নদাশঙ্কর রায়। ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত। বাণীশিল্প প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮২। পৃ.–১৩৪।

৫) 'তিলোত্তমা' গল্প— বনফুল।

৬) 'শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব'— ড. অভিজিৎ মজুমদার। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ২০০৭ । পৃ.– ১০৯।

৭) ঐ পৃ.– ১০৪।

৮) 'শৈলীবিজ্ঞান পরিচিতি' —ড. গিরিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রজ্ঞা বিকাশ। প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ২০০৭। পৃ.– ১১৪।

৯) 'শৈলী বিজ্ঞান' — অপূর্বকুমার রায়। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম দে'জ সংস্করণ : অক্টোবর ২০০৬ । পৃ.– ৫৫।

১০) 'কাব্যালোক'—ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম দে'জ সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৯৮। পৃ.– ২৩১।

১১) 'শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব' — ড. অভিজিৎ মজুমদার। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ২০০৭ । পৃ.– ১০৩।

১২) 'সাহিত্য–বিবেক'—ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং। তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারী ২০০৩ । পৃ.– ৭৭।

১৩) 'বনফুলের ফুলবন' —ড. সুকুমার সেন। সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ: দোলপূর্ণিমা ১৩৯০। পৃ.– ১০।

পঞ্চম অধ্যায়

বনফুলের ছোটগল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার

পঞ্চম অধ্যায়

"বনফুলের ছোটগল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার"

"।। শ্রীঃ ।।

।।ওঁ নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।।

'তোমাকে নমস্কার; তুমি চিৎ বা জ্ঞানশক্তি; সমস্ত

রূপ বা নেত্র - গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের আভ্যন্তর আত্মা তুমি।"[১]

"বাহিরের পরিদৃশ্যমান বস্তু-জগৎ এবং ভিতরের অদৃশ্য মনোজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ—এই দুইয়ে মিলিয়া মানুষকে যখন একাধারে রূপের মাধ্যমে অরূপের অভিব্যক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তখন হয় শিল্পসৃষ্টি।. . . . . বিশ্বপ্রকৃতি এবং জাতি ও সভ্যতার পারিপার্শ্বিক অনুসারে শিল্পরচনা বিভিন্ন দেশে ও জাতিতে বিভিন্ন কালে নানা বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত হয়। . . . . .সার্থক শিল্প দেশ কাল পাত্র নিবদ্ধ নহে — তাহা বিশ্বমানবের সম্পত্তি, সকল দেশের রসিক জনের আস্বাদ্য এবং উপভোগ্য।"[২] বস্তুত পক্ষে প্রত্যেক শিল্পীই "চলতিকাল' থেকে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে তাকে 'চিরকালের স্তব্ধতায়"[৩] বেঁধে রাখতে প্রয়াসী হন। কেননা ক্ষণকালের জন্য বা শুধু সমকালের জন্য কেউই সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। এবং সেই সাহিত্য সৃষ্টির অভিনবতায়, শিল্প - প্রকরণের বৈচিত্রে স্রষ্টা নিজেকে বিশেষ ভাবে বিশিষ্ট করে তোলেন।

ছোটগল্প মেদভার বর্জিত আঁটসাঁট বাঁধনের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প সৃষ্টি। সেকারণে ছোটগল্পে উপন্যাসের মত অতিকথন বা কাহিনী বিস্তার থাকে না। তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে, সংহত অবয়বে, জীবনের এক 'Totality'- কে ধরার প্রয়াস। জীবনের এই 'Totality' বা সামগ্রিকতার রূপ বিধৃত করতে গিয়ে সাহিত্যিকেরা নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন এবং তার রূপায়ণে যত্নবান হন। সেই রূপ নির্মাণের সার্থকতাই সাহিত্যিকদের অভীষ্ট। কেননা, তাতেই শিল্পীর শিল্পমূল্য নির্ধারিত হয়। শিল্পীর মনোধর্মের সারবস্তু ঐ শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রতিভাত হয়। তাই শিল্প সার্থকতা বিচার শুধুমাত্র শিল্পের বাহ্যিক অবয়বগত বিচারই নয়, তার সঙ্গে শিল্পীর আত্মিক যোগও ঘনিষ্ট। শিল্পী তাঁর নিজস্ব মানস প্রবণতা, চিন্তা ভাবনা ও জীবনদর্শন অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করেন এবং সেই বিষয়-ভাবনা প্রকাশে নিজের বিশিষ্টতাকেও রূপ দিতে চান বা রূপ দেন।

ছোটগল্প একটি বিশেষ 'আর্ট ফর্ম' এবং তাতে বিষয়বস্তুর মেদহীন বিন্যাস ও প্রযুক্তিকৌশলের দৃঢ়বদ্ধতা একান্তভাবে প্রত্যাশিত। অবশ্য ছোটগল্পের ঘটনার ঘনপিনদ্ধতা সম্পর্কে সকলে একমত নন। ডি.এইচ. লরেন্স সিসিলীয় কবি ভের্গার গল্প সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন — "**As a matter of fact, we need more looseness. We need an apparent formlessness**"[৪] অর্থাৎ লরেন্সের মতে ছোটগল্পের আঁটসাঁট বাঁধন অনেকটা

কৃত্রিম ও যান্ত্রিক। কিন্তু এই মতের বিপরীত মত পোষণ করেছেন হেনরি জেমস্, ডব্লু.এইচ. হাড্সন্, ব্রাণ্ডের ম্যাথুজ প্রমুখ। তাঁদের মতে ছোটগল্পের 'ফর্মে', সংক্ষিপ্ত সংহতি একান্ত আবশ্যক। ডব্লু.এইচ.হাড্সন্ তাঁর **'An introduction to the study of literature'** গ্রন্থে ছোটগল্প সম্পর্কে বলেছেন— **'A short story must contain one and only one informing idea, and that this idea must be worked out to it's logical conclusion with absolute singleness of aim and directness of method.'**[৫] আবার জেমস্ জয়েসকে ছোটগল্পের সুগঠিত শিল্পরূপ ততটা আকৃষ্ট করেনি। তিনি মনে করতেন **'Form takes and holds the preserves substance.'**[৬] আবার ব্র্যাণ্ডের ম্যাথুজ ছোটগল্পের আটফর্ম বলতে বুঝিয়েছেন **'A short story deals with a single character, a single event, a single emotion or the serious of emotions called for by a single situation'**- কে অর্থাৎ ম্যাথুজ ছোটগল্পে **'Unity of impression'**- কেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। তবে ছোটগল্পের স্বাতন্ত্র্য যে **'Singleness of effect'** - এর মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয় তা বলাই বাহুল্য। ছোটগল্পের সীমিত সংহত পরিসর **'Totality', 'Unity'** এবং লেখকের **'Fulness of ..... intention'** দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। ছোটগল্পের শিল্পরূপ সম্পর্কে খুব সুন্দর আলোকপাত করা হয়েছে **'English short stories of today'** গ্রন্থের প্রিফেস অংশে। সেখানে বলা হয়েছে — **"A short story is a work of art and all art should enlarge life by creating and communicating an experience. The reader should be able to identifyed himself with one or all of the caracters and experience through them what happens. But since the life, the experience, comes from the writer the story will depened for it's intensity and it's value on the quality of the story's creator. And a good story as distinct from one ment merely to entertain, should have the reader with his sympathies or his vision or his understanding enlarged by what he has read.**

..... The plot must be simple and the characters few, because there is not the space or time for complexities. Irrelevance and digression cannot be concealed and so all detail must be significant and the development must be clear. And because the writer is usually trying to convey one central experience in a very small space he must pursue the maximum of meaning with the minimum of words. He must stimulate the leader into

inferring what there is not room to say, use bold transition in passing from one part of the narrative to the next, and aim at a kind of echo, or resonance, so that the reader when he reaches the end will find the experience vibrating in his memory like music."[৭]

পাশ্চাত্যের মত প্রাচ্য সাহিত্যিক ও সমালোচকেরাও ছোটগল্পের 'ফর্ম' ও 'কন্টেন্ট' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ব্যক্তিত্বের মহীরুহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "সোনারতরী" কাব্যের 'বর্ষাযাপন" কবিতায় ছোটগল্পের চরিত্রটি বিশেষভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন। সর্বজন বিদিত সেই কবিতাংশটি হল —

"ছোটোপ্রাণ ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্তৃত রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু- চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল;
অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্তির ধূলা,—
কত ভাব কত ভয়-ভুল—"

খাঁটি ছোটগল্পে এই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায়।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্পের একটি সুচিন্তিত সংজ্ঞা ও কতগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে **"ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression) জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।**

. . . . .

"প্রতীতির সমগ্রতা" — **Unity of Impression** — লেখকের প্রধান পালনীয় শর্ত।

. . . . .

প্রথম কথা হল, ছোটগল্পে ঘটনাগত মনস্তত্বগত বা চরিত্রগত — একটি মাত্র

সমস্যারই সংকটরূপ দেখানো হবে।

দ্বিতীয়ত, বহমান জীবনের মধ্য থেকে লেখকের অনুভূতি একটি বিশিষ্ট প্রতীতিকে আহরণ করে নেবে— সেটা তার নিজস্ব দর্শন বা আদর্শের অনুকূল হতে পারে, প্রতিকূলও হতে পারে, হয় তার মধ্যে লেখক একটি কাঙ্ক্ষিত সত্যকে আবিস্কার করবেন অথবা তার অর্ন্তনিহিত একটি মিথ্যাকে নির্দেশ করে দেবেন।

তৃতীয়ত, ছোটগল্প পড়তে গিয়ে আমরা লেখকের ব্যক্তিত্বেরই একটা পরিস্রুত রূপ দেখতে পাব, লাভ করব লেখকের চরিত্র ও মানসিকতার অনুযায়ী এক অপূর্ব সংবেদনা — সেটি লেখকের সত্তারই প্রতীক, গল্পের স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজেকে অভিব্যক্ত—সম্প্রসারিত করবেন — **'Project himself'.**

তাহলে ছোট গল্প হল একমুখী — তার একটিমাত্র সামগ্রিক বক্তব্য।

এই বক্তব্য সে আহরণ করবে চারদিকের জীবন থেকে, গতিশীল প্রাণ প্রবাহের ভিতর থেকে একটি সত্য বিদ্যুদ্বিকাশের মতো আবির্ভূত হবে তার কাছে—লেখকের দর্শন সেই চকিত উপলব্ধির মধ্যে নিজের সমর্থন পেতে পারে, বিরোধিতাও পেতে পারে।

আর ছোট গল্প হল লেখকের ব্যক্তিত্বেরই এক-একটি অভিব্যক্তি। নিজের সমাজ-পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী ছোটগল্পের লেখক যে প্রতীতি জীবন থেকে গ্রহণ করবেন, তারাই তাঁর রচনায় ধরা দেবে। ছোটগল্প লেখকের ব্যক্তিত্বেরই বিচিত্র-রঞ্জিত বিকাশ।"[৮]

ছোটগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী ভূদেব চৌধুরী তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন। সেগুলি হল —

১) "প্রথমত, অপার -বিস্তৃত রহস্য-জটিল আধুনিক জীবন - ভূমি, যার প্রতি মুহূর্তে - প্রতিবিন্দুতে, জমে আছে অতলান্ত রহস্য-গভীরতা। তার যে কোনো একটি বিন্দুর গহনে তলিয়ে জীবনের একটি অখণ্ড ছায়ারূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

২) ছোটগল্পের দ্বিতীয় উপাদান শিল্পি-ব্যক্তির ঘন-নিবিড় অনুভব - তন্ময়তা,— চলমান জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানিজনোচিত আত্মস্থতা। সেই সুস্থির চেতনার মুকুরে জীবনের যে-কোন মুহূর্ত যেন পূর্ণ জীবনের ছায়া ফেলতে পারে।

৩) তৃতীয়, চাই রচনার ব্যঞ্জনাধর্মীতা। যেন একটি জীবনের বিশেষ মুহূর্তের অবস্থান, অভিঘাত বা আবেগ সর্ব-দেশ-কালের জীবন ভূমিতে উৎক্রমণ (Transcend) করতে পারে।"[৯]

বস্তুতপক্ষে, ছোটগল্পের উক্ত বৈশিষ্ট্য, উপাদান ও সংজ্ঞার মধ্যে লুকিয়ে আছে ছোটগল্পের প্রাণবীজ। সীমাবদ্ধ জীবনের ক্ষণবৃন্তে অনন্ত জীবনের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলাতেই ছোটগল্পের রূপশৈলীর বিশিষ্টতা এবং স্বাতন্ত্র্যতা।

শিল্প শিল্পী নিরপেক্ষ নয়, সৃষ্টি স্রষ্টা নিরপেক্ষ নয়। স্রষ্টা তাঁর প্রত্যেক সৃষ্টিতেই কোন না কোন ভাবে নিজেকে মিশিয়ে দেন। আর ছোটগল্প যেহেতু **'Perfect Opportunity to project himself'**, সেহেতু শিল্পী যে তাতে নিজেকে অঙ্গীভূত করবেন তা বলাই বাহুল্য। বস্তুতপক্ষে প্রত্যেক লেখক, এমনকি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অগণিত সত্তা (Multipersonality) বিরাজমান। তাই প্রত্যেকটি গল্পের নায়ক নায়িকা বা পার্শ্বচরিত্র লেখকরই বহুরূপী অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই একজন লেখক যতচরিত্র বা যত রকম ঘটনাই আবিস্কার করুন না কেন, তার প্রতিটি চরিত্রই তাঁরই নিজস্ব ভাবনা অনুযায়ী রূপ লাভ করে এবং প্রতিটি ঘটনা একন্তভাবে তাঁরই দৃষ্টিকোন থেকে (Perspective) দেখা হয়। বস্তুতপক্ষে **'লেখকের নিজস্ব শিল্পিব্যক্তিত্ব, গল্পের কন্টেন্ট ও গল্পের 'ফর্ম' এক নিগূঢ় অনিবার্য মেলবন্ধনে আবদ্ধ।'**[১০] তাই কোন লেখকের রচনার শিল্প সার্থকতা বিচারে বিষয় ও বিষয়ীর স্বরূপ সন্ধান অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ কথাগুলি বনফুলের ছোটগল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমান ভাবে প্রযোজ্য।

এই অধ্যায়ে বনফুল তাঁর ছোটগল্পগুলিকে কখনো কোন এক আপাত অনির্দেশ্য রহস্যের সৃষ্টি করে মূল কাহিনীর দিকে এগিয়ে গেছেন, মিতবাক্যে, অপ্রয়োজনীয় উপকরণগুলি যথাসম্ভব বাদ দিয়ে বর্ণিতব্য বিষয়কে জ্যা-মুক্ত তীরের গতিতে কত সংহত, সংযত, সংক্ষিপ্ত পরিসরে, কখনো সরল প্রকরণে, কখনো বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশে প্রগাঢ় ব্যঞ্জনায় বক্তব্যকে প্রকাশ করে যেভাবে এক একটি গল্পে স্বর্ণসুষমা সৃষ্টি করেছেন, এই অধ্যায়ে বনফুলের সেই **'বিশেষ ধরনের'** সৃষ্টি কতটা শিল্প সার্থক হয়ে উঠেছে তা আলোচনা করা হবে।

কোন একটি ছোটগল্পের শিল্প সার্থকতা বিশ্লেষণে কিভাবে অগ্রসর হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি সুচিন্তিত সূত্র নির্দেশ করেছেন।[১১] তিনি ছ'টি সূত্রের কথা বলেছেন। সেগুলি হল —

১) গল্পটির শ্রেণী নির্ণয়।

২) গল্পটির মধ্যে একটি মাত্র **'মহামুহূর্ত'** বা **'চরমক্ষণ'** (Climax) সৃষ্টি করা হয়েছে কিনা; গল্পটি ঘটনাশ্রয়ী হোক, কোন বিশেষ ভাবের পরিবাহক হোক, বা কোন চরিত্রের প্রকাশমূলকই হোক — সেটি উপযুক্ত তীব্রতা গভীরতা লাভ করেছে কিনা।

৩) ভাবের একমুখিতা রক্ষা হয়েছে কিনা এবং অনাবশ্যক অতিবিস্তার করা হয়েছে কিনা, আখ্যায়িকা বা বৃত্তান্তের প্রবণতা লেখাটির সার্থক ছোটগল্প হওয়ার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে কিনা।

৪) প্রকাশ ভঙ্গির মধ্যে বিবৃতিমূলকতার চাইতে পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতা (Indirect Suggestiveness) - ই প্রাধান্যলাভ করেছে কিনা; বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষার উপযোগ্যতা কতটা তা বিচার করতে হবে।

৫) দেশ, কাল ও জীবনদর্শনের দ্বারা গঠিত লেখকের ব্যক্তিত্ব তার মধ্যে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখতে হবে।

৬) সবশেষে নামকরণের যৌক্তিকতা বিচার করতে হবে।

এবারে বনফুলের **'ছোট'**, **'মাঝারি'** ও **'বড়'** আকৃতির কিছু গল্পের শিল্প সার্থকতা বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

প্রথমে **'ছোট'** আকৃতির গল্পের শিল্প সার্থকতা বিশ্লেষণে আমরা প্রবৃত্ত হব —

ঃঃ "নিমগাছ" গল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার ঃঃ

'নিমগাছ' গল্প প্রকাশিত হয় **'অদৃশ্যলোকে'** গল্প সংকলনে, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। ছোট-বড়-মাঝারি ২৯টি বাক্যে গল্পটি সমাপ্ত। বনফুলের বিবিধ-বিচিত্র গল্পমালায় এটি একটি বিশিষ্ট অণুগল্প হিসেবে স্বীকৃত।

আমি পূর্বেই বলেছি, বনফুলের অণুগল্প বা গল্পিকাগুলি বৃত্তান্তহীন বৃত্তান্ত। কেননা, এধরনের গল্পে প্রত্যক্ষত কোন আখ্যান নেই, আর যেটুকু আছে তা সংক্ষিপ্ত, সংযত, সংহত ভাবে তার বিস্তার ঘটেছে। বনফুলের অণুগল্পগুলি বেশির ভাগই ভাবকেন্দ্রিক। ভাবকেন্দ্রিক গল্পে প্রতীক-রূপকের ব্যবহারে গল্পকার তাঁর বক্তব্যকে ব্যঞ্জিত করেন। 'নিমগাছ' গল্পটিও একটি ভাবকেন্দ্রিক অণুগল্প। এগল্পে একটি মানুষকেন্দ্রিক ভাবকে কেন্দ্রে রেখে প্রকৃতির এক বিশেষ গাছ নিমগাছের বর্ণনার পর মানব জীবনের কাহিনীকে তার সঙ্গেএকাত্ম করে দিয়েছেন।

ভাব কেন্দ্রিক গল্পের **'চরমক্ষণ'** বা **'মহামুহূর্ত'** (Climax) নির্ণয় একটু অসুবিধে। তবু ভাববিস্তারের ধর্মে তা বেশ বোঝা যায়। নিমগাছ গল্পের মহা-মুহূর্ত (Climax) ধরা পরে কবির প্রসঙ্গে। নিমগাছটির ডাল, পাতা, ছাল সকলে স্বাস্থ্যের জন্য যখন ছাড়িয়ে নিতে ব্যস্ত তখন **'হঠাৎ একদিন একটা নতুন ধরনের লোক এল।'** যে ছাল তুলল না, পাতা ছিঁড়ল না, ডাল ভাঙল না। শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে নিমগাছটির দিকে চেয়ে থাকল। **'খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।'** তিনি কবিরাজ নন, কবি। অত্যাচারিত নিমগাছটির আত্যন্তিক মুক্তির আকুতিতে পূর্ণ এর পরের বাক্যটিই গল্পের চরমক্ষণ বা Climax — **'নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়।'** এর পর গল্পের Falling Action। কিন্তু নিমগাছটি যেতে পারল না। কারণ, **'মাটির ভিতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে।'** তারপর গল্পের শেষ বাক্য — **'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এক দশা।'** — এই বাক্য যোজনা করার সঙ্গে সঙ্গে গল্পটি বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয়। তখন নিমগাছ আর নিমগাছ হয়ে থাকেনা, বৃহত্তর জীবনসত্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়ে।

'নিমগাছ' গল্পের ভাব বা বিষয় একটি-ই। তা হল পাশের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার করুণ চিত্র অঙ্কন। কিন্তু গল্পের শুরু থেকে নিমগাছের বর্ণনায় পূর্ণ থাকলেও শেষ বাক্যটি সংযোজনের পরই নিমগাছের উপর অত্যাচারের তীব্রতা বা গভীরতা বহুগুণিত হয়ে প্রকাশ পায়।

'নিমগাছ' গল্পে ভাবের একমুখীনতা লক্ষ্য করার মতো। গল্পের শুরু থেকে গল্পকার নিমগাছের কষ্টকর জীবন কথা বর্ণনা করতে করতে প্রবেশ করলেন কবির জগতে, কবি এসে কবির দৃষ্টিতে নিমগাছটিকে দেখলেন এবং চলে গেলেন। নিমগাছটিরও কবির সঙ্গে চলে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারল না, কারণ মাটির ভেতর তার শেকড় বহুদূর প্রসারিত হয়ে গেছে। তাই আবর্জনার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকল। এই বর্ণনায় এতটুকু বৃত্তান্ত নেই, অতিশায়িতা নেই, একেবারে নির্মেদ বর্ণনা। তারপর শেষ বাক্যে জুড়ে গল্পটিতে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেন বনফুল। অনুগল্পের শেষেই চোখ ধাঁধানো চমক থাকে, যা সমগ্র গল্পের ভাব সংহতি রক্ষা করে। এ গল্পেও ঐ শেষ বাক্যটি গল্পের একমুখী ভাব সংহতি রক্ষা করেছে এবং গল্পে সর্বায়ব মানবিক আবহ সৃষ্টি করেছে।

'নিমগাছ' গল্পটি আকারে যেন গদ্যকবিতা, কিন্তু প্রকারে অণুগল্প – 'ছোট'গল্প। চরণগুলিকে বনফুল কবিতার আকারে বাহ্যত সাজালেও কবি ও গৃহবধূর প্রসঙ্গে তা গল্পের জগতে পদার্পন করেছে। এগল্পে বিবৃতি মূলকতার চাইতে পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতাই (Indirect Suggestiveness) প্রাধান্য লাভ করেছে। গোটা গল্পে লেখক যে বিবৃতি দিয়েছেন নিমগাছের তা গৌণ হয়ে মুখ্য হয়ে উঠেছে গৃহকর্ম- নিপুণা লক্ষ্মী বউটির অত্যাচারিত, অবহেলিত জীবনকথা। তখন নিমগাছ আর নিমগাছ হয়ে থাকে নি, মানব জীবনের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছে।

বনফুল এগল্পের বিষয় অনুযায়ী গল্পের ভাষাশরীর নির্মাণ করেছেন। নিমগাছের উপকারিতা সম্পর্কে যে যা ভাবে সেভাবে তার ভাবরূপ দিয়েছেন। কবিরাজ সেভাবে ভাবে কবি যেভাবে জীবনকে ভাবেনা। তাই কবিরাজ যেখানে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যস্ত, সেখানে কবি **"মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙলে না, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।**

বলে উঠল, — বাঃ, কি সুন্দর পাতাগুলি . . . কি রূপ! থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার . . . এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাঃ —" এমন একজন কবিই ভাবতে পারেন, কবিই বলতে পারেন। এযেন বনফুলের কবি সত্তারই একখণ্ড প্রকাশ।

গল্পটির নাম বনফুল 'নিমগাছ' রেখেছেন। বিষয়ের সঙ্গে দেখতে গেলে নামটি যথার্থ নয়, কেননা, নিমগাছের কথা থাকলেও আদতে গল্পটি নিমগাছের কোন আত্মকথা নয়, কিন্তু প্রতীকী অর্থে নামকরণ শিল্পসার্থক। কেননা, নিমগাছকে লক্ষ্যে রেখে কাহিনী বর্ণিত হলেও শেষ বাক্যটি সংযোজনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পটিতে নিমগাছ আর **'ওদের বাড়ির গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটা'**এক হয়ে গেছে। নিমগাছ যেন বধূর প্রতীক আর বধূ যেন ঐ নিমগাছেরই প্রতীক। তাই প্রতীকধর্মী এই নামকরণ সার্থক মণ্ডিত হয়েছে।

তাই সমস্ত দিক বিচার করে **'নিমগাছ'** গল্পটিকে একটি শিল্প সার্থক ভাবকেন্দ্রিক প্রতীকী ছোটগল্প হিসেবে গ্রহণ করতে আপত্তি থাকে না আমাদের।

ঃঃ "বুধ্‌নী" গল্পের শিল্পসার্থকতা বিচার ঃঃ

'বুধ্‌নী' গল্পটি ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে **'বনফুলের গল্প'** সংকলনে প্রকাশিত। গল্পটি একান্নটি বাক্যে, ছোট ছোট ছ'টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত একটি বিশিষ্ট অণুগল্প। **'বনফুলের গল্প'** সংকলনটিই বনফুলের প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ছোটগল্প সংকলন। এই সংকলনের ভূমিকায় বনফুল লেখকের ভূমিকা অংশে লিখেছেন—— **"যাঁহারা আমার লেখার সহিত পরিচিত নহেন তাঁহারা গল্পগুলি পড়িলেই আমার স্বরূপ জানিতে পারিবেন।"**[১২] লেখকের এই নিবেদনাংশ থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, বনফুল অনুগল্পের শৈলী সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করাতে চেয়েছিলেন। কত সংযত, সংহত ভাষায় বৃহতের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা যায় বনফুলের গল্প তাঁর প্রমান। এক্ষেত্রে তিনি পথ প্রদর্শক। যদিও ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের **'লিপিকা'**-য় এই ধরনের কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। তবু বনফুল এধরনের গল্প রচনায় **'বিস্ময়কর মৌলিকতা'** দেখিয়েছেন।

'বনফুলের গল্প' ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও গল্পগুলির রচনাকাল বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল —— যখন বনফুল মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু সময় পেতেন বিদ্যুৎবেগে সে সময়ের মধ্যে এক-দেড়-দু'পাতার এক-একটি গল্প লিখে ফেলতেন। এতথ্য আমরা তাঁর **'পশ্চাৎপট'** গ্রন্থে পাই। তাই স্বল্প সময়ে সম্পর্কে রূপ দিতে গেলে কাহিনীর সংক্ষিপ্তি, সংহতি, দ্রুততা আসতে বাধ্য। আর বনফুল সেটিকেই একটি 'আর্টফর্ম' হিসেবে বেছে নিলেন এবং তাতে স্বকীয়তাও দেখালেন।

'বুধ্‌নী' বনফুলের চরিত্রকেন্দ্রিক প্রেম-মনস্তত্ত্ব বিষয়ক এটি অসামান্য অণুগল্প। এগল্পের নায়ক বিল্টুকে কেন্দ্র করে আখ্যান বর্ণিত হয়েছে এবং তার সূত্র ধরে বুধ্‌নীর প্রসঙ্গ এসেছে। বিল্টুর আগামীকাল ফাঁসি। ফাঁসির পূর্বের দিন লেখক জেলখানায় গিয়ে দেখলেন মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিল্টু **'বুধ্‌নী——বুধ্‌নী——বুধ্‌নী'** করে চিৎকার করে চলেছে। ভগবানের নামটি পর্যন্ত একবারও উচ্চারণ করেনি। হাজারীবাগের পার্বত্য প্রদেশে বিল্টুর বাস। সেই পার্বত্য এলাকাতেই ধনুকধারী বিল্টুর শিকার করতে করতে মহুয়া গাছের তলায় দেখা **'নিকষ কালো - কৃষাঙ্গী কিশোরী'** বুধ্‌নী তাকে দেখে বিল্টু প্রেমে উন্মাদ। বন্য পশুর মত সে বুধ্‌নীকে তাড়া করত, ত্রস্ত হরিণীর মত পালিয়ে ক্ষণিক নিস্তার পেত বুধ্‌নী। কিন্তু বিল্টু কিছুতেই তার পিছু ছাড়ে না। অবশেষে একদিন বিল্টু তাদের প্রচলিত প্রথায় প্রাণ সংশয় বাজিতে জিতে বুধ্‌নীকে বিবাহ করে ঘরে আনে। দু'বছর ধরে বিল্টু আদিম প্রেম- ভাবনার তাড়নায় **'বুধ্‌নীকে একদণ্ড ছাড়ে না। এক দণ্ডও না।' 'সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে গেল।'** বুধ্‌নী মাতৃত্বে পদার্পণ করল এবং একটি সন্তান প্রসব করল। বুধ্‌নী তখন মাতৃত্বের কল্যাণী আদর্শে শিশু সন্তান কেন্দ্রিক হয়ে পড়ল। বিল্টুর তা 'অসহ্য'

হয়ে উঠল। বিল্টু বুঝল বুধ্নী আর তার একার নেই। অসহনীয় হিংসায়, রাগে, প্রেমের উন্মাদনায় শিশু সন্তানকে সে হত্যা করে বসল। তারই শাস্তি স্বরূপ বিল্টুর ফাঁসি।

গল্পের এই আখ্যান বিন্যাসে বনফুল এতটুকু খামতি রাখেন নি। অণুগল্প হলেও এটিকে তিনি পূর্ণরূপ দিয়েছেন। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক রুদ্ধশ্বাস জম-জমাট নাটকীয় বিন্যাস গল্পটিকে একটি সার্থক অণুগল্প হিসেবে চিহ্নিত করেছে। গল্পে কাহিনীর এতটুকু অসংলগ্নতা নেই। জ্যা-মুক্ত তীরের গতিতে কাহিনী পরিণতির পথে এগিয়েছে। গল্পের চরিত্র সংখ্যাও কম।

গল্পটির Climax চূড়ান্ত রূপ পায় যখন বিল্টু ও বুধনীর আদিম সহজ সুন্দর জীবনে **'সহসা একটা বিপর্যয় ঘটিয়ে গেল।'** বুধ্নীর সন্তান প্রসব, তাকে ঘিরে বুধনীর মাতৃত্বের স্বপ্নজাল রচনা ও বিল্টুর প্রতি বুধনীর অমনোযোগিতা সেই **'মহামুহূর্তকে'** ব্যঞ্জিত করেছে — **"বিল্টু দেখিল একি! বুধনীকে দখল করিয়া বসিয়াছে এই শিশুটা! বুধনী তো তাহার আর একার নাই! অসহ্য!"**- গল্পের এখানেই Climax - এর চূড়ান্ত পরিণতি । এর পর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে গল্পের Falling Action বা অন্যভাবে বলা যায় রসমোক্ষণ (Cathersis) শুরু। বিল্টুর সন্তান হত্যার জন্য ফাঁসির নির্দেশ। কিন্তু নায়ক বিল্টু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত শুধু **'বুধ্নী – বুধ্নী-বুধ্নী'** বলে চিৎকার করে গেছে, **'ভগবানের নামটা পর্যন্ত করিল না।'**

আসলে বিল্টু একনিষ্ঠ প্রেমিক। প্রেমিক বিল্টু তার প্রেয়সী বুধ্নীকে একান্ত নিজের করে রাখতে চেয়েছিল। সে প্রেমের অধিকার বোধে বুধ্নীর তার প্রতি অমনোযোগিতাকে সহ্য করতে পারেনি। আসলে বন্যদের কাছে মাতৃত্ব নয়, প্রেমের অধিকার বোধই বড়। সেই অধিকার বোধে বিল্টু তার ও বুধ্নীর মাঝখানে তৃতীয় কাউকে সহ্য করতে পারেনি। হোকনা সে আত্মজ। তাই নিজ সন্তানকে হত্যা করতেও তার বাধেনি। বুধ্নীর মাতৃত্বে উত্তরণের পর তার মধ্যে এক শাশ্বত জীবনবোধ কাজ করেছে। সে যে একজন 'মা' এই বোধ তার মধ্যে দানা বাধে। তাই সন্তান প্রসব করে **'বুধ্নীর সেকি আনন্দ।'** লেখকের কথায়, **"বর্বর জননীরও মাতৃত্ব আছে, তাহারও অন্তরে সন্তান-লিপ্সা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণ মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধনী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল।"** মাতৃত্বেই যে নারীত্বের পূর্ণমুক্তি একথা বুধ্নী বুঝলেও বিল্টু বোঝে না, এখানেই তার জীবনের ট্রাজিডি। ছোটগল্পের খণ্ড জীবনের মধ্যে অখণ্ড জীবনানুভূতি বুধ্নীর মধ্য দিয়েই প্রকাশিত। বুধ্নীকে বিল্টুর এই করুণ পরিণতির নিয়তি বলে মনে হলেও বিল্টুর আদিম জীবন চেতনাই এর জন্য দায়ী। তবে বিল্টুর ফাঁসি ঘটনাসঙ্গত হলেও শিল্প সঙ্গত নয় বলে মনে হয়। কেননা, গল্পের কাহিনীতে দেখা যায়, শিল্পী যেন জোরের সঙ্গেই বলেছেন — **"বিল্টুর জীবন-প্রদীপে তৈল পুরাই আছে, সলিতাও ঠিক আছে, শিখাও উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে। কিন্তু সে শিখা নিভিবে। একটি সবল ফুৎকারে তাহাকে নিবাইয়া দেওয়া হইবে।"** লেখকের এই উক্তি থেকেই বোঝা যায় বিল্টুর চরিত্রের অমোঘ নিয়তির বিধান যেন গল্পকারই দিয়েছেন।

সমগ্র গল্পটি প্রথম পুরুষে সর্বজ্ঞ বক্তায় বর্ণিত। গল্পে বর্ণিত লেখকের জীবনদর্শন অনুযায়ী ভাষা ও ভাবনা রূপায়িত হয়েছে। বনফুল সীমাহীন উন্মাদনাকে পছন্দ করেননি কোন দিন। নিয়তির অমোঘ বিধানে দণ্ডিত করেছেন তাকে। এ গল্পেও তাই বিল্টু দণ্ডিত হয়েছে। তবে সে দণ্ডদানে লেখকের সহানুভূতিও প্রচ্ছন্ন থাকে নি গল্পের শ্লেষগর্ভ শেষ বাক্যে — **"নৃশংস শিশু হত্যাকারীর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হইল না।"**

'বুধ্নী' গল্পের নামকরণ বিশ্লেষণে আমাদের মনে হয় সমগ্র গল্পে যার জীবনকথা প্রাধান্য পায়নি তার নামে নামকরণ করেছেন কেন বনফুল? আসলে গোটা গল্পে বিল্টুর জীবনকথা থাকলেও সেই জীবনের কেন্দ্রে অবস্থান বুধ্নীর, যে কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। গল্পের কাহিনীতে তেমন বিস্তার না থাকলেও গল্পের ভাবশরীরে বুধ্নী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাইগল্পের **'বুধ্নী'** নামকরণ সঙ্গত হয়েছে বলেই মনে করি।

সমগ্র গল্পটি সংযত, সংহত ভাষায় অনুগল্পের চমৎকারী উপস্থাপনা রীতিতে একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প সার্থক রচনা হিসেবে পরিণত হয়েছে।

ঃঃ "ছোট লোক" গল্পের শিল্পসার্থকতা বিচার ঃঃ

"ছোটলোক" গল্পটি বনফুলের 'বিন্দু বিসর্গ' গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ। গল্পসংকলনের প্রকাশকালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটিত সমাজ পরিবর্তনের ছায়া এ সংকলনে যে পড়বে তা প্রত্যাশিত। এ সংকলনের এক একটি **'বিন্দুর'** মত 'ছোট'গল্পে বনফুল যেন **'বিসর্গ'** বা **'বিস্ময়'** উৎপাদন করেছেন। 'ছোটলোক' বিংশ শতাব্দীর সময়চেতনায় বিধৃত শ্রেণী দ্বন্দ্বের ভাবনাশ্রয়ী চরিত্রকেন্দ্রিক **'মিনিগল্প'**।

বনফুলের অন্যান্য 'ছোট'গল্পের মত এখানেও কোন **'টানা কাহিনী ও জোড়ালো ঘটনা'** নেই। থাকার কথাও নয়। কেননা, বনফুলের এই সব অণুগল্প বা মিনিগল্পের বৈশিষ্ট্যই হল সংযত, সংহত ভাষায় মেদভারবর্জিত কাহিনী বিন্যাসে, নাটকীয় চমকে জীবনের এক চরমসত্য উদ্ভাসিত করা। মাত্র ছেচল্লিসটি ছোট-মাঝারি-বড় বাক্যে গল্পটি রচিত।

এগল্পের কাহিনী একটি-ই এবং তার গতি একমুখী। তবে কাহিনীটিকে রাঘব সরকার প্রথমে বয়ে নিয়ে গেলেও শেষে রিকশা ওয়ালাটিই কাহিনীর ভারবহণ করেছে এবং বনফুলের জীবনদর্শন পরিস্ফূটনে সহায়তা করেছে। রাঘব সরকার সদা উন্নত মস্তক, নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা

করে ছাতাহীন মাথায় গায়ে খদ্দর পরিধানে পায়ে কন্টকসঙ্কুল জুতো পড়ে দ্রুত হেঁটে চলেছেন। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, কিন্তু কারও দ্বারা উপকৃত হন না, নিজের মস্তক সর্বদা উন্নত রাখাই তাঁর জীবন সাধনা। এহেন রাঘব সরকারের সেই নিদারুণ রৌদ্র দগ্ধ দ্বিপ্রহরে এক রিক্‌শাওয়ালা পিছু নেয়, বলে **'রিক্‌শা চাই বাবু, রিকশা?'** রাঘব সরকার পিছনে ফিরে অস্থিচর্মসার রিক্‌শাওয়ালাটিকে খদ্দরি আস্তিনে ঘাম মুছতে মুছতে জানিয়ে দেন যে তার রিক্‌শার প্রয়োজন নেই। কিন্তু পরক্ষণেই **'হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার'** হওয়ায় ছ'পয়সায় শিবতলা পর্যন্ত ভাড়া ঠিক হয়। ভাড়া ঠিক হলেও রাঘব সরকার কিন্তু রিক্‌শায় চড়লেন না রিক্‌শার আগে আগে হেঁটে চললেন। রিক্‌শাওয়ালাটি চড়তে অনুরোধ করলেও রাঘববাবু বলেছেন "আয় না"। এরপর শিবতলা পৌছুঁতেই কাহিনীর ভার রিক্‌শাওয়ালা গ্রহণ করে। শিবতলা পৌঁছে রাঘব সরকার রিক্‌শাওয়ালাকে প্রাপ্য পয়সা মিটিয়ে দিতে গেলে রিক্‌শাওয়ালাটি বলে, **'আপনি চড়লেন কই?'** রাঘব সরকার উত্তর দেয় যে তিনি রিক্‌শায় চড়েন না কারণ তার ধারনায় **'রিক্‌শা চড়া পাপ।'** তারপর রিক্‌শাওয়ালাটি বলে **'ও? তা আগেই বলতে পারতেন।'** এই বলে সে চলতে শুরু করে। রাঘব সরকার বলেন, **'পয়সা নিয়ে যা।'** রিক্‌শাওয়ালার উত্তর – **'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।'** এই বলে ঠুনঠুন করে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে পথের বাঁকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। অত্যন্ত নিরাভরণ এই কাহিনীই বিদ্যুৎবিকাশের মত ছুটে চলেছে শুরু থেকে শেষের অভিলক্ষ্যে। বনফুলকে যেন কাহিনীর জন্য ভাবতে হয় নি। রাঘব সরকার ও রিক্‌শাওয়ালার সাক্ষাতের পর কাহিনী আপনা আপনি গতিলাভ করেছে। বাহ্যত দেখতে গেলে এগল্পের নীতি নির্ধারিত কোন প্লট নেই। এর প্লট আমাদের অনুসন্ধান করতে হয় চরিত্র দুটির জীবনাদর্শের মধ্যে। এই গল্পের Climax সৃষ্টিতে ভিন্ন গোত্রের চরিত্রদুটির মানব ধর্মই সহায়ক হয়েছে। রাঘব সরকারের **'হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হওয়া'** গল্পে rising action শুরু, তা **'রিকশা চড়া পাপ'** পর্যন্ত বিস্তৃত। তারপর গল্পের **'চরমক্ষণের'** দিকে যাত্রা যখন রিক্‌শাওয়ালাটি **'প্যাসিভ'** থেকে **'অ্যাকটিভ'** হয় — **'ও? তা আগেই বলতে পারতেন।' 'লোকটার চোখে মুখে অবজ্ঞার ভাব মূর্ত হইয়া উঠিল। সে ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিয়া দিল।'** রাঘব সরকার **'পয়সাটা নিয়ে যা'** বলতেই গল্পের সেই Climax বাক্য উচ্চারণ করলেন রিকশাওয়ালাটি — **'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।'** তার গল্পের Falling Action ও Catastroehae - **'ঠুনঠুন করিয়া ঘন্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।'** এর পরই আমাদের মনে ভাবের অনুরণন চলতে থাকে। শেষ হলেও যেন **'হইল না শেষ।'** আমরা ভাবতে বাধ্য হই প্রকৃত ছোটলোক বা বড়লোক কে?

গল্পটির গঠনেও বনফুলের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটির প্রথম থেকে শেষের আগে পর্যন্ত রাঘব সরকার সকর্মকর্তা আর শেষে রিক্‌শাওয়ালাটি সকর্মকর্তা। প্রথমে রাঘব সরকার উন্নতমস্তক হলেও শেষে অবনতমস্তক, আর রিক্‌শাওয়ালাটি প্রথমে অবনতমস্তক থাকলেও শেষে উন্নতমস্তক। তাই গল্পটির কাহিনী ও প্লটের দু'টি অংশ— রাঘব সরকার প্রসঙ্গ ও রিক্‌শাওয়ালা

প্রসঙ্গ। রাঘব সরকারকে বনফুল গল্পের কেন্দ্রে রাখেন নি, রেখেছেন রিক্‌শাওয়ালাকে। আর তার সহায়ক প্রধান চরিত্ররূপে রাঘব সরকারের অবস্থান। তাই কাহিনী নয়, চরিত্রকে দিয়ে গল্পের কায়া গঠন করেছেন বনফুল। তাই **'ছোটলোক'** গল্পের কাহিনী নির্মাণ, বৃত্তগঠন, চরিত্র ব্যাখ্যা ও পরিণতি বিশিষ্ট শিল্প সৃষ্ঠির স্বাক্ষর বহন করে।

এগল্পে রাঘব সরকার চরিত্রটি বুর্জোয়া মানসিকতায় পুষ্ট ও পরিবর্ধিত চরিত্র। সে মধ্যবিত্তের ঠুনকো আদর্শবোধ নিয়ে চলে। তাই রিকশায় চড়াকে **'পাপ'** মনে করে। আবার অস্থিচর্মসার দুর্দশাগ্রস্থ লোকদের দেখলে **'হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার'** হয়। তিনি **'ধনিকবাদ', 'বলশেভিজম', 'ডিভিশন অব লেবার', 'পল্লীগ্রামের দূরবস্তা', 'জমিদারী'** প্রভৃতি নিয়ে ভাবেন। তাঁর এই মহতী ভাবনা বৃহত্তর মানবিকতা বোধসঞ্জাত কিন্তু অতি আইডিয়ালিজম্ চরিত্রটির বাস্তবতাকে ক্ষুন্ন করেছে। রাঘব সরকার রিক্‌শায় চড়ে ভাড়া মিটিয়ে দিলে মহৎএকটি মানুষে পরিণত হতে পারতেন। কিন্তু বনফুল তো তা এগল্পে দেখাতে চাননি। বিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রভাবে শ্রমিক শ্রেণীরাও যে তাদের ব্যক্তিত্বের, আত্মমর্যাদার মাপকাঠিতে মাপতে শুরু করেছিলেন, এগল্পে সে সত্যকে বনফুল রূপ দিয়েছেন। রাঘব সরকার চরিত্রটির মধ্যে বিবর্তন নেই, সে Type চরিত্র, আর রিক্‌শাওয়ালাটি বিবর্তনধর্মী চরিত্র। তাই রিক্‌শাওয়ালা চরিত্রটি রাঘব সরকারের চাইতে অনেক বেশি জীবন্ত ও বাস্তব বলে মনে হয়। রিক্‌শাওয়ালা চরিত্রের এই বিবর্তনের জন্যই গল্পে পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতা (Indirect Suggestiveness) প্রাধান্য লাভ করেছে।

এগল্পে বনফুল চরিত্রানুযায়ী ভাষা প্রয়োগ করেছেন যাতে চরিত্রগুলির মন – মানসিকতাকেও বোঝা যায়। রাঘব সরকার যে একজন বুর্জোয়া গোষ্ঠীর রোমান্টিক আদর্শবাদী টিপিক্যাল চরিত্র, তা তাঁর কথা-বার্তায় বোঝা যায়। রিক্‌শাওয়ালাটিকে তিনি 'তুই' সম্বোধনে কথা বলেছেন — **'ক পয়সা নিবি', 'আচ্ছা আয়', 'তুই আয় না', 'এই নে', 'পয়সাটা নিয়ে যা'**। সর্বহারা শোষিত বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব রাঘব সরকারের ভাষা প্রয়োগে সুস্পষ্ট। আর রিক্‌শাওয়ালাটি শ্রমিক শ্রেণীর হলেও তার মধ্যে যে সম্ভ্রমবোধ আছে তা রাঘব সরকারকে 'আপনি', 'বাবু' সম্বোধনে বোঝা যায় — **'আসুন বাবু চড়ুন', 'আপনি চড়লেন কই?', 'তা আগেই বলতে পারতেন।'** গল্পের চরিত্র ও ভাববস্তু অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ বনফুলের শিল্প-সৃষ্টির একটি বিশেষ কৃতিত্ব, যা এ গল্পেও লক্ষ্য করা যায়।

গল্পটিতে গল্পব্যাখ্যর প্রয়োজনে লেখক দু'বার অবতীর্ণ হয়েছেন — এক, গল্পের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাঘব সরকারের চরিত্রকে বোঝানোর জন্য। দুই, নিজেই যখন পাঠকদের জানাচ্ছেন — **'মাঝে মাঝে কেবল নিম্নলিখিতরূপ বাক্য বিনিময় হইতেছে।'** তখন মিনিগল্পের স্বল্পায়তনে লেখকের সচেতন ও সতর্ক ভূমিকা টুকুই তিনি পালন করেছেন মাত্র এবং রাঘব সরকার ও রিক্‌শাওয়ালার কথাবার্তায় শেষ ছেদ টেনেছেন তিনি।

এ গল্পের শেষ বাক্যটি অনেকের কাছে **'না হলেও চলত'** মনে হতে পারে। কিন্তু বনফুলের গল্পে প্রত্যেকটি বাক্য এবং প্রত্যেকটি শব্দ সুনির্বাচিত। তাই শেষ বাক্যটির প্রয়োগও বিশেষ

তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এই শেষ বাক্যটির প্রয়োগেই গল্পে চরিত্রদুটির মধ্যে এবং কেন্দ্রিয় ভাবে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে। কেননা **'আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না'** — এই কথাটি বলার পর রিক্‌শাওয়ালাটি যখন ঠুন্‌ঠুন্ করে ঘন্টা বাজাতে বাজাতে গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন রাঘব ঘরকারের প্রতি তার অবজ্ঞার, উপেক্ষার উদাসীনতার ভাবটি বেশি প্রকট হয়েছে। তাই গল্পের তাৎপর্য বিস্তারে বাক্যটি অপরিহার্য।

বনফুল এগল্পের নামকরণ ব্যঞ্জনাধর্মীতার দিক থেকে রেখেছেন। **'ছোটলোক'** নামকরণে একটি বিশেষ শ্রেণীকেই নির্দেশ করে। আবার সেই **'ছোটলোক'** বলতে আমরা কাকে বলব সেই প্রশ্নও আসে। শিক্ষা-দীক্ষায়, জীবনাচারনে উন্নত হলেই কি তাকে **'বড়লোক'** বলা যায়? বা বৃত্তিতে শ্রমিক বা নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত-অমার্জিত হলেই কি তাকে **'ছোট লোক'** বলা যায়? আসলে মানুষ ছোট না বড় তা শিক্ষা দীক্ষা, জীবনাচারন, পোশাক-আশাকে নির্দেশিত হয় না, তা নির্দেশিত হয় ব্যবহারে, কথাবার্তায়, চিন্তাভাবনায়, আত্মমর্যাদাবোধে, মানবিকতাবোধে। এ গল্পে রাঘব সরকারের ভাবনা-চিন্তা যতই উন্নত হোক না কেন, তাকে ছাপিয়ে আত্মমর্যাদাবোধে উন্নতস্তরে উন্নীত হয়েছে রিক্‌শাওয়ালাটি। তাই গল্পের শেষে এ প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে প্রকৃত ছোটলোক কে? রাঘব সরকার না রিক্‌শাওয়ালাটি? রাঘব সরকারই যে এখানে ছোটলোকে পরিণত হয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। গল্পের এই ভাবাশ্রয়ী ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ শিল্পগুণ সমৃদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই।

এই ভাবে গল্পের সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণে 'ছোটলোক' গল্পটিকে একটি শিল্প-সার্থক ছোটগল্প হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

ঃঃ "ক্যান্‌ভাসার" গল্পের শিল্পসার্থকতা বিচার ঃঃ

"ক্যান্‌ভাসার" গল্পটি বনফুলের ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত **'বনফুলের আরো গল্প'** সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটি তিয়াত্তরটি বাক্যে, পাঁচশো ছিয়াত্তরটি শব্দে গ্রন্থিত।

"ক্যান্‌ভাসার" গল্পের মূল বিষয় — বিক্রেতার চাতুর্য কৌশল(?)। তাই গল্পটি কোন ব্যক্তির নামে নামাঙ্কিত না হয়ে শ্রেণী চরিত্রকে নির্দেশ করেছে। ভৈরবের কাছে ছল – চাতুরীতে কথার বন্ধনে কিভাবে ক্যান্‌ভাসার হীরালাল তার মাজন বিক্রি করল তা শিল্পকুশলীভঙ্গিতে রচনা করেছেন বনফুল। গল্পটি শ্রেণীচরিত্রকেন্দ্রিক একটি শ্রেষ্ঠ **'ছোট'** গল্প।

"ক্যান্‌ভাসার" গল্প মেদবর্জিত একমুখী কাহিনী নির্ভর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি বাক্যও বনফুল ব্যবহার করেন নি। আঁট-সাঁট বাঁধনে অণুগল্পের ক্ষিপ্রগতিতে নাটকীয় চমকের মধ্য দিয়ে কাহিনী পরিণতির পথে এগিয়েছে। বনফুল গল্পের শুরুতেই বলে দিচ্ছেন **'কলহের মূল কারণ অবশ্য কাত্যায়নী।'** কাত্যায়নীর সঙ্গে অগ্নি স্ফুলিঙ্গবৎ বাক্য বিনিময়ের সময় যদি

ক্যান্‌ভাসার হীরালাল না আসত তবে এমন কাণ্ডটা ঘটত না। কাত্যায়নীর বহুদিন থেকে **'একটি শৌখিন শাড়ি কেনার শখ'**। কিন্তু বেকার যুবক ভৈরব অর্থাভাব প্রযুক্ত হওয়ায় স্ত্রীর সে সাধ মেটাতে অপরাগ। তাই তার স্ত্রী কাত্যায়নীও কটুকথা শোনাতে ছাড়েনা ভৈরবকে। উত্তেজিত ভৈরব স্ত্রীর কথার তীব্র ঝাঁঝ সহ্য করতে না পেরে একটি নিমের ডাল মটাস করে ভেঙে দাঁত মাজতে মাজতে স্নানে যায়। ঠিক সে সময় **'ওভারক্যারেড্'** হয়ে ক্যান্‌ভাসার হীরালাল দু'টো পয়সার জন্য সেই গ্রামে প্রবেশ করে তার মাজনের ক্যান্‌ভাসারি করতে। ঠিক গিয়ে হাজির হয় ভৈরবের সামনে এবং তাকে অনুরোধ করতে থাকে তার মাজন কেনার জন্য। উত্তেজিত ভৈরব ক্যানভাসার হীরালালকে গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। কারণ তার মতে এগুলি বুজরুকি ছাড়া আর কিছু নয়, কথার চটকে খারাপ জিনিসকে বিক্রি করাই তাদের উদ্দেশ্য। নাছোড় ক্যান্‌ভাসারের সঙ্গে ভৈরবের কথাবার্তা এমন পর্যায় চলে যায় যে **'ভৈরব ছুটির গিয়া হীরালালের গণ্ড দেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল।'** এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য এক কাণ্ড ঘটল তাহল, ক্যান্‌ভাসার হীরালালের দন্তপাটি ছিটকে বেরিয়ে এল। ভৈরব এরপর ক্যান্‌ভাসারের কালো কুচ্‌কুচে গোঁফ জোড়াটার দিকে তাকালে, ক্যান্‌ভাসার হেসে বিনয়ের সঙ্গে জানায় যে সেগুলিও নকল। তার কাছে আরো বলে ভাল কলপও আছে, তিনি নেবেন কিনা। তারপর ক্যান্‌ভাসার বলে — **"কেন মারধর করছেন মশাই? গরিব মানুষ-এই করে কষ্টে সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে —"** তারপর হতবম্ব নির্বাক ভৈরবের বাক্যস্ফূর্তি হলে সে এক কৌটা মাজন কিনে। আখ্যান অংশের এই বর্ণনায় এতটুকুও শ্লথতা নেই, দ্রুতগতিতে কাহিনী ঘটনাপরম্পরায় পরিণতির পথে এগিয়েছে। এই কাহিনী বর্ণনার মধ্যে **'মহামুহূর্ত'** সৃষ্ঠি হয়েছে যখন **'উত্তেজিত ভৈরব ছুটিয়া গিয়া হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিল।'** তার পর গল্পের Falling Action, যেখানে চতুর ক্যান্‌ভাসার হীরালাল কথার চাতুরী দিয়ে বাক্যজালে ভৈরবের চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে এবং ভৈরবের মনে বিবেকবোধকে উদ্বোধিত করেছে। তারপর গল্পের Catastrophae, যেখানে ভৈরব স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্যান্‌ভাসারের কথার জালে ফসকে এককৌটা মাজন কিনেছে।

আসলে ক্যান্‌ভাসারদের মানসিকতাই তাই। ছলে-বলে-কৌশলে নিজের জিনিস বিক্রি করা। ভৈরব উত্তেজিত হয়েছে, তাকে প্রচণ্ড চপেটাঘাতও করেছে, কিন্তু হীরালাল এতটুকুও উত্তেজিত হয়নি, কারণ তার উদ্দেশ্য — মাজন বিক্রি। কথার মার-প্যাঁচে তার দ্রব্য বিক্রি করাই একমাত্র কাজ। কারণ তার পেট চালাতে হবে, তার অন্নসংস্থানের সহায়ক আর কেউ নেই। ক্যান্‌ভাসার হীরালালের চপেটাঘাত খাবার পরও উত্তেজিত নাও হওয়ার আর একটি কারণ হতে পারে, সে বাইরের লোক, ভৈরব সে গ্রামেরই লোক। গ্রামের লোক প্রয়োজনে ভৈরবের পক্ষ নেবে, তার নয়। তাছাড়া ক্যান্‌ভাসার বৃদ্ধ, ভৈরব যুবক। তবে ভৈরবের ক্যান্‌ভাসারের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করা কারও কারও অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কিন্তু ভৈরব পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়াতেই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। ভৈরবের যেখানে স্ত্রীর শৌখিন শাড়ি কেনার সামর্থ নেই, গ্রাসাচ্ছাদন জোটানোই যেখানে

দুষ্কর, যে বিনে পয়সায় নিমের দাঁতনে প্রত্যহ দাঁত মাজে, যে ইতিপূর্বে স্ত্রীর ঝাঁঝালো মন্তব্যে বারুদবৎ হয়ে আছে, তার মধ্যে ক্যান্‌ভাসারের নাছোর-মনোভাব ও বাক্‌বিতণ্ডা এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঘটিয়েছে সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি ঘটনাই যেন অনিবার্য ভাবে কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত। ঘটনার এতটুকু বিচ্যুতি ঘটেনি। আর আমরা জানি, বনফুল তাঁর চরিত্রগুলিকে ঘটনার প্রেক্ষিতে ফেলে তাদের মানস প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। এখানেও ভৈরব ও ক্যান্‌ভাসার হীরালালকে এক জটিল পরিস্থিতিতে ফেলে তাদের গূঢ়-মানস প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন অত্যন্ত কুশলী শিল্পীর ভঙ্গিতে।

তবে এগল্পে ক্যান্‌ভাসার হীরালালের শ্রেণী-চরিত্র উন্মোচনের পাশাপাশি বনফুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বেকার মধ্যবিত্ত যুবক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্রটিও সুকৌশলে রূপ দিয়েছেন। এই পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতা গল্পটির ভাবশরীরে গাঢ়তা দিয়েছে।

এ গল্পের চরিত্র সংখ্যাও অল্প, মাত্র তিনটি —ভৈরব, কাত্যায়নী, ক্যান্‌ভাসার হীরালাল। তিনটি চরিত্রই লেখকের বক্তব্য উপযুক্তভাবে প্রকাশ করেছে এবং কাহিনীকে অণুগল্পের তীব্র গতিদান করেছে। কাত্যায়নী ভৈরবকে শাড়ি কিনে না দেওয়ার জন্য ভৎর্সনা করেছে, ভৎর্সিত ভৈরব উত্তেজিত হয়ে স্নানে গেছে, ঠিক সে সময় ক্যান্‌ভাসার হীরালাল এসে ঘটনাকে আরো তীব্রগতি দিয়ে পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছে। কাহিনী লেখক থেকে কাত্যায়নী, কাত্যায়নী থেকে ভৈরব এবং ভৈরব থেকে ক্যান্‌ভাসারের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। চরিত্রগুলি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। কাত্যায়নীর রেগে যাওয়াটা স্বাভাবিক, কেননা বহুদিন ধরে তার একটি শৌখিন শাড়ি কেনার শখ মেটাতে পারে নি ভৈরব। ভৈরবও অর্থাভাব প্রযুক্ত হওয়ায় সে শখ মেটাতে অপরাগ এবং স্ত্রীর কটুক্তিতে তার রেগে যাওয়াই স্বাভাবিক। আর ক্যান্‌ভাসারও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে বাক্যজালে ভৈরবকে বাঁধতে তৎপর। প্রত্যেকটি চরিত্রই তাদের মানস প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী ক্রিয়া করেছে। প্লটের এই নিখুঁত বিন্যাস বনফুলের শিল্পকুশলতাকেই প্রমান করে।

এ গল্পের বিষয়বস্তু ও চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন বনফুল। বর্ণনা অংশে কথ্য মেশানো সাধুগদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় আর প্রত্যক্ষ সংলাপে চলিতগদ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার যথার্থ হয়েছে। যে স্ত্রী দীর্ঘদিন একটি শৌখিন শাড়ি কিনতে পারেনি, তার মুখে — **"যার হাই তুলতে চোয়ালে খিল ধরে তার আবার বন্দুক ঘাড়ে করতে যাওয়া কেন? এক কড়ার মুরোদ নেই, বিয়ে করতে যাওয়া কেন?"** — এই ধরনের ভাষা সংলাপ উপযুক্ত হয়েছে। এছাড়া ভৈরবের ভাষাও তার চরিত্র ও পরিস্থিতির অনুগামী হয়েছে। উত্তেজিত ভৈরব যখন নিমের ডালে দাঁতন করছে তখন হীরালাল তার ভালো মাজনের ফিরিস্তি গাইলে সেই বিরক্ত ভৈরবের মুখে **'কচু'** ছাড়া আর কি বেরুতে পারে? এছাড়া **(i)'দুনিয়ার যত শৌখিন বাজে জিনিস জুটিয়ে এনে আপনারা দেশটাকে রসাতলে দিচ্ছেন।' (ii) 'তাতে আপনার কি?' (iii) 'বেরিয়ে যান এগাঁ থেকে।' (iv) 'গ্রাসাচ্ছাদন জোটানই দুষ্কর — দাঁতের মাজন!' (v) 'আপনার মত ঢের দেখেছি মিঞা' (vi) 'আচ্ছা দিন এক কৌটা মাজন।'** —প্রভৃতি সংলাপের ভাষা উপযুক্ত হয়েছে। ক্যান্‌ভাসার হীরালালও তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির

জন্য যে চাতুরীর সঙ্গে কথা বলেছে তাও যথাযথ হয়েছে। ভৈরবের সঙ্গে কথোপকথনে ক্যান্‌ভাসার যখন বলেছে — **(i) 'দেশে দন্তরোগেরও অভাব নেই।' (ii) 'আপনি কি এই গ্রামের মালিক?' (iii) 'গাঁ থেকে বার করে দেবার কে মশাই আপনি শুনি?' (iv) 'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাও। ভাল কলপও আমি রাখি। নেবেন?' (v) 'কেন মার – ধোর করছেন মশাই? গরিব মানুষ — এই করে কষ্টে – সৃষ্টে সংসার চালাই। বুড়ো বয়সে উপযুক্ত ছেলেটি মারা গেছে'** — প্রভৃতি সংলাপ চরিত্র অনুযায়ী, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ হয়েছে।

এগল্পে লেখকের জীবনদর্শনও সুচারু রূপে প্রকাশিত। উগ্র বিবিয়ানা, বিলাসিতা, বুজরুকি বনফুল পছন্দ করতেন না। ভৈরবের কথায় তার সমর্থন মেলে, এছাড়া লেখক যখন বিবৃতির সূত্রে বলেন **'এই সব জুয়াচোর গুলা দেশের যত অপরিণামদর্শী যুবক যুবতীকেই ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে।'**— তখন বনফুলের মন মানসিকতার পরিচয় এগল্পে কতটা প্রতিফলিত তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

'ক্যান্‌ভাসার' গল্পে হীরালালের যে বাক্ চাতুর্য লক্ষ্য করা যায় ক্যান্‌ভাসরিতে, তাতে সে যে একজন জাত– ক্যান্‌ভাসার তা স্পট। ক্যান্‌ভাসার হীরালালের ব্যক্তিচরিত্রের বৈশিষ্ট্য তাতে সুপরিস্ফূট। এ গল্পের নাম বনফুল হীরালালও রাখতে পারতেন, যে কষ্টেসৃষ্টে জীবন অতিবাহিত করছে। কিন্তু গল্পের নাম **'ক্যান্‌ভাসার'** রাখায় আমরা বুঝতে পারি বনফুলের ইঙ্গিত ক্যান্‌ভাসারি বৃত্তির দিকে। একজন ক্যান্‌ভাসারের কথার জ্বালে একজন ক্রেতা কিভাবে মুগ্ধ হয়ে বা ফেঁসে গিয়ে তার জিনিস কিনতে বাধ্য হয় সেদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন বনফুল। পাশাপাশি একথাও মনে হয় যে, আমরা বাহ্যত ক্যান্‌ভাসারকে যত জুয়াচোর, বুজরুক ভাবি, তারা ততটা জুয়াচোর নয়। পেটের তাগিদে তাদের এমন হতে হয়,হতে বাধ্য হয়। তাদের কথার ছল চাতুরী জীবিকা নির্বাহের পেছনে তাদের জীবনের কত করুণ কাহিনী থাকে তা হয়তো আমরা বুঝতেই পারি না। তাই বুড়ো বয়সে হীরালালকে ক্যান্‌ভাসারি করতে হয়। ভৈরব যদি হীরালালের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড চপেটাঘাত না করতো তা হলে হয়তো তার এই করুণ জীবনকাহিনী অনুক্তই থেকে যেত। তাই বনফুল যেন ক্যান্‌ভাসার হীরালালের করুণ জীবন কাহিনীতে সে কথা বোঝাতে চেয়েছেন। **'হীরালাল'** নামকরণ হলে তা হত ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ক্যান্‌ভাসার নামকরণ করায় তা হয়েছে শ্রেণীকেন্দ্রিক। এমন হয়ত কত হীরালাল আছে, যারা এ ভাবে ক্যান্‌ভাসারি করে জীবন নির্বাহ করে। তাই গল্পের নামকরণ বিষয় ও লক্ষ্যকে অতিক্রম করে বিশেষ শ্রেণীর জীবনকথাতে উন্নীত হওয়ায় যথার্থ হয়েছে বলতে হবে।

সমগ্র দিক বিচার-বিশ্লেষনে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি 'ক্যান্‌ভাসার' গল্পটি একটি শিল্পসার্থক রচনা।

ঃঃ "তাজমহল" গল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার ঃঃ

'তাজমহল' গল্পটি বনফুলের ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত **"অদৃশ্যলোকে"** গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত। **'অদৃশ্যলোকে'** নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে এ সংকলনের গল্পগুলি অলৌকিক শ্রেণীর রহস্যময় গল্প। এ সংকলনের **'অদৃশ্যলোকে', 'অবর্তমান', 'অধরা', 'প্রজাপতি', 'ছাত্র'** প্রভৃতি অলৌকিক শ্রেণীর গল্পের সারিতে **'নিমগাছ'** ও **'তাজমহল'**কে রাখার যৌক্তিকতা বোধ হয় এই যে, জীবন সাধারনের দৃষ্টিগোচর সহজে হয় না, বিশেষ দৃষ্টিপাতে যে জীবন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। **'নিমগাছ'** ও **'তাজমহল'** গল্পের বিষয়ভাবনা থেকে তা স্পষ্ট। **'তাজমহল'** গল্পটি ১০৭ টি বাক্যে, ৭৫৭টি শব্দে গ্রন্থিত।

ছোটগল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল — কাহিনীর একমুখীনতা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনী একটি বিষয়কে অবলম্বণ করে ক্ষিপ্র গতিতে দ্রুত পরিণতির পথে এগোয়। এ গল্পও সে বৈশিষ্ট্য পুরন করেছে। আমরা আখ্যান ভাগ আলোচনাতে তা বুঝতে পাই। গল্পের কথক উত্তম পুরুষে গল্পের ঘটনা বর্ণনা করে চলেছেন। গল্পকথক পেশায় একজন ডাক্তার। তিনি সম্প্রতি আগ্রার আশে-পাশেই এক দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার হয়ে এসেছেন। প্রথম যেদিন তিনি আগ্রা এসেছিলেন সেদিন সম্রাট শা-জাহানের নির্মিত তাজমহল দেখতে বড়ই কৌতূহলী ছিলেন। কিন্তু সেদিন দিনের আলোয় তাজমহলকে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল চুনকাম করা একটা সাদা মসজিদ। সেই সূত্রে তাঁর মনে মোগল আমলের শা-জাহান, মমতাজ, আলমগীর, দারাসেকো — কত জনের কথা উঁকি দিয়েছিল! তারপর এক জ্যোৎস্নারাতে তাজমহলের প্রকৃত সৌন্দর্য অনুভব করলেন কথক। এখন প্রায়ইশ তার পাশ দিয়ে যাতায়াত করেন কথক, তাজমহলকে রোজই দেখেন, তাজমহলকে কেন্দ্র করে মুনাফাখোর ধাপ্পাবাজদের পয়সা কামানোর জঘন্য মনোবৃত্তিতে বক্তার আর তাজমহলের প্রতি কোন মোহই নেই। প্রাত্যহিক জীবন একঘেয়েমিতার সুরে চলছিল।

ঠিক তার মধ্যে একদিন বক্তা **'আউটডোর'** সেরে বারান্দায় নামতেই দেখলেন এক মুসলমান বৃদ্ধ পিঠে প্রকাণ্ড একটা ঝুড়িতে করে কি যেন নিয়ে এসেছে। ঝুড়িটি নামাতে বক্তা দেখলেন ঝুড়ির মধ্যে তার অসুস্থা স্ত্রী। বাড়িতে **'ফি'** দিয়ে দেখানোর সামর্থ নেই বলেই এখানে নিয়ে এসেছে। কাছে যেতেই বক্তা ভীষণ দুর্গন্ধ পেলে বোরখা খুলতেই দেখলেন বুড়ীর মুখের আধখানা পচে গেছে, ডান দিকের গালটা নেই, দাঁতগুলো বীভৎসভাবে বেরিয়ে পড়েছে, দুর্গন্ধে কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। বক্তা বুঝলেন তার **'ক্যাংক্রাম অরিস'** হয়েছে। দূর থেকে পিঠে বয়ে এনে এরোগের চিকিৎসা চলে না ভেবে বক্তা হাসপাতালের বারান্দাতেই তাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এত দুর্গন্ধ যে হাসপাতালের কেউ তার কাছে যেতে চাইল না। অগত্যা হাসপাতালের সামনে একটি বড় গাছ তলায় রেখে বক্তা বুড়ির চিকিৎসা করতে লাগলেন। মেথর পর্যন্ত যেখানে বুড়ির কাছে যেতে চাইল না, বৃদ্ধ কিন্তু নির্বিকার চিত্তে সেবা করে চলেছে স্ত্রীর। বক্তা প্রত্যহ ঔষধ ও ইন্‌জেকশন দিয়ে আসতেন। চিকিৎসা এভাবেই চলছিল। একদিন বক্তা মুসলধারে বৃষ্টিতে কল

থেকে ফিরছেন। হঠাৎ দেখলেন বুড়ো চাদরের দুটো খুট গাছের ডালে বেঁধে আর দুটো খুট নিজে ধরে আছেন, নিজে ভিজছেন কিন্তু যেন তার বেগম না ভিজে। কিন্তু মুসলধারে বৃষ্টিতে বেগমও আপাদমস্তক ভিজে সারা। ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে, আধখানা মুখে বীভৎস হাসি, গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। বক্তা বুড়িকে হাসপাতালের বারান্দাতে নিয়ে যেতে বলার মুহূর্তেই বৃদ্ধ বক্তার কাছে জানতে চায় তার বেগমের বাঁচার সম্ভাবনা আছে কিনা। বক্তা তখন পরিষ্কার জবাব দিলেন 'না'। বৃদ্ধ নির্বাক। বক্তা পরদিন দেখলেন গাছতলা খালি, কেউ নেই। আরো কয়েকদিন পর বক্তা দারুণ রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপ্রহরে **'কল'** থেকে মেঠো পথে ফেরার সময় বুড়োকে দেখলেন ঝাঁ ঝাঁ রোদ দুপুরে মাঠের মাঝে কি যেন করছে। কাছে গিয়ে দেখলেন কতগুলো ভাঙা ইঁট আর কাদা দিয়ে কি যেন গাঁথছে। বক্তা জানতে চাওয়াতেই সম্ভ্রমে সেলাম করে বৃদ্ধ বলেন — **'বেগমের কবর গাঁথছি হুজুর।'** কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নিরবতার পর বক্তা জানতে চাইলেন তার নাম কি, এবং সে কোথায় থাকে। উত্তরে বৃদ্ধ জানান যে, সে আগ্রার আশেপাশে ভিক্ষে করে বেড়ায়, নাম ফকির শা-জাহান। বক্তা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গল্পের এই আখ্যান অংশে এতটুকুও বর্ণনা বাহুল্য নেই। কাহিনী ক্ষিপ্রগতিতে ধাপের পর ধাপ এগিয়ে অপ্রত্যাশীত নাটকীয় চমকে শেষ হয়েছে। শেষ হওয়ার পরেও আমাদের মনে ভাবের অনুরণন চলতে থাকে। কাহিনীটিতে প্রথমে মুঘল আমলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থাকলেও এটি যে সম্রাট শা-জাহানের প্রেমের একনিষ্ঠতার প্রতীক তাজমহলের কাহিনী নয়, এটি যে এক অখ্যাত অনৈতিহাসিক প্রেমিকের ভাঙা ইঁট আর কাদায় গড়া প্রেমের অমরাবতী তৈরীর কাহিনী তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।এ গল্পে কোন তত্ত্ব নেই, ঘটনার ঘনঘটা নেই, উপদেশ নেই, আছে শুধু চিরন্তন প্রেমের সকরুন, সীমাহীন আর্তি।

গল্পটি চারটি ধাপে গঠিত। প্রথম ধাপে বক্তার সম্রাট শাজাহানের অমর কীর্তি আগ্রার তাজমহল দেখে বক্তার হৃদয়ে মুঘল বাদশা শা-জাহান, আলমগীর, দারাসেকোর কথা মনে পড়েছে, মনে পড়েছে শা-জাহান পত্নী মমতাজের কথা, উপলব্ধি করেছেন তাজমহলের অপরূপ সৌন্দর্য্য। দ্বিতীয় ধাপে তাজমহলকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের নোংরা পথে পয়সা কামানোর কথা এবং লেখকের মনে তাজমহলের রূপ মোহহীন হয়ে পড়ার কথা, তৃতীয় ধাপে মূল কাহিনীতে প্রবেশ এবং বৃদ্ধ কিভাবে বুড়ির সেবা করে চলেছে তার দৃশ্য। আর চতুর্থ ধাপে আছে ফকির শা-জাহানের ইঁট আর কাদায় তৈরী সৌধের কথা। কাহিনীর এই চারটি ধাপের তৃতীয় ধাপে এসে **'মহামুহূর্ত'** সৃষ্টি হয়েছে, যখন বৃদ্ধ বক্তাকে জিজ্ঞেস করে — **'এর বাঁচবার কি কোনও আশা আছে, হজুর?'** — এটি Climax বাক্য। এর ভাবের বিস্তার বক্তার উত্তর **'না'** পর্যন্ত। তারপর গল্পের Falling Action যে কারনে পরদিন দেখা যায় **'গাছতলা খালি কেউ নেই।'** তারপর গল্পের Catastrophae, যেখানে ফকির শা-জাহান তার ভাঙা ইঁট আর কাদা দিয়ে মৃত স্ত্রীর সমাধি তৈরী করে। তবে গল্পের এই চারটি ধাপের প্রথম ধাপে মুঘল আমলের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণিত হলেও তা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েনি, মূল কাহিনীকে বৈপরীত্যদানে তার ভূমিকা বিশাল এবং তাতে গল্পের ভাবঐক্য ও কাহিনীর এমুখিনতা গাঢ়তা পেয়েছে। কাহিনীর এই বৈপরীত্যজনিত বিন্যাসে

পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতা প্রাধান্যলাভ করেছে। এছাড়া বৃদ্ধ ফকির শা-জাহান যে যথার্থই ত্যাগী পুরুষ তা ফকির সাহেবের বেশবিন্যাসে পরোক্ষে ইঙ্গিতধর্মীতায় বনফুল বুঝিয়ে দিয়েছেন। তার বর্ণনায় বনফুল লিখেছেন — **"বৃদ্ধের চেহারা অনেকটা বাউলের মত, আলখাল্লা পরা ধবধবে সাদা দাড়ি।" 'বাউল'** বাইরে নয়, মনের মধ্যেই মনের মানুষকে উপলব্ধি করে। আর **'সাদা'** শান্তির প্রতীক। গল্পের ফকির শাজাহানের জীবন ধারাতে তারই পরিচয় পাই।

এ গল্পের চরিত্র সংখ্যাও কম। মূল চরিত্র তিনটি — বক্তা, বৃদ্ধ ফকির-শা-জাহান, বুড়ি। এই মূল চরিত্রের ভাবনাকে পরিপুষ্টি দিয়েছে ট্রেনের একযাত্রী, মমতাজ, সম্রাট শাজাহান, আলমগীর, দারসেকোর প্রসঙ্গ এবং হোটেলওয়ালা, ফেরিওয়ালা, আগন্তুকরা, কম্পাউন্ডার ড্রেসার, মেথর প্রমুখ। তাই চরিত্র বিন্যাসের দিক থেকেও গল্পটি ছোটগল্পের শর্ত পূরণ করেছে।

বনফুল একজন রূপদক্ষ ভাষাশিল্পী। চরিত্র, বিষয় এবং চরিত্রের মানসিক পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি ভাষারূপ নির্মাণে দক্ষ। এগল্পেও তিনি বিষয়বস্তু ও চরিত্র এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা নির্মাণ করেছেন। গল্পটি উত্তম পুরুষে কথ্যচলিত ভাষায় লেখা। খুব সংক্ষেপে ডট্ ডট্, ড্যাস্ চিহ্নের ব্যবহারে, বাক্যগঠনে মুঘল আমলের অনেক না বলা কথা বলে দিয়েছেন। আগ্রার দুর্গের অলিন্দে বন্দী অবস্থায় বসে শাজাহান মমতাজের সমাধি তাজমহলের দিকে কিভাবে চেয়ে থাকতেন, তার সাধ ছিল মমতাজের পাশে যেন তাকে কবর – শায়িত করা হয়। আলমগীর পিতার সে ইচ্ছা পূরণ করেছে, তার পাশে দারাসেকোর কবরও যে এখনও শায়িত সে কথাও এমনভাবে বলেছেন যাতে মুঘল আমলের ঐতিহাসিক ঘটনা মানসপটে ভেসে উঠেছে। বনফুল মনে-প্রাণে রোমান্টিকও কম ছিলেন না, প্রেমের চিত্র, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চিত্র অঙ্কনে সে মন ধরা পড়ে। বনফুলের তাজমহলের সৌন্দর্য বর্ণনায় যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তাতে তার পরিচয় পাওয়া যায় — **"পূর্ণিমার পরদিন। তখনও চাঁদ ওঠেনি; জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। সেদিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনও। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই অস্ফুট মর্মরধ্বনি কানে এল। ঝাউ বীথি থেকে নয়—মনে হল যেন সুদূর অতীত থেকে; মর্মর ধ্বনি নয়—যেন চাপা কান্না। ঈষৎ আলোকিত অন্ধকারে পুঞ্জীভূত তমিস্রার মত স্তূপীকৃত ওইটেই কি তাজমহল? ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম। মিনার, মিনারেট, গম্বুজ স্পষ্টতর হতে লাগল ক্রমশ। শুভ্র আভাসও ফুটে বেরুতে লাগল অন্ধকার ভেদ করে। তারপর অকস্মাৎ আবির্ভূত হল — সমস্তটা মূর্ত হয়ে উঠল যেন সহসা বিস্মিত চেতনাপটে। চাঁদ উঠল। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ ওড়নায় অঙ্গ ঢেকে রাজরাজেশ্বরী শাজাহানমহিষী মমতাজের স্বপ্নই অভ্যর্থনা করলে যেন আমাকে এসে স্বয়ং। মুগ্ধ দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।"** এছাড়া বৃদ্ধের চেহারা বর্ণনায় এবং মুখের ভাষায় একজন ডাক্তারকে যে শ্রদ্ধাটুকু জানানো প্রয়োজন, যে সম্ভ্রমবোধটুকু দেখানো প্রয়োজন, তা তার **'সেলাম'** করে **'হুজুর'** সম্বোধনে পরিস্ফূট — **'বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে সেলাম করলে আমাকে।' 'এর বাঁচবার কি কোনও আশা**

আছে, হজুর?' এছাড়া বক্তার বৃদ্ধকে সম্বোধন করার মধ্যেও ভাষার যথার্থতা রক্ষিত হয়েছে —' কি হচ্ছে এখানে মিঞা সাহেব?' ইত্যাদি।

এগল্পে গল্পকথক বক্তা স্বয়ং লেখক। বনফুল ব্যক্তিগত জীবনে চিকিৎসাসূত্রে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছেন। এখানে কথক যে আগ্রায় সদ্য ডাক্তার হয়ে এসেছেন তা বনফুলের চাকুরী জীবনের আত্মকথা। দেশ-কাল-পাত্র লেখকের জীবনদর্শন সমেত লেখক এগল্পে উপস্থিত।

বনফুল গল্পটির নাম "তাজমহল" রেখেছেন। এ নামকরণ তিনি বস্তুকেন্দ্রিকতার দিক থেকে রাখেন নি, রেখেছেন ভাবকেন্দ্রিকতার দিক থেকে। বস্তু তাজমহল এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, মূল লক্ষ্য এক চিরন্তণ প্রেমকাহিনী নির্মাণ। গল্পকার সম্রাট শাজাহানের একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেমের নিদর্শন তাজমহলকে সামনে রেখে আরেকটি অখ্যাত-অবজ্ঞাত অমর প্রেম -কাহিনীর কথা বলেছেন। প্রেম যদি এককেন্দ্রিক নিখাদ - নিখুঁত হয়, তবে সে প্রেম এক অবিনশ্বর সত্তা হয়ে বিরাজ করে। তাতে প্রাসাদের মর্মধ্বনি আর ভাঙা ইঁট কাদা দিয়ে গড়া স্বতঃভঙ্গুর নির্মাণে কোন তফাৎ নেই। প্রেমের নিবেদনই সেখানে বড় কথা। তাই গল্পের শেষে সম্রাট শাজাহানের কোটি কোটি মুদ্রায় বিদেশী মর্মরে নির্মিত তাজমহলের চাইতে কোন অর্থে হীন নয় ফকির শাজাহানের ভাঙা ইঁট আর কাদায় গাঁথা কবরসৌধ। গল্পের এই প্রতীক ও ব্যঞ্জনাধর্মী নামকরণ তাই বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত ও শিল্পগুণ সমৃদ্ধ হয়েছে।

সমগ্র গল্পটিতে বনফুল অতীত ও বর্তমানকে, কল্পনা ও বাস্তবকে যে ভাবে শিল্পরূপ দিয়েছেন, তাতে 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' বা 'যাদু বাস্তবতা' ও 'হ্যালোসিনেশনের' ভাবনা মিলে-মিশে এক অনাস্বাদিতপূর্ব শিল্প সার্থক গল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন।

"ভাটিয়ালী" গল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার ঃ

"ভাটিয়ালী" গল্পটি বনফুলের ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বনফুলের নূতনগল্প' সংকলনের অন্তর্গত। মাত্র ১৬টি বাক্যে গল্পটি গ্রন্থিত।

"ভাটিয়ালী" গল্পটি বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক। কবি কাঁকন কুমারের পঞ্চাশতম জন্মদিনের একটি বিশেষ মুহূর্তের ঘটনাকে গল্পের ঠাস বুনোটে বাঁধা হয়েছে। গল্পটিতে অণুগল্পের তীব্রগতি ও 'চাবুক হাঁকড়ানো সমাপ্তি' (Whip crack ending) এক স্বর্ণশিল্প সৃষ্টির নিদর্শন। যেখানে একটি বাক্য, এমনকি একটি শব্দও বৃথা ব্যয় হয়নি।

গল্পের আখ্যান ভাগ যৎসামান্য। কবি কাঁকন কুমারের পঞ্চাশতম জন্মদিনের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গল্পটি রচিত। সেই জন্মদিনে এক স্থূলকায় লম্বা চওড়া মহিলা কাঁকন কুমারের কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত "তন্বী" নামে কবিতার বইটি নিয়ে হাজির। কবির অবস্থা তেমন নয়, তিনি তেমন খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন নি, তাঁর জন্মদিনে বাইরের লোক তেমন কেউ আসত না।

কিন্তু সেদিন সেই মহিলা উপস্থিত। আলাপ-আলোচনার পর মেয়েটি জানায় যে সে রেণু, যাকে নিয়ে এই কবিতাগুলি তিনি রচনা করেছেন। কাঁকন কুমার জানতে চায় তার স্বামী বর্তমানে কোথায় থাকে। রেণু জানায় বম্বেতে, চামড়ার ব্যবসা করে। এরপর রেণু সামনের নড়বড়ে চেয়ারটি টেনে নিয়ে বসতেই **'ক্যাঁচ'** করে তাতে একটা শব্দ হল। তাতে কবি কাঁকন কুমারের বুক ধরফর করতে থাকে, কারণ চেয়ারটি ভেঙে গেলে দ্বিতীয় চেয়ার কেনার মত সঙ্গতি তার নেই। তাই কাঁকন কুমার **'শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ারটার দিকে চাহিয়া রহিলেন।'**

গল্পটিতে কাঁকন কুমারের অস্বচ্ছল জীবন কাহিনী বর্ণনাতে যেটুকু পরিসর প্রয়োজন ছিল সেটুকুই গ্রহণ করেছেন বনফুল। কাহিনী শুরু শেষ পর্যন্ত তীরের গতিতে লক্ষ্যাভিমুখে এগিয়েছে। বর্ণনার এতটুকু বাড়াবাড়ি নেই, বরং যত কম বলে যত বেশি বলা যায়, সেই কৌশলই প্রকট হয়েছে। বৃথা একটি বাক্য, এমনকি একটি শব্দও ব্যয় করেননি বনফুল। তাতে গল্পরস আরো জমাট বেঁধেছে। গল্পটিতে **'চরম মুহূর্তের'** পটভূমি সৃষ্টি হয়েছে যখন সামনের নড় বড়ে চেয়ারটি টেনে রেণু বসল এবং তাতে **'ক্যাঁচ'** করে একটা শব্দ হয়। তারপর Climax বাক্য — **'কাঁকন কুমারের বুক ধরফর করিতে লাগিল।'** তার পর গল্পের Falling Action, যেখানে গল্পকার জানাচ্ছেন যে, চেয়ারটি যদি ভেঙে যায় দ্বিতীয় চেয়ার কেনার সঙ্গতি আপাতত কাঁকন কুমারের নেই। এর পর গল্পের Catastrophae— **'শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ারটার দিকে চাহিয়া রহিল।'** গল্পটির এই নাটকীয় সমাপ্তিতে আমাদের চমক লাগায়। গল্পটিতে আমাদের ভাবনার বিপরীত সমাপ্তি ঘটেছে, এটাইতো স্বাভাবিক। বনফুলের গল্পের শিল্পসার্থকতা সেখানেই, আমরা যা ভাবব তা নয়, আমরা যা ভাবিনি তেমনি একটা অপ্রত্যাশিত সমাপ্তি।

এগল্পে বিবৃতিমূলকতার চাইতে পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতা প্রাধান্য পেয়েছে বেশি। কাঁকন কুমার যেখানে সঙ্গতিপূর্ণ অবস্থায় কোন মতে দিনগুজরান করছেন, সেখান তার পূর্ব প্রেমিকা রেণু ফুলে ফেপে একটা লম্বা – চওড়া স্থূলকায়া মহিলায় পরিণত হয়েছে। জোয়ারের টানে রেণু স্থূলকায় হলেও আর্থিক ভাঁটার টানে কাঁকনকুমারের শীর্ণকায় অবস্থা এবং বুক ধরফরানি।

গল্পটির চরিত্র সংখ্যাও মাত্র দুটি — কবি কাঁকন কুমার আর রেণু। সে হিসেবে ছোটগল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পূরণ করেছে গল্পটি। আর চরিত্র ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষা নির্মাণেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বনফুল। কবি কাঁকনকুমারের সঙ্গে রেণুর কথোপকথন মাত্র পাঁচটি বাক্যে সীমাবদ্ধ। বাকি এগারোটি বাক্য লেখক বনফুলের। রেণুও কাঁকন কুমারের পরিচিতি অংশে রেণু বলেছে — **'আমাকে চিনতে পারছ?'** কবির উত্তর **'না'**, রেণু বলে **'আমি রেণু — যাকে নিয়ে তুমি এই কবিতাগুলি এককালে লিখেছিলে-!'** কবির জিজ্ঞাসা — **'তোমার স্বামী এখন কোথা—'** রেণুর উত্তর **'বম্বেতে চামড়ার ব্যবসা করেন।'** বাকি এগারোটি বাক্যে লেখক গল্পের ভাবটি চমৎকার ভাবে ফুটিয়েছেন। পরিস্থিতির পরিস্ফুটনে ভাষা ব্যবহার যথাযথ হয়েছে।

রেণুকে কাঁকন কুমারের চিনতে না পারা কোন এুটি নয়, সেটাই স্বাভাবিক। কারণ,

রেণু এখন 'একটা লম্বা চওড়া স্থূলকায়া মহিলায়' পরিণত। আর যে প্রেম পরের হয়ে গেছে তা মনে না রাখাই ভালো। তা স্মরণে বেদনা ছাড়া আর কিছু নেই।

গল্পটিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মধ্যবিত্তের আর্থিক দূরবস্থার চিত্র চমৎকার ভাবে বনফুল তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি গল্পের ভাবশরীর নির্মাণ, শব্দচয়নে, ইঙ্গিতধর্মীতায় লেখক -ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট।

"ভাটিয়ালী" গল্পের নামকরণ ভাবকেন্দ্রিক। ভাটিয়ালী পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে নদী কেন্দ্রিক অঞ্চলের গান বিশেষ, যা মাঝি, জেলেরা ভাঁটার স্রোতে ভেসে চলার সময় গায়। কবি কাঁকন কুমারের জীবনের আর্থিক অস্বচ্ছলতার দিকটিকে রেণুর স্বচ্ছল জীবনের বিপরীতে স্থাপন করে যেমন 'ভাটিয়ালী' এই কাব্যিক নামকরণকে তাৎপর্য মণ্ডিত করেছেন, তেমনি কবি কাঁকন কুমারের জীবনে প্রেমানুভূতির নিঃশেষিত হওয়াকে ভাঁটার টানের সঙ্গে ভাবগতদিক থেকে জুড়ে দিয়ে নামকরণটি ব্যঞ্জনাগর্ভ করে তুলেছেন।

এই ভাবে **"ভাটিয়ালী"** গল্পটি বিষয় নির্বাচন, কাহিনীর একমুখীনতা, চরিত্র বিন্যাস, মহামহূর্ত সৃষ্টি, ইঙ্গিতধর্মীতা, লেখকের জীবনভাবনা ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশে একটি শিল্প সার্থক ছোটগল্পে পরিণত হয়েছে।

এবারে বনফুলের **'মাঝারি'** আকৃতির (অর্থাৎ যে গল্পগুলি দুপৃষ্ঠার বেশি ও পাঁচ পৃষ্ঠার কম) কিছু গল্পের শিল্প-সার্থকতা বিচার করে আমরা দেখে নিতে নিতে পারি এই এশ্রেণীর গল্পরচনায় তিনি কতটা সফলতা অর্জন করেছেন —

ঃঃ "তিলোত্তমা" গল্পের শিল্পসার্থকতা বিচার ঃঃ

"তিলোত্তমা" গল্পটি বনফুলের ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত **'বিন্দুবিসর্গ'** সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। ছোট-বড় মোট নয়টি পরিচ্ছেদে, পাঁচ পাতার মধ্যে গল্পটি সমাপ্ত। তাই গল্পটি অনুগল্প শ্রেণীর নয়, সাধারণ ছোটগল্প যেমন হয়, ঠিক সেধরনের। নয়টি পরিচ্ছেদে ক্রমিক ঘটনার বিবরণে জীবনের এক **'বিন্দুতে'** মানব চরিত্রের অপার রহস্য উন্মোচনে গল্পটি শিল্পসুষমায় **'বিসর্গ'** বা বিস্ময় জাগায়।

গল্পটি তার নিদিষ্ট লক্ষ্যপথের অভিমুখী। নকুল নন্দীর একমাত্র বি.এ.পাস পুত্র গোকুল নন্দী অন্যান্য সকলের মত আড্ডা মেরে, তাস খেলে, থিয়েটার করে, রাজনীতি ও সাহিত্য নিয়ে **'মাথা ঘামাইয়া'** দিন ভালভাবেই চলে যায়। কেননা পিতার তেজারতী ব্যবসা আর মাতুলালয়ের বিষয় সম্পত্তি যা আছে তাতে তার চাকুরির উপর নির্ভর না করলেও চলে। অন্যান্য সকলের মত তারও বিবাহ প্রস্তাব আসতে থাকে। বিষয়-আশয়ের দৌলতে যে উপযুক্ত সুপাত্র। পিতা নকুল নন্দী

একদিন কুষ্ঠিবংশ মিলিয়ে তিলোত্তমা নামে এক পাত্রী গোকুলের জন্য পছন্দ করে আসলেন এবং যথাসময়ে বিয়েও হল। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঘটনা হল — তিলুর রূপ দেখে গোকুল ঘাবরে গেল — **'তিলের মত কুচকুচে কালো এবং গোল।'** গোকুলের পিতা ও মাতা তিলুর পিতাকে দোষারোপ করতে লাগল যে বেয়াই মশাই পাত্রী এবং দানপত্র উভয় দিক থেকেই তাদের ঠকিয়েছে। অতএব তারা গোকুলের পুনরায় দ্বিতীয় বিবাহ দেবে স্থির করল। সকলেই এতে রায় দিল, এমনকি গোকুল পর্যন্ত। তৃতীয় পরিচ্ছেদে, তিলুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গোকুল বুঝল যে, 'তিলু ভারি ভালমানুষ।' মিথ্যাভাষন, নিন্দা, ভর্ৎসনাতেও তিলু বাদ প্রতিবাদ করেনি। গোকুলকে স্বামীরূপে পেয়ে তিলু সুখী। তিলু মনে করে তারমত মেয়ের পক্ষে গোকুলের সঙ্গে বিয়ে হওয়া স্বর্গসুখে প্রবেশ করা। গোকুল একদিন তিলুকে জানায় বাবা মা তার আবার বিবাহ দিতে চায়, তিলু খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলে — **'বেশ তো। হিঁদুরঘরে হয়তো এমন।'** গোকুল জিজ্ঞেস করে তাতে তার কষ্ট হবে কিনা। তিলু বলে **'আমার? না।'** একটু চুপ থেকে পুনরায় বলে, **'হলেও তোমার যদি তাতে সুখ হয় সে কষ্ট সহ্য করব।'** চতুর্থ পরিচ্ছেদে জানা যায়, এভাবে বছর খানে কাটে, তিলুর প্রতি মোহ কাটানোর পক্ষে একবছরই যথেষ্ট। কারণ তিলু লেখাপড়া জানেনা, গানবাজনা জানেনা, হাবভাব জানেনা। তবে গুণের মধ্যে সে মহিষের মতো খাটতে পারে। গোকুল দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে উৎসুক হয়ে পড়ে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে **'চন্দ্রগুপ্ত'** নাটক অভিনয় করতে গিয়ে আধুনিকা ঊষা ও তার মার সঙ্গে পরিচয় ঘটে গোকুলের। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ঊষাকে দেখে গোকুল যে **'কুল হারাইল'** সে কথা বলা হয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, মাসখানেকের মধ্যে চতুর ঊষার মা গোকুলের সঙ্গে ঊষার বিবাহ ঠিক করে বসে। ঊষার একটি শর্তে গোকুল ও তার পরিবার রাজি হয়, তাহল বিবাহের পর তিলুকে বাপের বাড়ি **'জন্মের মত'** পাঠিয়ে দিতে হবে। অষ্ঠম পরিচ্ছেদে গোকুল রাত্রি দ্বিপ্রহরে তিলুকে জানায় যে পরেরদিন ঊষার মা তাকে আশীর্বাদ করতে আসবে। ভোরে তিলু বিছানা ছেড়ে উঠতেই গোকুল তিলুকে বলে যে আজ তার আশীর্বাদ, তার কোন আপত্তি আছে কি না। তিলু বলে **'না।'** গোকুল ঊষার শর্তের কথা শুনেছে কিনা বললে তিলু বলে **'শুনেছি। তাই যাব। তুমি এক-আধবার যাও যদি দয়া করে তাতেই আমার যথেষ্ট হবে।'** তারপর তিলু প্রাত্যহিক সাংসারিক কাজে বেরিয়ে যায়। গোকুল দেখন **'তিলোত্তমা ছাই-গাদায় বসিয়া বাসন মাজিতেছে।'** নবম পরিচ্ছেদে আশীর্বাদের সরঞ্জাম নিয়ে ঊষার মা গোকুলের বাড়িতে হাজির। গোকুল স্নান করে কার্পেটের আসনে ঊষার হাতে গড়া ফুলের মালা পরে আশীর্বাদে বসেছে। গোকুলের মা শাঁখবাজানোর অসুবিধা থাকায় তিলুকেই শাঁখ বাজাতে ডাকে। **"শাঁখটা হাতে লইয়া সসঙ্কোচে তিলোত্তমা দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। শাঁখটা বাজিয়ে উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে চুল পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বহিয়া গেল। আকস্মিক বজ্রঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল যেন।"** গোকুল বলে উঠল — **'আমাকে মাপ করবেন।'** তারপর **'দুইহাতে মালাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে দ্রুত উপরে উঠিয়া গেল।'**

নয়টি পরিচ্ছেদের এই কাহিনী বিন্যাস কিছু বিবরণধর্মী হলেও তাতে একমুখিনতা

নষ্ট হয়নি। চরিত্রের স্বভাব বর্ণনা, ঘটনার বিবরণে, আখ্যান অংশে কিছুটা শিথিলতা যে এসেছে তা ঠিক, কিন্তু ধীর গতি হলেও তার লক্ষ্য স্থির বিন্দুতে রেখেছেন বনফুল। তবে কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা প্লটের সুসংবদ্ধতাকে ব্যাহত করেছে খানিকটা। কিন্তু একথাও ঠিক, চরিত্রের মানসিকতা পরিস্ফূটনে সেই বর্ণনার আবশ্যিকতা ছিল। বনফুল অপ্রয়োজনে একটি বাক্য, এমনকি একটি শব্দও বৃথা ব্যয় করতে রাজি নন, তিনি কঠোর সংযমী ব্যক্তিত্বের মানুষ। কাহিনীর মধ্যে যে বিবরণধর্মীতা এসেছে তা মূল লক্ষ্য বস্তুকে বৈপরীত্যজনিত চমক সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে। অনেকের মনে হতে পারে গল্পের শুরুতে বনফুল যে বিবরণ টুকু দিয়েছেন তার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয়, সেই বর্ণনাংশটি পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতা (Indirect Suggestiveness) সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। তবে ঊষা এবং ঊষার মা প্রসঙ্গ, তিলুর বিবাহের অংশ যে একটু বিবরণধর্মী হয়েছে, তা ঠিক। কিন্তু সে বর্ণনাও আবার গোকুলের পিতার ও মাতার মানসিকতাকে পরিস্ফূট করেছে। যা গল্পের ভাবকে জমাট বাঁধিয়েছে।

বনফুল প্রতিনিয়ত এত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিল্পসৃষ্টি করেছেন যে, প্রচলিত ধারনায় আমরা তাঁর শিল্পসৃষ্টিকে খুঁজে নাও পেতে পারি। একটা অন্যরকম সমাপ্তি ও **'মহামুহূর্ত'** সেখানে থাকতে পারে। এগল্পেও বনফুল **'মহামুহূর্ত'** সৃষ্টি করেছেন নবম পরিচ্ছেদে। তা হল এই— **"শাখটা বাজিয়ে উঠিতেই গোকুলের পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত যেন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ বহিয়ে গেল। আকস্মিক বজ্রাঘাতে সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল যেন।"** তারপর গল্পের Falling action-এ গোকুল বলে ওঠে—**'আমাকে মাপ করবেন।'** গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় (Catastrophae) দেখি গোকুল দু'হাতে আশীর্বাদের মালাটি ছিঁড়ে দ্রুতপদে উপরে উঠে গেল। গল্পের এই নাটকীয় **'চাবুক-হাঁকড়ানো সমাপ্তি'** (Whip crack ending) সৃষ্টিতেই বনফুলের শিল্পসৃষ্টি আমাদের চমকিত করে।

এগল্পের চরিত্রসংখ্যাত খুব বেশি নয়। মূল চরিত্র গোকুল আর তিলোত্তমা। আর তাদের ভাবনাকে পরিপুষ্টি দিয়েছে, গোকুলের পিতা নকুল নন্দী, নকুলন ন্দীর স্ত্রী, ঊষা ও ঊষার মা। অপ্রধান প্রত্যেকটি চরিত্রই মূল কাহিনীকে গতিদান করেছে।

গল্পের কেন্দ্রিয় লক্ষ্য যে, তিলু বা তিলোত্তমা চরিত্রের সহসশীলতা, মহনীয়তা, পাতিব্রতভাবনা, লাজুকস্বভাব, সরলতা, কর্ম-নিপুণতা, বাদ-প্রতিবাদে উদাসীনতা প্রভৃতি গুণের সমন্বয়ে তিল তিল করে কিভাবে তিলোত্তমা হয়ে এক অনির্দেশ্য প্রভাব গোকুলের উচ্ছৃঙ্খল বোহেমীয় জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তিলোত্তমা চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত ও লক্ষ্যে অচল গল্পটি। রূপে নয়, গুণে সে তিল তিল করে আপন চরিত্রবৈশিষ্ট্যে তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে।

গল্পে গোকুলের তিলোত্তমার প্রতি মোহ কাটার পক্ষে একবছরই যথেষ্ট। কেননা, সংস্কৃতিবান, শিক্ষিত উচ্চবিত্ত সম্পন্ন গোকুলের তিলের মত কুচকুচে কালো আর মোটা, অশিক্ষিত, অমার্জিত হাবভাব না জানা তিলুর প্রতি আকর্ষণ কমার পক্ষে যথেষ্ট। আর গোকুলের দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন ও প্রস্তুতিতে একমাসের ও বেশি সময় লেগেছে, তাতে শিক্ষিতা ও চতুরা ঊষা ও তার

মায়ের সঙ্গে গোকুলের পরিচয় ও গোকুলের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তুতির পক্ষে যথেষ্ট। কেননা উভয়ে গোকুলের মা-বাবা ও পুত্রের দ্বিতীয় বিবাহ দিতে উন্মুখ ও প্রস্তুত ছিলেন। তাই **'Unity of time', 'unity of place', 'unity of fact'** — এই ত্রি-ঐক্য রক্ষিত হয়েছে।

গল্পে লেখক চরিত্রানুযায়ী যথাযথ ভাষা প্রয়োগ করেছেন। যাতে চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। গল্পের প্রথমে লেখক সূচনা অংশ মূল কাহিনীর অগ্রগতি, চরিত্রের মানসিকতা অনুযায়ী ভাষা বসিয়েছেন। যেমন গল্পের সূচনা অংশে লেখকের গল্পের ভাবশরীরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত ইঙ্গিতধর্মী বিবরণ অংশ—**"সকলেরই জীবনে মাঝে মাঝে একম একটি নাটকীয় মুহূর্ত আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সমস্ত হিসাব, সমস্ত আয়োজন হঠাৎ নিমেষে বদলাইয়া যায়। উত্তরবাহিনী নদীস্রোত সহসা দক্ষিণবাহিনী হইয়া পড়ে, তুঙ্গপর্বত অকস্মাৎ গভীর গহ্বরে পরিণত হয়। সাধারণ মানুষের জীবনেই এসব হয়। ইহার জন্য রাম বা রাবণ হইবার প্রয়োজন নাই।"** এছাড়া অর্থবান ঘরের পুত্রেরা সাধারণত যেমন হয় তেমনি গোকুলের চরিত্রস্বরূপও স্পষ্টকরেছেন লেখক উপযুক্ত ভাষা ব্যবহারে — **"নকুল নন্দী সাধারণ লোক, তাহার পুত্র গোকুলও অসাধারণ কিছু নহে। আর পাঁচজনের মত সেও বি.এ.পাশ করিয়া এখানে-ওখানে আড্ডা দিয়া, তাস খেলিয়া, পথের থিয়েটারে অভিনয় করিয়া, রাজনীতি অথবা সাহিত্য সম্পর্কে মাথা ঘামাইয়া অর্থাৎ এক কথায় ভ্যারাণ্ডা ভাজিয়া দিন যাপন করিতেছিল।"** এছাড়া তিলোত্তমার সম্বন্ধে মোহ কাটার বর্ণনা প্রসঙ্গে যে ভাষা গল্পকার ব্যবহার করেছেন, তাতে গোকুলের চরিত্র স্বরূপ যেমন আরো স্পষ্ট হয়েছে, পাশাপাশি তিলোত্তমার চরিত্র বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয়েছে—**"না জানে লেখা-পড়া, না জানে গান-বাজনা, না জানে হাবভাব। না আছে রূপ, না আছে গুণ। গুণের মধ্যে মহিষের মত খাটিতে পারে। কাঁড়ি কাঁড়ি বাসন মাজিয়া চলিয়াছে, রাশি রাশি কাপড় কাচিয়া চলিয়াছে। ভ্রুক্ষেপ নাই।. . . . আকাশে চাঁদ উঠিল কিনা,বকুলবনে পাপিয়া ডাকিল কি না, এসবের খোঁজ রাখা তাহার সাধ্যাতীত। নাট্যশিল্পী কবি-প্রকৃতি গোকুল দমিয়া গেল এবং অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিল। একটা চাকরানীর সহিত কাঁহাতক আর প্রেম করা যায়!"** এছাড়া ঊষার চরিত্র প্রসঙ্গে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন বনফুল তাতে তার চরিত্র স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে—**"ঊষা ঊষা নয়— দ্বিপ্রহর।**

প্রখর রৌদ্র কিরণের প্রদীপ্ত স্বর্ণকান্তি তাহার সর্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। চোখে-মুখে চলনে-বলনে হাস্যে-কটাক্ষে বিদ্যুৎ।" তাই 'গোকুল কুল হারাইল।' এছাড়া তিলোত্তমার এই কথাগুলিও তাঁর চরিত্রস্বরূপ উন্মোচনে সহায়ক হয়েছে — **"বেশতো। হিঁদুর ঘরে হয়তো এমন।", 'তোমার যদি তাতে সুখ হয় সে কষ্ট সহ্য করব।', "শুনেছি। তাই যাব। তুমি এক-আধবার যাও যদি দয়া করে তাতেই আমার যথেষ্ট হবে।"**

দেশ-কাল লেখকের জীবনদর্শন দ্বারা গঠিত লেখকের ব্যক্তিত্ব এগল্পে স্বতঃ

প্রকাশিত। গল্পেও কোথাও শ্লেষ, কোথাও ব্যঙ্গ যে রূপায়িত হয়েছে, তা লেখকের মানস প্রবণতা অনুযায়ী সৃষ্ট।

'তিলোত্তমার' গল্পের নামকরণ চরিত্রকেন্দ্রিক। তিলু বা তিলোত্তমার চরিত্রের মহনীয়তা, পাতিব্রত মনোভাব, উদাসীন নির্বিবাদ অথচ অনির্দেশ্য প্রভাব বিস্তার কারী ধর্মের রূপচিত্রণ বনফুলের লক্ষ্য। তাছাড়া তিলোত্তমা অশিক্ষিত, অমাজির্ত হলেও তার মধ্যে এক গ্রাম্য টিপিক্যাল বধূর রূপচিত্রণে বনফুল দেখিয়েছেন তার ব্যক্তিত্বময়ী সত্তার প্রভাব। তাছাড়া সমস্ত গল্প জুড়ে তিলোত্তমার প্রসঙ্গ বিস্তার লাভ করেছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিলোত্তমাই গল্প কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং লেখকের জীবনাদর্শন প্রকাশ করেছে। তাই **'তিলোত্তমা'** নামকরণ শিল্পগুণ সম্পন্ন ও সার্থক হয়েছে।

ঃঃ "গণেশ জননী" গল্পের শিল্পসার্থকতা বিচার ঃঃ

"গণেশ জননী" গল্পটি বনফুলের ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত **'আরো কয়েকটি'** গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটি সোয়া তিন পৃষ্ঠায়, এক'শ একত্রিশটি বাক্যে, ১২০৫ টি শব্দে গ্রন্থিত।

মানব এবং মানবেতর পশুকে কেন্দ্র করে বনফুলের পূর্বে ও পারে বেশ কিছু গল্প রচিত হয়েছে। কিন্তু **'গণেশ জননী'** গল্পে বনফুল মাতৃহৃদয়ের স্নেহ-ব্যাকুলতা যে স্তরে উন্নীত করেছেন তা অনাস্বাদিতপূর্ব। গল্পটি একটি ছোট্ট হাতির বাচ্চা গণেশ ও তার জননীকে কেন্দ্র করে রচিত। তাই গল্পটি যে একটি চরিত্রকেন্দ্রিক গল্প তা বলাই বাহুল্য। **'গণেশ জননী'** গল্পের প্লট সরল প্রকৃতির এবং তাতে সহজ-সরল ভাষায় লেখক এক দম্পতির এক হাতির বাচ্চার প্রতি অপত্যস্নেহের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাই প্লট বলতে আমরা যা বুঝি তা এখানে কেউ গভীর ভাবে অন্বেষণ করতে গেলে হতাশই হবেন। কারণ, এর কথা-পরিসর অত্যন্ত সামান্য এবং পরিণামও তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায়না। গল্পের কেন্দ্রে আছে এক হস্তিশাবক, যার নাম গণেশ। গৃহকর্তা এক মধ্যবিত্ত কৃষিজীবী। বছর দশেক আগে এক গুজরাটি হাতির ব্যবসাদারকে অসুস্থ অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে গৃহকর্তা বাড়িতে তুলে এনে তাকে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। তারপর দেশে ফিরে কয়েকদিন পরে একটি লোককে দিয়ে সেই কচ্ছি একটি ছোট্ট হাতির বাচ্চা পঠিয়েছেন প্রাণদানের উপহার স্বরূপ। হাতির বাচ্চাটি দেখতে ভারি সুন্দর। নিঃসন্তান দম্পতি বাচ্চাটিকে পেয়ে খুব খুশি। গিন্নিতো আত্মহারা। গিন্নি হাতির বাচ্চাটির নাম রাখলেন **'গণেশ'**। গণেশই এখন তাদের ধ্যান-জ্ঞান। গণেশের থাকার, চলাফেরার অসুবিধে হচ্ছে দেখে বসতবাড়ির সব দেয়াল কেটে দরজাগুলো বড় মাপের করা হল, গণেশ এখন মা যখন নদীতে স্নানে যান, তখন সে শুঁড়ে করে গামছা বালতি নিয়ে যায়, মা যখন গরমের দিনে উনুনে রাধতে বসেন, তখন

রান্নাঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে শুঁড়ে পাখা ধরে হাওয়া করে। সেই দম্পতির এখন সমস্ত ভাবনা ঐ 'খোকন'কে নিয়ে। তাকে আদর করলে সে খুশি হয়, বকলে অভিমানে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়। এই রকমই একটি ঘটনার সূত্রে গল্পকথক ডাক্তারবাবুর কাছে টেলিগ্রামটি গিয়েছিল। ঘটনাটি হল—গুজরাটি কচ্ছি এক ঝুড়ি বাগানের ল্যাংরা আম পাঠিয়েছিলেন গৃতকর্তাকে বাগানের মালীকে দিয়ে। কিন্তু কর্তা-গিন্নি তখন কেউই বাড়িতে না থাকায় মালী আমের ঝুড়িটি রেখে চলে যায়। এই সুযোগে গণেশ ঝুড়ির সমস্ত আম উদরস্ত করে বসে। গৃহিণী বাড়ি ফিরে সেজন্য একটু সস্নেহে শাসন করে বলেছিল— **'রাক্ষস সব খেয়ে বসে আছ, একটিও রাখতে পারনি আমাদের জন্য'**— তার সঙ্গে একটি আলতো চাপড়ও মেরেছিলেন বুঝি। সেই অভিমানে **'গণশা'** খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে গুম হয়ে বসে আছে। **'গণেশ জননী'** ভেবেছেন যে গণেশের হয়তো গুরুতর অসুখ করেছে। তার জন্যই ডাক্তারবাবুকে **'কল'** দেওয়া হয়। গল্পকথক ডাক্তারবাবু ও অত্যন্ত আশান্বিত হয়ে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিটের রওনা হলেন। কারণ, কমিশনারের ঘোড়া, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুকুর, পুলিশ সুপারের গাইগরু ইত্যাদির চিকিৎসা করে আর ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া 'পাশ' করিয়ে কোন মত দিনগুজরান হয় ডাক্তার বাবুর। সামনে পূজো, পরিবারও বড়, তাই একটা বড় **'ফীজ'** পাওয়ার আশায় **'কল'** পেয়ে উল্লসিত হয়ে ওঠেন ডাক্তারবাবু। কেননা, তিনি ভাবেন, হাতি যখন আছে, তখন নিশ্চয়ই কোন জমিদার বাড়িটারী বা কোন ধনী গৃহস্থ বাড়ি হবে। কিন্তু যথাস্থানে পৌঁছে দেখলেন গৃহকর্তা আদৌ কোন জমিদার বা ধনী গৃহস্থ নয়, এক মধ্যবিত্ত কৃষি সম্পত্তিজীবী, যারা নিজ সন্তানের মত হাতিটিকে লালন-পালন করছে। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বুঝলেন যে গণেশের কোন কিছুই হয় নি, রাগ করেই তার এই আহারত্যাগ। ডাক্তারবাবু সেই দম্পতির হাতির বাচ্চাটির প্রতি অপত্য স্নেহ দেখে বাড়ীর কর্তা জোর করে ফীজ দিতে এলেও তা নিলেন না। কেননা, মানুষ ও পশুর মধ্যে এমন স্নেহ-মায়া-মমতা দাবী-অভিমানের বিচিত্র লীলা দেখে তিনি বিস্মিত এবং তাঁর কাছে এ দু'শো টাকার চাইতে ঢের দামী বলে মনে হয়েছিল। যাওয়ার ঠিক আগে গল্পকথক ডাক্তারবাবুর কানে ভেসে এলো — **"তাহলে আর টাকার দরকার হবে না পোদ্দার। গয়ানাগুলো তুমি ফেরত দিয়ে যাও।"** ডাক্তারবাবু বুঝলেন গৃহিণীর গয়না বন্ধক দিয়ে গৃহকর্তা ডাক্তারবাবুর **'ফী'** সংগ্রহ করেছিল। — এ কাহিনী বর্ণনাতে বাড়তি কোন বর্ণনা নেই। কাহিনী একমুখি গতিতে তার পরিণতির দিকে এগিয়েছে। তবে কচ্ছি ব্যবসাদারের কথার এবং ডাক্তার বাবুর চিকিৎসাজীবন ও ব্যক্তিজীবনের বর্ণনায় কাহিনীর গতি কিছুটা ধীর গতিপ্রাপ্ত হয়েছে সন্দেহ নেই, হলেও তা মূল কাহিনীর ভাব শরীরের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত।

ডাক্তার বাবু **'কল'** পাওয়া থেকে শুরু করে সেই দম্পতির গৃহে পৌঁছানো পর্যন্ত গল্পের Climax সৃষ্টির আবহ তৈরী করেছে। গল্পকথক ডাক্তারবাবুর সেই দম্পতির বাড়ি পৌঁছানো, তাদের গৃহসজ্জা দেখা Climax -এর ঊর্ধ্বশিখরে আহরণ করতে থাকে কাহিনী। তারপর গল্পকথক ডাক্তারবাবু যখন বলেন — **'আমার রুগী কোথায়?'** তার উত্তরে গৃহকর্তার যা বলেছেন তাই এই গল্পের Climax - **'এখানেই আছে। আমারই হাতি. . . ।'** এর পর গল্পের Falling

action –এ সেই দম্পতির গৃহে গণেশের পদার্পণের কহিনী, তার থাকা শোয়ার জায়গা দেখা এবং গণেশজননীর গণেশের প্রতি খাওয়ানোর জন্য সন্তানবৎ আদর-অহ্লাদ করা, ডাক্তারবাবু গণেশকে দেখে-শুনে পুরোপুরি সুস্থ বলে সার্টিফিকেট দেওয়া, গৃহকর্তার ডাক্তার বাবুকে 'ফী' দিতে আসা এবং ডাক্তার বাবুর তা না নেওয়া পর্যন্ত। এর পর গল্পের Catastrophae বা পরিণামীব্যঞ্জনা, যেখানে ডাক্তারবাবু বুঝলেন তাঁর **'ফীজ'** গৃহকর্তা গৃহিণীর গয়না এক পোদ্দারের কাছে বন্ধক দিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন।

এগল্পের চরিত্র সংখ্যাও স্বল্প। মূল চরিত্র চারটি—গল্পকথক ডাক্তারবাবু, গৃহকর্তা, গণেশ জননী আর গণেশ। গল্পসূর্ত্রে এক গুজরাটি কচ্ছির কথা এসেছে তা গণেশের দম্পতি সংসারে পর্দাপণের ইতিহাস সূত্রে।

এগল্পের কথক ডাক্তারবাবু একজন কৃতবিদ্যা পশুচিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও নিতান্ত দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাতে হয়, এমনই দেশের অবস্থা। মোটা **'ফীজ'** পাবার আশায় ডাক্তারবাবু জীবনে প্রথমবার সেকেণ্ড ক্লাসেরই টিকিট কাটেন। কারণ **'সামনেই পূজো. . . বিরাট পরিবার।'** এমনই আর্থিক অনটন। তাছাড়া যে গৃহস্থের এক'শ বিঘে জমি আছে, ফলের বাগান আছে, তাকে একটা ভাঙা সাইকেল চালাতে হয়, তাদের পুত্রবৎ পোষ্য হাতির **'ফীজ'** জোগার করতে পোদ্দারের কাছে স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিতে হয়! তাছাড়া ডাক্তারবাবু দারিদ্র্যের মধ্যে দিনাতিপাত করলেও তিনি যে তাঁর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি তাতে তাঁর স্বার্থত্যাগী মনোবৃত্তি স্বতঃউৎসারিত। দারিদ্র্যের দ্বারা বিব্রত হয়েও তিনি অর্থলোভী নন, এটা তাঁর চরিত্রে প্রকটিত। এভাবে পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতায় (Indirect Suggestiveness) আমরা তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোটি যেমন পেয়ে যাই, তেমনি একজন মহৎ মানবিক চিকিৎসকের আর্দশ আমাদের বিস্মিত করে।

এগল্পের চরিত্রানুযায়ী ভাষাসৃষ্টির দক্ষতা লক্ষণীয়। বনফুল ভাষার মধ্যদিয়ে চরিত্রের মানসিকতা, পরিবেশ, পরিস্থিতি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। দম্পতির চরিত্র বর্ণনায়, গৃহসজ্জার বর্ণনায়, গণেশের থাকার জায়গার বর্ণনায়, গৃহিণীর গণেশকে আদর করার ভাষায় চিত্রধর্মীতা ফুটে উঠেছে। যেমন—গণেশের পোষমানার বর্ণনায়— **"গিন্নি যখন নাইতে যায়, বালতি-গামছা শুঁড়ে করে নিয়ে দোলাতে দোলাতে গণেশ পিছু পিছু যায়। গরমের দিনে রান্নাঘরে বসে গিন্নি যখন রাঁধে ও শুঁড়ে করে পাখা ধরে হাওয়া করে।"** এছাড়া এই বর্ণনায় যখন বলেন — **"ভিতরে গিয়া দেখি একটি বিরাট 'হলে' প্রকাণ্ড শতরঞ্চির উপর গণেশ গুম হইয়া বসিয়া আছে। একটি ক্ষীণকায়া মহিলা তাহার শুঁড়ে মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে খাইবার জন্য সাধ্য সাধনা করিতেছেন। সম্মুখে প্রকাণ্ড একটি 'বাথটব' কি একটা জলীয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ এবং তাহার পাশে লেবুর খোসার স্তূপ।**

খাও লক্ষ্মী তো – লেবু দিয়ে কেমন সুন্দর বার্লি করে এনেছি। চেখেই দেখ না একটু–

গণেশ কুলারমত কান দুটি নাড়িয়া ফোঁস করিয়া শব্দ করিল।" — ইত্যাদি।

এছাড়া ডাক্তারবাবুদের এক্তিয়ারে ব্যবহৃত **'কল' 'ফি' 'পাস'** প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যবহার, গৃহকর্তার **'ফীজ'**-এর বদলে **'দক্ষিণা'** শব্দের ব্যবহার বনফুলের চরিত্রানুযায়ী ভাষা নির্মাণের দক্ষতা প্রমান করে।

এগল্পে দেশ-কাল-জীবনদর্শন দ্বারা গঠিত লেখক ব্যক্তিত্বের ছাপও স্পষ্ট। বনফুল এবং তার পিতা ও ব্যক্তিগত জীবনে মহৎ, সৎ, পরোপকারী চিকিৎসক ছিলেন। এগল্পে তিনি যে একজন চিকিৎসক তা জানানোর পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির চিত্র চমৎকারভাবে পরিস্ফূট করেছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও ইঙ্গিতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

গল্পটিতে ঘটনাগত ঐক্য (Unity of fact) এবং সময়গত ঐক্য (Unity of time) চমৎকারভাবে রক্ষিত হয়েছে। গল্পাথক 'কল' পেলেন, সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট কেটেই রওনা দিলেন। এদিকে দম্পতি স্টেশনে ছ্যাকড়া গাড়ি নিয়ে হাজির। দম্পতির বাড়ি পৌঁছে গল্পকথক জানতে পারলেন দশ বছর পূর্বে গণেশ ঐ দম্পতির সংসারে প্রবেশ করে। যে মধ্যবিত্ত পরিবারের এক'শ বিঘে জমি তারও যে হাতি পুষতে অর্থে টান পড়বে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু আর্থিক অনটন সত্ত্বেও ঐ দম্পতির স্নেহ-বৎসলতাতে যে এতটুকুও খাঁদ নেই তা তাদের কথাবার্তা এবং আচরণে বোঝা যায়। কর্তা গণেশের পেটুকপনা এবং নানাবিধ উৎপাত নিয়ে মুখে যতই নিন্দা করুক সেগুলি যে তার মুখের কথা নয় বেশ বোঝা যায়। তার যা কিছু স্থাবর-অস্থাবর দম্পত্তি সবই গণেশের প্রতিপালনের জন্য উজার করে দিয়েছেন। এছাড়া তার স্ত্রী গণেশকে পুত্রবৎ স্নেহ করলেও তিনিও অন্তরের গভীরে একই আবেগের ভাগীদার। তাই স্ত্রীর গহনাটুকুও বন্ধক দিতে দ্বিধান্বিত হন নি। আর গৃহিণী, যাঁকে বনফুল **'গণেশ জননী'** নাম দিয়েছেন তিনি একজন টিপিক্যাল বাঙালি ঘরের মা, যিনি সন্তানকে মৃদু শাসন করেন, আবার তার অসুস্থতা সর্ম্পকে উদ্বিগ্ন হয়ে হয়ে পড়েন, সন্তানকে খাওয়ানোর জন্য নানা সাধ্য সাধনা করেন, সন্তানের মুখে কিসে রুচি আসবে তা তৈরী করে অসুস্থ সন্তানের মুখের সামনে তুলে ধরেন। অসুস্থ সন্তানের চিকিৎসার জন্য নিজের গয়নাগাঁটি বন্ধক দেন, তেমনি এগল্পেও সন্তানহীনা গৃহিণী করেছেন। কোথাও যেন এতটুকুও পার্থক্য নেই। **'গণেশজননী'** গল্পের শিল্প রস নিহিত রয়েছে ঐ বিচিত্র স্নেহ-বাৎসল্যে যে অভূতপূর্ব মাতৃরূপ ফুটে উঠেছে, তার গভীরে। এই দুর্লভ দৃশ্য দেখেই ডাক্তারবাবু তার **'ফীজ'** আর গ্রহণ করতে পারেন নি গৃহকর্তার কাছ থেকে। কেননা পয়সাতো কম-বেশি রোজগার হবেই, কিন্তু এমন মানব ও মানবেতর পশুর মধ্যে স্নেহ-মেদুর সম্পর্ক কটা দেখতে পাওয়া যায় বাস্তবে! তাই টাকার চাইতেও বহু মূল্যবান মনে হয়েছে ডাক্তারবাবুর এই সম্পর্ক, যার জন্য অকাতরে স্বার্থত্যাগ করেছেন।

বনফুল গল্পের নামকরণ করেছেন **'গণেশ জননী'**। গণেশ নামের একটি হাতি এগল্পের কেন্দ্রে অবস্থিতি আর গৃহকর্ত্রী জননী ও গৃহকর্তার জীবন তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। নিঃসন্তান এই দম্পতি নিজের সন্তানের মত তাকে পালন করেছে, সন্তানও যতটুকু সাধ্য শুঁড়ে করে গামছা-বালতি দিয়ে, গরমে পাখার হাওয়া করে মা'কে সাহায্য করেছে। এমনকি গণেশ ও গণেশজননীর অপত্যস্নেহ সম্পর্কে গল্প কথক ডাক্তারবাবুটিরও চরিত্র স্বরূপটিও উন্মোচিত হয়েছে।

সমস্ত গল্পে, সন্তানের প্রতি একজন জননীর যে কর্তব্য, যে সন্তানবৎসলতা, মাতৃহৃদয়ের যে বুভুক্ষু আকুতি চিত্রায়িত হয়েছে, সেটিই এগল্পের চালিকা শক্তি এবং গল্পকার যে দিকেই আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাই **'গণেশ জননী'** নামকরণ সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সার্থক হয়েছে।

সমস্ত দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে **'গণেশ জননী'** গল্পটিকে একটি শিল্পসার্থক সৃষ্টি হিসেবে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি।

ঃঃ "শ্রীপতি সামন্ত" গল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার ঃঃ

"শ্রীপতি সামন্ত" গল্পটি ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত **'বনফুলের আরো গল্প'** সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। ১০৮ টি বাক্যে, ৯৭৫টি শব্দে, তিন পাতার মধ্যে গল্পটি সমাপ্ত। এগল্পে শ্রীপতি সামন্ত নামের এক সরল, বিনয়ী অথচ হিসেবী, বিচক্ষণ ব্যক্তির স্বজাতিপ্রীতি তীক্ষ-ব্যঙ্গ-শ্লেষে রূপায়িত। তাই গল্পটি যে চরিত্রকেন্দ্রিক একটি গল্প তা বলাই বাহুল্য।

স্বল্পায়তনে, একমুখিনতায়, সংহত সংযত ভাষায়, ক্ষণমুহূর্তের সংক্ষিপ্ত ঘটনায় চিরন্তন এক জীবনসত্য ও স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে এগল্পে। গল্পের সময়কাল একদিনের। গল্পের বিষয় হল — শ্রীপতি সামন্ত মহাশয় ট্রেনে চেপে ঘুমিয়ে কোলকাতা যাবেন। অথচ তার কাছে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট, যেখানে লোক গাদাগাদি করে আছে, তিলধারনের স্থান থাকলেও মানুষ্যধারনের স্থান নেই। শ্রীপতি ঘুমিয়ে যেতে চাওয়ার কারণ হল, সর্বেশ্বরবাবুর নাতনির বিয়েতে দু'রাত তিনি চোখের পাতা এক করতে পারেন নি। আজ না ঘুমিয়ে গেলে আগামীকাল ব্যবসা করতে পারবেন না। যথাসময়ে ট্রেন এল, কিন্তু ট্রেনে অসম্ভব ভিড়—তৃতীয় শ্রেণীতে লোক ঝুলছে, মধ্যম শ্রেণীতে গাদাগাদি, এমনকি দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থগুলিও অধিকৃত। শুধু প্রথম শ্রেণীটি খালি বলা চলে, তাও সেখানে আবার সাহেবি পোশাক পরিহিত এক ভদ্রলোক বসে আছেন। শ্রীপতি প্ল্যাটফর্মে অনেক ছোটাছুটি করলেন, কিন্তু কোথাও চড়তে পারলেন না। অথচ তিনি মনে মনে দৃঢ প্রতিজ্ঞা করেছেন যে ঘুমিয়েই কলকাতা যাবেন। ট্রেন যখন ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে, তখন বিদ্যুৎ চমকের মত একটা বুদ্ধি মাথায় খেলেগেল সামন্তর। তিনি হাত কচলাতে কচলাতে স্টেশনের ছোটবাবুকে অনুরোধ করলেন ভৃত্য সংলগ্ন কামরাটিতে ওঠার অনুমতি দিতে, কিন্তু সাহেবটি তার এই অনুরোধে প্রথমে হতবম্ব হয়ে পড়লেও পরে অনুকম্পিত হয়ে জানিয়ে দেন, সেটা **'ফাসটো কেলাস।'** শ্রীমন্তবাবু অবশ্য এতটা মূর্খ নন যে ফার্স্ট ক্লাস চেনেন না। প্রথমশ্রেণীর আরোহী সেই বাঙালি ভদ্রলোক সামন্ত ছোটবাবু-সংবাদ উপভোগ করছিলেন। সামন্ত মহাশয়ের বাহ্যদৃশ্য অবশ্য মনোরম নয়, **"পরনে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসারিত এক জোড়া দেশী মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যকভাবে বসানো কাঁচ-ফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম** নিকেলের এবং

তাহারও ডান দিকে ডাণ্ডাটা নাই, সেদিকে সুতা বাঁধা। সামন্ত মহাশয়ের ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা; চক্ষু দুইটি রক্তাভ, চোখের পাতা নাই। চোখ দুইটি দেখিলে কিন্তু লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। লোলচর্ম নির্লোভ মুখখানি বিনয় গদগদ। মাথায় টাক। বর্ণ নাতিফর্সা কালো। হাতে থেলো হুঁকা।" এই সামন্ত মহাশয় বাঙালি সাহেবটিকে অনুরোধ করলেন ভৃত্যের কামরাটিতে একটু জায়গা দেওয়ার জন্য, কিন্তু বাঙালি সাহেব বলে উঠলেন — "দ্যাট কান্ট বি। আই কান্ট অ্যালাউ।" সামন্ত মহাশয় নিজেকে চাকরের সঙ্গে তুলনা করে বাঙালি সাহেবটিকে অনুরোধ করলে সাহেবটি তাচ্ছিল্যভাবে মাথাটি কামরার ভেতর ঢুকিয়ে সজোরে পাখা ছেড়ে দেন। ট্রেন ছাড়ার সময় হলে সামন্ত মহাশয় দেখলেন তৃতীয় শ্রেণীতে কোন ভাবেই এতসব জিনিসপত্র নিয়ে উঠা সম্ভব নয় এবং ঘুমের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে প্রথম শ্রেণীর সাহেবের কামরাটিতেই উঠে পড়লেন এবং বাঙালি সাহেবটিকে বললেন —**'শুনলেন হুজুর, এটাতেই চড়লাম আমি, কুরুকে পাঠিয়ে দেন, ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি।'** এতে সামন্ত মহাশয়ের দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যথাসময়ে ক্রু এসে ভাড়া চাইতেই শ্রীমতি সঙ্গে সঙ্গে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। ততক্ষনে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন, কিন্তু বাঙালি বাবুটির সঙ্গে বচসায় সামন্ত মহাশয়ের ঘুম ভেঙে গেল। বাঙালি বাবুটির টিকিট না থাকলেও সে ক্রুকে অজুহাত দেখিয়ে বলে যে তার টিকিট সুটকেশের ভেতরে আছে। কিন্তু ক্রু টিকিট দেখতে নাছোড় হলে শেষে বোঝা যায় বাঙালি বাবুটি আদপে টিকিটই কাটেননি। ক্রু বললেন যে, বাঙালি বাবুদের তিনি ভালোভাবেই চেনেন। কথাটির ব্যঙ্গ শ্রীপতির কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র তিনি ক্রুকে ডেকে বাঙালি সাহেবটির ভাড়া মিটিয়ে দিলেন, যা দেখে ও ভেবে উভয়ে হতবম্ব ও আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সামন্ত মহাশয় সাহেবটিকে বললেন, তিনি তো কোলকাতা যাচ্ছেন, তার গদিতে সময়মত টাকাটা দিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু এরপর যা ঘটল তা আরো আশ্চর্যজনক, স্বজাতির অপমানে বিদ্ধ সামন্ত মহাশয় ক্রুর দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে যথাসম্ভব রাষ্ট্রভাষায় বললেন —**"কটা বাঙালি আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতারে বাপু!"** এই বলে তিনি আবার শুয়ে পড়লেন। এতে সামন্ত মহাশয়ের স্বাজাত্যবোধ ঝলসে পড়েছে। তারপর বাঙালি সাহেবটি সামন্ত মহাশয়ের গদিতে টাকা ফেরত দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি। কিন্তু সমস্ত পথটা বাঙালি বাবুটি আর পাইপ ধরাতে সাহস পেলেন না। সমস্ত গল্পজুড়ে ঘটনার কোন ঘনঘটা নেই, তত্ত্ব নেই, উপদেশ নেই, আছে শুধু ব্যঞ্জনা, এক অদ্ভুত বিশ্লেষণী মনোভঙ্গি। কাহিনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামন্ত মহাশয়ের চরিত্রস্বরূপ উন্মোচনে একাগ্র, যে টুকু বৃত্তান্ত আছে তা ঘটনাকে আরও গাঢ়তা দিয়েছে।

বাইরের দিক থেকে পোশাক পরিচ্ছদের চাকচিক্য ভদ্রতা পরিমাপের একমাত্র মাপকাঠি নয়,তার সঙ্গে থাকা চাই সৌজন্যবোধ, সত্যবাদিতা, ন্যায় নিষ্ঠা, মানবিকতাবোধ। এসবের সমন্বয়ে একজন মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে। আর বাইরের দিক থেকে কাউকে দেখতে যতই দীন মনে হোক না কেন, পোশাক আশাক যতই সাধারণ হোক না কেন, অন্তর ঐশ্বর্যে যদি সে ধনী হয়, তবেই সে প্রকৃত মানুষ বলে বিবেচিত। বনফুল তাঁর নিজস্ব ভাবনা রূপায়ণে দুটি বিপরীত চরিত্র এনে দিন-

রাত্রির মত পার্থক্যটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। বনফুল সহজ সরল স্বাভাবিক ভঙ্গিতে ঘটনা বিন্যাস করেছেন। খোঁচা যাকে যেখানে যেভাবে দেওয়ার তাকে সেখানে সেভাবেই দিয়েছেন। স্যাটায়ারের এই সূক্ষ্ম প্রয়োগ বনফুলের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করে। গল্পের শেষ বাক্যটি সেই সূক্ষ্ম ব্যঙ্গকে চিহ্নিত করেছে — **'সমস্ত পথটা তিনি আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না।'** গল্পের এই পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতা গল্পরস জমাট বাঁধিয়েছে।

ছোটগল্পে চরিত্রের স্বল্পতা এগল্পেও লক্ষ্য করা যায়। মূল চরিত্র শ্রীপতি সামন্ত। এছাড়া তার চরিত্র স্বরূপ উন্মোচনের সহায়ক রূপে এসেছে স্টেশনের ছোটবাবু, বাঙালি সাহেব, পাঞ্জাবী ক্রু চরিত্রের অতিকথন কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করে নি বরং নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রকাশে সহায়ক হয়েছে।

এগল্পের ঘটনা একদিনের ট্রেন যাত্রার। তাই কাহিনী বিদ্যুৎগতিতে এগিয়েছে। কোথাও বৃথা বাক্য ব্যয় নেই। তাই গল্প Rising action থেকে Climax - এ দ্রুত পৌঁছেছে। তা সৃষ্টি হয়েছে সামন্ত মহাশয়ের পাঞ্জাবি ক্রুর কথার উপযুক্ত জবাবে — **"তাহার পর ক্রুর দিকে ফিরিয়া মাথা ঝাঁকিয়া সামন্ত মহাশয় রাষ্ট্রভাষায় বলিলেন, 'কটা বাঙালি আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতারে বাপু!"** এর পর গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনার মোক্ষম বাক্যটির প্রয়োগ — **'কিন্তু সমস্ত পথটা তিনি আর পাইপ ধরাইতে সাহস করিলেন না।'** বনফুল ভণ্ড ভদ্রতার মুখোশ টেনে খুলে দিতেন। এগল্পেও তাই করলেন স্নিগ্ধ কৌতুকে মুড়ে, হাল্কাচালে। আসলে প্রত্যেক লেখকই নিজ নিজ জীবনাদর্শ রূপায়ণে এমন কিছু চরিত্র সৃষ্টি করেন যা অনায়াসে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরতে পারে। আর যে শিল্পীর জীবনদর্শন গভীর তাঁকে অত বেশি ভাবতে হয়না টেকনিক নিয়ে, গল্প স্বতই আপন ভাবনায় শিল্পরূপকে নির্দেশ করে। বহুভাষিক-বিচক্ষণ-বিচিত্রকর্মা-বিশ্বকর্মা বনফুলের শিল্পসৃষ্টি তাই চেষ্টাকৃত কোন শিল্পরূপায়ণ নয়, তা স্বাভাবিক, আর স্বাভাবিক বলেই স্বভাবধর্মে সংযত সংহত সংক্ষিপ্ত ও পরিণামী ব্যঞ্জনায় (Catastrophae) উদ্ভাসিত।

বনফুল তাঁর চরিত্র অনুযায়ী, বিষয়বস্তু অনুযায়ী ভাষা তৈরীতে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গল্পের ভাষা চরিত্র স্বরূপ উন্মোচণে এবং লেখকের অভীষ্ট পূরণে সহায়ক হয়েছে। যেমন শ্রীপতি যে একজন সহজ সরল মনের মানুষ তা তার কথাতেই বেশ বোঝা যায় — **"যদি হুজুর দয়া করেন, আমি বুড়ো মানুষ, গরিব লোক, আমার শরীরটাও খারাপ, বিশ্বাস করুন, হুজুর, তিন রাত্রি ঘুম হয় নাই।"** এছাড়া শ্রীপতি যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তা তার কথাবার্তা ও আচরণে পরিস্ফূট — **'শুনলেন হুজুর, এটাতেই চড়লাম আমি, কুরুকে পাঠিয়ে দেন,ভাড়াটা আমি দিয়ে দিচ্ছি।'** তাছাড়া শ্রীপতির চরিত্র বর্ণনা যে ভাবে বনফুল দিয়েছেন তা থেকে তার চরিত্র বৈশিষ্ট্যগুলি বেশ বোঝা যায়—**"পরনে একটি আধময়লা থান, খালি গা, পায়ে ধূলিধূসরিত এক জোড়া দেশী মুচির তৈয়ারি চটি, চোখে তির্যক ভাবে বসানো কাঁচ-ফাটা চশমা, চশমার ফ্রেম নিকেলের এবং তাহারও ডান দিকে ডাণ্ডাটা নাই, সে দিকে সুতা বাঁধা। সামন্ত মহাশয়ের ঘাড়টি ঈষৎ বাঁকা; চক্ষু দুইটি রক্তাভ চোখের পাতা নাই। চোখ দু'টি দেখিলে কিন্তু**

লোকটির প্রতি শ্রদ্ধা হয়। লোলচর্ম নির্লোভ মুখখানি বিনয় গদগদ।" তাছাড়া, শ্রীপতির যে স্বাজাত্য বোধ গভীর তা তার কথাতেই স্পষ্ট—**'কটা বাঙালি আপ দ্যাখা হ্যায়? জাত তুলকে গালাগালি দেওয়া কোন দিশি ভদ্রতারে বাপু!'** সামন্তের চরিত্র ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ কুম্ভের পাশে শূন্য কুম্ভের অন্তঃসারশূন্য বাঙালি সাহেবটি ভাষা তার চরিত্রানুগ হয়েছে। শ্রীপতিকে তার কামরায় উঠতে না দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেছে — **'দ্যাট কান্‌টবি। আই কান্‌ট অ্যালাউ।'** পাঞ্জাবি ক্রু টিকিট চাইতে এলে ছল কথায় বলেছে — **'মাই টিকিট ইজ্ ইন্ মাই সুটকেস। প্লিজ টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট।'** পাঞ্জাবি ক্রু -ও তার কর্তব্য সুলভ ভঙ্গিতে বলেছে — **"আই কান্ট পাঞ্চ ইওর ওয়ার্ড। মাই ডিউটি ইজ্ টু পাঞ্চ** টিকিটস্ -" তার পর দেখা যায় **'বাঙালি সাহেবটির নিকট দিয়াশলাই, পাইপটি ও একটি** সিনেমা-সাপ্তাহিক ছাড়া আর কিছুই নাই।'

নামকরণও লেখক শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির পরিচয়বাহী। কেননা এই নামকরণের মধ্য দিয়েই লেখক তাঁর বক্তব্য- বিষয়কে ইঙ্গিত করেন। ছোটগল্প যেহেতু আঁটসাঁট গঠনে একটি সংহত শিল্প, সেহেতু তাতে ব্যঞ্জনাধর্মীতা বিশেষভাবে প্রত্যাশিত। **'শ্রীপতি সামন্ত'** নামটিতে শ্রীপতি চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য সমূহের প্রতি যেমন নির্দেশ করা হয়েছে, তেমনি চরিত্রটি শব্দগত তাৎপর্যও বহন করেছে। **'শ্রী'** শব্দের একটি অর্থ হল ধনসম্পদ, অন্য অর্থে ধনসম্পদের দেবী লক্ষ্মীকেও বোঝায়। কুবেরও ধনসম্পদের দেবতা। তবে লক্ষ্মীর চরণে ধনের সঙ্গে যে কল্যাণের ভাব যুক্ত কুবেরের ধনে তা নেই। শ্রীপতি নিজের টাকা দিয়ে বাঙালি সাহেবটির ভাড়া মিটিয়ে জাতির মান রক্ষা করেছেন। আবার শ্রীপতির পদবি **'সামন্ত'**। **'সামন্ত'** শব্দের একটি অর্থ **'প্রভু'**। এগল্পে দেখা যায় শ্রীপতি প্রথমে নিজেকে বাঙালি সাহেবটির চাকর বলে অভিহিত করে। কিন্তু কার্য-কর্মে গল্পের শেষে দেখা গেল শ্রীপতিই বাঙালি সাহেবটির প্রভূতে পরিণত হয়েছে। শ্রীপতির আচরণে বাঙালি সাহেবটি হতবম্ব, বিস্মিত, কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছিলেন। এদিক থেকেও শ্রীপতি সামন্ত নামটি সার্থক। গোটা গল্পে শ্রীপতির বিস্তার। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারই উপর আলোকপাত করেছেন লেখক। এমনকি লেখকের জীবনদর্শন প্রকাশে সহায়কও হয়ে উঠেছে শ্রীপতি সামন্ত। তাই 'শ্রীপতি সামন্ত' নামকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং শিল্পসার্থক হয়েছে।

সমগ্র দিক বিচার করে 'শ্রীপতি সামন্ত' গল্পটিকে একটি শিল্প-সার্থক ছোটগল্প হিসেবে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যায়।

ঃঃ "চম্পা মিশির" গল্পের সার্থকতা বিচার ঃঃ

"চম্পা মিশির" গল্পটি বনফুলের ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত **'অনুগামিনী'** গল্প সংকলনের

অন্তর্গত। চম্পামিশির এগল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র এবং তার জীবনাদর্শ সকলকে, এমনকি গল্পবক্তাকেও প্রভাবিত করেছে। তাই গল্পটি যে চরিত্র কেন্দ্রিক একটি গল্প তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'চম্পা মিশির' গল্পটি খুব বড় গল্প নয়, মাত্র সাড়ে তিন পাতার মধ্যে সমাপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে, মিতবাক্য বিন্যাসে, সংযত, সংহত, একমুখি গতিতে চম্পা মিশিরের চরিত্র বৈশিষ্ট্য অসীম ব্যঞ্জনায় রূপদান করেছেন বনফুল। মূল বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাহিনী দ্রুত পরিণতির পথে এগিয়েছে। রমজানের ছেলে সলিল গল্পকথককে সোৎসাহে খবর দিল যে, সে 'জিৎ গিয়া'। তারপর গল্পকথকের চম্পা মিশিরের কথা মনে পড়ে গেল। চম্পা মিশির জাতপাত নির্বিশেষে পরোপকারী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। টমটমের বাঁকা ঘোড়াকে সোজা করা, বাঁকা লোককে সোজা করা, গরীব, দুর্বলদের সাহায্য করাই তার প্রাত্যহিক কাজ। প্রত্যহ তিনি গঙ্গা পেরিয়ে বেশ কিছুটা পথ হেঁটে গল্পকথকের ল্যাবরেটরীর সামনে দিয়ে টমটম হাকিয়ে শহরে যেতেন। মিশিরজী কিন্তু কোন টমটম ওয়ালা নন, যার টমটমের ঘোড়া বদমাস, আগে যাওয়ার চাইতে পিছে চলে বেশি, সেই বদ ঘোড়াকে সোজা করতেই প্রত্যহ একটি খারাপ টমটমকে বেছে নিতেন। অবশ্য ভাড়াও দিতেন নিজের। এজন্য অনেক টমটমওয়ালা ঠকানোরও চেষ্টা করত, কিন্তু মিশিরজীকে ঠকানো অত সহজ ব্যাপার ছিল না। একদিন এক টমটম করে যেতে ঘোড়াটি পিছনে যাওয়ায় পড়ে একটু ছড়ে যায় মিশিরজীর। ছড়ে যাওয়া অংশে একটু টিংচার আয়োডিন লাগানোর সূত্রে গল্পকথকের সঙ্গে পরিচয় তার। মিশিরজী শহরে এসে ব্যস্ত থাকতেন সমস্ত দিন। আদালতেই বেশিরভাগ সময় কাটত তাঁর। রোজই তাঁর একটা না একটা মকদ্দমা থাকত। তবে তার নিজের মকদ্দমা নয়, পরের মকদ্দমা। যে পক্ষ দুর্বল সেই পক্ষের তদ্বির করা, তার জন্য উকিল যোগার করা, সাক্ষী যোগার করে নিজে পরামর্শও দিতেন। শহরে তার একটি ছোট বাসা ছিল সে বাসায় তাদের থাকতে দিতেন। মিশিরজী মকদ্দমাও ভাল বুঝতেন। তারপর নতুন উকিলদের মক্কেলও যোগার করে দিতেন। গল্পকথক একবার জানতে চেয়েছিলেন এসব করে তার কি লাভ হয়, মিশিরজী উত্তর দেন তার **'সময়কাটে'**। একবার উকিল তাকে ঘুস দিতে চাইলে **"মিশিরজি জিব কেটে উত্তর দিয়েছিলেন, আরে রাম রাম ওকিল সাহেব, আমি ব্রাহ্মণ, বেনিয়া নই। এ আমার পেশা নয়, খেলা।"** গল্পকথকের সঙ্গে পরিচয় হবার পর অনেক রোগীও পাঠিয়েছিলেন তিনি মফস্বল থেকে। একবার এক সিফিলিসগ্রস্থ রোগীর চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন। তারপর একদিন শরবত খাওয়ার প্রসঙ্গে গল্পকথক সুগারের জন্য চিনির শরবত খেতে না চাওয়ায় মিশিরজী এক ঝুড়ি বড় বড় শরবতিয়া লেবু এনে উপহার দেন গল্পকথককে। সঙ্গে একটা লেবুর গাছও দিয়েছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মিশিরজী একদিন গল্পকথক ডাক্তারবাবুকে ডেকে একটা অনুরোধ করেন। অনুরোধটি হল তাঁর পাড়ায় রমজান বলে একটি গরীব লোক আছে, তার একটি ভেড়া আছে, সে ভেড়াকে লড়িয়ে তাদের পেট চলে। কিন্তু গত দু'টি বাজিতে ভেড়াটির পেট খারাপ থাকায় বাজি হেরে গেছে। তাই ভেড়াটিকে যেন কিছু একটা ব্যবস্থা করে দেন। গল্পকথক পশুচিকিৎসক নন, তবু ডাক্তার হবার সুবাদে ঔষধ দিয়ে সারিয়ে দিয়েছেন। দু'দিন পরে গল্পকথক খবর পেলেন

মিশিরজী মারা গেছেন। ভেড়াটি বাজি জিতেছে। সে খবরই রমজানের ছেলে জানাতে আসে গল্পকথককে। তারপর গল্পকথকের মনে হয়েছে, চম্পা মিশিরের মত লোকেরা কোথায় গেল, যারা জাত ধর্ম নির্বিশেষে পরের উপকার করত। বাড়িতে ফিরে গল্পকথক দেখলেন মিশিরজীর দেওয়া শরবতিয়া লেবু গাছটি শুকিয়ে যাচ্ছে। তারপর তার চারদিকে খুঁড়িয়ে, সার দিয়ে, জল দেওয়ালেন গল্পকথক। কেননা **'গাছটাকে বাঁচাতেই হবে।'**

সমগ্রগল্পের মিশিরজী চরিত্রের মহৎ ক্রিয়া কলাপের দিকেই আলোকপাত করেছেন গল্পকার। কেন্দ্রিয় লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে দ্রুত ঘটনার পর ঘটনার বর্ণনায় সমাপ্তি পথে এগিয়েছে গল্প। কোথাও বাড়তি বিবৃতি নেই। যথাযথ বর্ণনায় অভীষ্ট লক্ষ্যে তার যাত্রা। সমগ্র গল্পে মিশিরজীর চরিত্র মহিমা বর্ণনা গল্পের Climax তৈরীতে সাহায্য করেছে। তার পর সেই 'মহামুহূর্ত' সৃষ্টি — **'দুদিন পরে খবর পেলাম মিশিরজী মারা গেছেন।'** তার পরেই গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা — **"বাড়ি ফিরে দেখলাম শরবাতিয়া লেবুর গাছটি শুকিয়ে যাচ্ছে। তার চারদিক খুঁড়িয়ে, সার দিয়ে, জল দেওয়ালাম ভাল করে। গাছটাকে বাঁচাইতেই হবে।"** গল্পের এই পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তবে অনেকের মনে হতে পারে গল্পকথকের রসমোক্ষণের অংশটি না হলেও চলত, যেখানে তিনি বলেছেন — **'মনে হচ্ছে চম্পা মিশিরের মতো লোকেরা কোথায় গেল, যারা কেবল দুর্বল মানুষদেরই সাহায্য করত, বাঙালি বিহারি মুসলমান—এসব ভেদ ছিলনা যাদের কাছে?'** তবে মনে রাখতে হবে, এই বৃত্তান্তটিই গল্পের ব্যঞ্জনাধর্মীতাকে আরো স্পষ্টতা দিয়েছে। তাই সেই বিবৃতি অংশ **'চম্পা মিশিরকে'** সার্থক ছোটগল্প হয়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি বরং পরিপুষ্টি দিয়েছে।

সার্থক ছোটগল্পের মত এগল্পেও চরিত্র সংখ্যা সীমিত। চম্পা মিশির, গল্পকথক, রমজান, রমজানের ছেলে,টমটমওয়ালারা, ঘুসখোর উকিল – এই হল চরিত্র সংখ্যা। তবে মূল কাহিনী চম্পা মিশিরের। অন্যান্য চরিত্রগুলি চম্পা মিশিরের পরোপকারী মনোবৃত্তির পরিস্ফূটনে সাহায্য করে অন্তর্হিত হয়েছে। মূল কাহিনীকে তারা পরিপুষ্টি ও গতিদান করে পরিণতির পথে কাহিনীটি দ্রুত এগিয়ে নিয়ে গেছে।

এগল্পে বনফুল **'ফ্লাস্ ব্যাক্'** পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। গল্পের সূচনা রমজানের ছেলে সলিলের **'জিৎ গিয়া হুজুর'** খবর। তারপর সেই সূত্রে চম্পা মিশিরের কথা গল্পকথকের মনে পড়া, চম্পা মিশিরের চরিত্রের মহৎ ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা, শেষে মিশিরজীর মত্যু এবং মিশিরজীর দেওয়া শরবাতিয়া লেবু গাছে প্রাণধর্মের আরোপে গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি।

এগল্পে দেশ-কাল ও জীবন দর্শন দ্বারা লেখকের ব্যক্তিত্ব গভীর ভাবে প্রতিফলিত। গল্পটির পটভূমি **'ভাগলপুর'** যখন বনফুল সেখানে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। গল্পকারের উত্তমপুরুষের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট — **'আমার ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে যে রাজপথ চলে গেছে তার উপর টমটম হাঁকিয়ে রোজ যেতেন তিনি।'** তাছাড়া মিশিরজীর গল্পকথকের কাছে রোগী পাঠানোর মধ্যে এ বাস্তবতা ধরা পড়েছে। তাছাড়া গল্পকার যখন বলেন —**'মনে**

হচ্ছে, চম্পা মিশিরের মত লোকেরা কোথায় গেল, যারা কেবল দুর্বল মানুষ দেরই সাহায্য করত, বাঙালি বিহারি হিন্দু মুসলমান এসব ভেদ ছিল না যাদের কাছে?'– তখন লেখকের জীবনদর্শনটি বুঝতে আমাদের অসুবিধে হয় না।

এগল্পের পটভূমি বিষয়বস্তু ও চরিত্র অনুযায়ী ভাষা সৃষ্টি করে গল্পটিকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দিয়েছেন বনফুল। গল্পের পটভূমি ভাগলপুর, বর্তমান বিহার। তাই গল্পকথক ছাড়া আর সব চরিত্র হিন্দিতে কথা বলেছে যাতে চরিত্রের বাস্তবতা ও সজীবতা বজায় থেকেছে। গল্পকথকের সঙ্গে প্রয়োজনে বাংলাতেই কখনো বাংলা হিন্দি মেশানো ভঙ্গিতে কথা বলেছেন মিশিরজী। গল্পকার যখন বলেন — **'চম্পা মিশিরের মত লোকেরা কোথায় গেল'** — তখন লেখকের চরিত্র ও মানসিকতাকে পরিস্কার বোঝা যায়। আবার মিশিরজী যখন বলেন — **"দু' আনার ছাতু তুইখা, আর দু আনার ঘোড়াটাকে খাওয়া। পেট ভরা থাকলে মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরুবে না।"** বা উকিলটি ঘুস দিতে চাইলে মিশিরজি জিব কেটে উত্তর দিয়ে ছিলেন — **"আরে রাম রাম ওকিল সাহেব, আমি ব্রাহ্মণ, বেনিয়া নই। এ আমার পেশা নয়, খেলা।"** তখন মিশিরজীর উদার, পরোপকারী চরিত্রটি ঠিকরে বেরিয়ে আসে এ ভাষা ব্যবহারে। এমন আরো নিদর্শন আছে গল্পে।

গল্পের নামকরণ **'চম্পা মিশির'** রেখেছেন বনফুল। সমগ্র গল্পে চম্পা মিশিরের চরিত্রের মহনীয়তাকে তুলে ধরেছেন, চম্পা মিশিরই কাহিনীর আদি-মধ্য-অন্ত্য জুড়ে, তার চরিত্রগৌরব প্রতিষ্ঠাই গল্পকারের লক্ষ্য। গল্পের শেষে গল্পকথকের যে মন্তব্য— **'চম্পা মিশিরের মত লোকেরা কোথায় গেল, যারা কেবল দুর্বল মানুষদেরই সাহায্য করত, বাঙালি বিহারি হিন্দু মুসলমান — এসব ভেদ ছিল না যাদের কাছে?'** — তখন চম্পা মিশির চরিত্র আর ব্যক্তি চরিত্র হয়ে থাকে নি, সে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পরোপকারী মানুষের প্রতিভূতে পরিণত হয়েছে। তাই গল্পের নামটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সার্থক হয়েছে।

সবদিক বিচার বিশ্লেষণে চম্পা মিশির গল্পটিকে একটি শিল্প-সার্থক রচনা হিসেবে গ্রহণ করতে এতটুকু বাধে না।

ঃঃ "সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ" গল্পের শিল্প-সার্থকতা বিচার ঃঃ

"সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ" গল্পটি বনফুলের ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত **'বনফুলের গল্প'** সংকলনের একটি বিশিষ্ট গল্প। গল্পটি ছোট-মাঝারি-বড় পাঁচটি পরিচ্ছেদে, তিন পৃষ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত। গল্পটিতে একটি বিশেষ অঞ্চলের(সনাতনপুরের) অধিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন বনফুল।

গল্পটি হাস্যকৌতুক পরিবেশে হাল্কা চালে, সরল প্রকরণে একমুখি। ঘটনা সংযত, সংহত, কোন শাখা কাহিনী নেই, সনাতন পুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গ্রাম জীবনের এক চিরন্তন বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন বনফুল। আখ্যান ভাগ গড়ে উঠেছে একটি ঘটনাকে মাঝে রেখে, তা হল — সনাতনপুরের প্রবীণ মোক্তার শৈলেশ্বর বাবুর হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হওয়াকে কেন্দ্র করে। এটিই গ্রামে যারপরনাই উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। গ্রামের লোকেরা খবরের কাগজে ছবি ছাপিয়ে সভাসমিতি করে, কবিতা লিখে সর্ববিধ উপায়ে উত্তেজনা প্রকাশ করতে পারত। কিন্তু তারা এসব কিছুই করতে পারছে না। নিরুপায় হয়ে শুধু ফুসফুস গুজগুজ করছে। কারণ **'শ্যামা নাম্নী ধোপানীটিও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইয়াছে।'** যাঁরা প্রবীন, শৈলেশ্বর বাবুর হিতৈষী তাঁরা বাইরে কথাটিকে সাধ্যমত চাপা দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু যারা বিরুদ্ধপক্ষ তারা নানা রকম কুৎসা রটনা করতে শুরু করল। হালদার মহাশয়, খোঁড়া মল্লিক মহাশয়, ভাদুড়ী মহাশয়, মিত্র, মুকুজ্জে, প্রবীন গোস্বামী শৈলেশ্বর বাবুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু করে দিলেন। এমনকি উত্তেজনাবশত হালদার মহাশয়ের উপর চটে গিয়ে রায় মহাশয় ডাব চুরির মামলা ঠুকেছেন। গ্রামের উকিল আশুবাবু টেবিল চাপড়িয়ে পোষ্টমাষ্টারকে ঘটনায় জড়িয়ে ফেলে বলে দিলেন **'Everything is fair in love and fight-শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখব তবে ছাড়ব।'** সনাতনপুরে যখন ঘোর চাঞ্চল্য, সকলেরই রসনা যখন সবেগে চলছে, সে সময় গ্রামে দু'টি ঘটনা ঘটল— এক. শ্যামা ধোপানি হঠাৎ গ্রামে ফিরে এল, সে নাকি মামার বাড়ি গিয়েছিল। এমনকি তার স্বামী পিরুর সঙ্গে তার কোন কলহ হয় নি বলেও জানা গেল। দুই. শৈলেশ্বর বাবু আর ফেরেননি, কারণ তিনি মারা গিয়েছিলেন। প্রেমে পড়ে নয়, কূপে পড়ে। গ্রামে একটা অব্যাবহৃত এঁদো নেড়া কুয়ো ছিল। তারই ভেতর থেকে গলিত শবদেহটা আবিস্কার করেছে খোঁড়া মল্লিক মহাশয়। যে নিজে খোঁড়া, ঠিক ভাবে হাঁটতে পারেনা, সেও যে কৌতূহলী হয়ে সেই উত্তেজনায় অংশগ্রহণ করেছে বনফুল সেদিকটি গল্পের শেষ বাক্যে শ্লেষপূর্ণ মন্তব্যে বিধৃত করেছেন। গোটা গল্পে টান টান উত্তেজনায়, নাটকীয় ভঙ্গিতে কাহিনী দ্রুত পরিণামে পৌঁছেছে। কোথাও অতিরিক্ত বক্তব্য বা বিবৃতি নেই, গ্রাম্য মানুষের চরিত্রস্বরূপ উন্মোচনে যেটুকু পরিসর প্রয়োজন সেটুকু আঁট-সাঁট পরিসর গ্রহণ করে গল্পরস জমাট বাঁধিয়েছেন। তাই গল্পের একমুখী গতি ব্যাহত হয়নি কোথাও। গল্পটির Climax সৃষ্টি হয়েছে উকিল আশুবাবুর কথাতেই— **'Everything is fair in love and fight-শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখব তবে ছাড়ব।'** তার পর গল্পের Falling Action-এ দেখা গেল পিরু ধোপার স্ত্রী গ্রামে ফিরে এসেছে এবং পিরুর সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশ ভালই, স্বামীর মার খেয়ে শ্যামা ধোপানি শৈলেশ্বর বাবুর সঙ্গে পালিয়েছে—এরটনা মিথ্যা! তার পর পরিণামী ব্যঞ্জনায় দেখা গেল, শৈলেশ্বর বাবু মারা গিয়েছেন, প্রেমে পড়ে নয়, কুঁয়োতে পড়ে এবং আবিষ্কার করেছেন **'খোঁড়া'** মল্লিক মহাশয়।

এ গল্পের চরিত্র সংখ্যা অল্প। ঘটনা মূল দু'টি চরিত্র কেন্দ্রিক— শৈলেশ্বর বাবু আর শ্যামা ধোপানি। এদের কেন্দ্র করে এসেছে হালদার মহাশয়, ভাদুড়ী মহাশয়, খোঁড়া মল্লিক মহাশয়, পিরু

ধোপা, মিত্র, মুকুজ্জে, শৈলেশ্বর বাবুর স্ত্রীএবং পুত্রদ্বয় মাধব ও যাদব, গোস্বামী মহাশয়, পোষ্টমাষ্টার, আশুবাবু। এই বিবিধ চরিত্র কাহিনীর একমুখীকে গতিকে ব্যাহত করেনি কোথাও, বরং কাহিনীকে দ্রুত পরিণামমুখি করেছে। একটি গ্রামে যেমন হাজার হাজার লোক থাকে, তাদের মানসিকতা বিভিন্ন হয়, গ্রামের সে স্বরূপকে তুলে ধরতেই চরিত্রগুলির অবতারণা।

এগল্পে লেখকের ব্যক্তিত্বটি (Personality) লক্ষণীয় ভাবে উপস্থিত। বনফুল লেখায় ব্যঙ্গের সূক্ষ্ম কশাঘাত প্রয়োগে সিদ্ধকাম পুরুষ। সহজ, সরল ভাবে কৌতুকের আবরণে মুড়ে গল্পটি পরিবেশন করেছেন। বনফুল স্বল্প কথায় অনেক কিছু বলার শিল্পী, এগল্পেও তাঁর সংযত স্বভাব অনুপস্থিত থাকে নি।

এগল্পে ভাষা প্রয়োগও বিষয়ের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে। গ্রামে যে একটি সামান্য ঘটনা নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড সংঘটিত হয়, চরিত্রগুলি কি ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় নিজের স্বার্থ দ্বারা এবং প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান না করে নিজেদের মধ্যে কি ভাবে অযথা মানসিক প্রতিযোগিতা শুরু করে তা লেখক উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রবীণ হালদার ভাদুড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হলে নিম্নস্বরে বলেছে — **'শৈলেশ কি কেলেঙ্কারিটাই করলে! ছি ছি!'** এবার ভাদড়ী মহাশয় য-ফলা আ-কার ব্যবহার করাটাই অধিকতর সমীচীন মনে করে বললেন- 'ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-', এরপর পিরু ঘটিত ব্যপারে মুকুজ্জের কথা — **'পিরু একেবারে ক্ষেপে আছে হে! মল্লিক একেবারে সাপের ঘারে পা দিয়েছে।'** বা, **'হুঁকাতে টান মারিয়া মহাশয় বলিলেন হালদারকে বলে দিও হে, সূর্য আজকাল পশ্চিমেই ওঠে—তা আমরা সবাই জানি। খুলনার চেয়ে ঢাকা বললে আরও মানাত।'** বা বৃদ্ধ গোস্বামী হুঁকাতে টান মেরে যখন বলেন— **'সবঘুঘু। পাঁড় ঘুঘুটি এইবার ফাঁদে পড়েছেন!'** বা, মুখোপাধ্যায় গৃহিনীর কথায় — **"থাম্ লো থাম্। আমার কর্তাটিও ওই দলে। সব চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। বলে দিয়েছি এবার স্পষ্ট করে যে, ওসব দলে আর মিশতে পাবে না। খাবে দাবে রান্নাঘরের দাওয়াটিতে চুপ করে বসে থাকবে। বুড়ো মিনসের অত আড্ডা দেওয়া কেন? মুখোপাধ্যায় গৃহিনীর ফাঁদি-নথ ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল।"** বা, **"মুখোপাধ্যায় গৃহিনী বলিয়া উঠিলেন, এই বুদ্ধি না হলে তোমার স্বামী যাবে কেন বোন! তারা যা করবে, তাকি তোমাকে সাক্ষী রেখে করবে নাকি? শৈলেশ্বর বাবু হলেন একটা ঘাগী মোক্তার। তাঁর সঙ্গে চালাকি! পুরুষ মানুষদের বশে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে – নজরবন্দী করে রাখা। চোখে চোখে রাখা। যা বললেন আমাদের গাঙ্গুলী দিদি, চোখের আড়াল হয়েছে কি বাস্।"** বা, হালদার মহাশয়ের উপর উপর রেগে রায় মহাশয়ের ডাব চুরির নালিশ ঠুকে দেওয়া, আশুবাবুর কথায়— **'Everything is fair in love and fight-শেষ পর্যন্ত লড়ে দেখব তবে ছাড়ব।'**- গল্পকারের কথায়— **"শৈলেশ্বর মোক্তার আর ফিরিলেন না। কারণ তিনি মারা গিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া নয়, কূপে পড়িয়া।. . . মল্লিক মহাশয় আবিষ্কার করিলেন।"** চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহারের সফলতা গোটা গল্পটি **'পোট্রেট'** অর্থাৎ ছবির মত

ভেসে উঠেছে। পাশাপাশি লেখকের কৌতুক প্রবণতা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ মেশানো কটাক্ষ অস্পষ্ট থাকে নি। যাকে যেখানে লাগার সেখানে মোক্ষম ভাবেই লেগেছে।

সমগ্র গল্পটিতে সনাতনপুরের অধিবাসী বৃন্দের ক্রিয়াকাণ্ড চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। গ্রামীন সমাজে একটি সামান্য ঘটনা সাদৃশ্যের কারণে কতটা রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনা পূর্ণ হয়ে ওঠে, সে কথাই এগল্পে তুলে ধরেছেন বনফুল। তবে সনাতনপুরের অধিবাসী বৃন্দের যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা সকল গ্রামের সাধারণ মানুষের চরিত্র বৈশিষ্ট্য। গল্পকারের গ্রাম্য জীবনের স্বরূপ চিত্রন যে ডাইমেনশন পেয়েছে, তাতে নামকরণটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ এবং সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে।

সমস্ত দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে **'সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ'** গল্পটিকে তাই একটি শিল্প সার্থক রচনা হিসেবে অনায়াসে গ্রহণ করা যায়।

এবারে বনফুলের **'বড়'** আকৃতির অর্থাৎ (পাঁচ পৃষ্ঠা বা তার উপরে) কিছু গল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখে নিতে পারি এই শ্রেণীর গল্প রচনা বনফুল কতটা সফল হয়েছেন।

ঃঃ "অর্জুন মন্ডল" গল্পের শিল্প সার্থকতা বিচার" ঃঃ

"অর্জুন মণ্ডল" গল্পটি ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত **'আরো কয়েকটি'** গল্প সংকলনের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটি ৬৯৩ টি বাক্যে, ৫২০৯ টি শব্দে, একটি পরিচ্ছেদে, চোদ্দ পাতায় সমাপ্ত। এটিই বনফুলের সর্ববৃহৎ গল্প। বনফুল বুধ্নীর মত দেড় পাতার গল্পে ছ'টি পরিচ্ছেদ করেছেন, অথচ **"অর্জুন মণ্ডল"** এর মত **"বড়"** গল্পে একটিমাত্র পরিচ্ছেদ চিহ্ন দিয়েছেন। তাই আমাদের একটু ভাবলেই বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, বনফুল গল্পের প্রকরণগত দিক থেকে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন—তা সে **'ছোট'** আকৃতির হোক বা **'মাঝারি'** আকৃতির হোক বা **'বড়'** আকৃতির হোক। আসলে গল্প **'ছোট'**, **'মাঝারি'**, **'বড়'** যাই হোক না কেন তাকে ছোটগল্পে উন্নীত করতে না পারলে শিল্পীর সার্থকতা নেই। **"অর্জুন মণ্ডল"**- এর মত দীর্ঘ গল্পকেও ছোটগল্পে উন্নীত করাতেই বনফুলের শিল্পসিদ্ধি প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত।

'অর্জুন মণ্ডল' গল্পটির নাম থেকেই স্পষ্ট যে গল্পটি চরিত্রাশ্রয়ী এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সমগ্র গল্পে গল্পবক্তা তাঁর বাস্তব স্মৃতি বিজরিত **'অর্জুন কাকা'**র দৃঢ়, বলিষ্ঠ, আদর্শবাদী চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের উপর আলোক সম্পাতে কাহিনীর একমুখিগতি রক্ষা করেছেন। গল্পে অর্জুন কাকার সামগ্রিক জীবনচিত্র উন্মোচনে বনফুল বিবৃতিতে যে বেশ পরিসর নিয়েছেন সে কথাও ঠিক। তাতে কাহিনীর গতি কিছুটা শ্লথ হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু গল্পটি ছোটগল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনায় অটুট

থেকেছে। আখ্যান বর্ণনায় কোন জটিলতা নেই, সহজ-সরল ভাবে কাহিনী পরিবেশন করেছেন বনফুল। গল্পবক্তা এক শীতকালের গভীর রাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে জেগে উঠে কপাট খুলে দেখলেন **"খর্বকায় এই বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। অজানুলম্বিত গলাবন্ধ খদ্দরের কোট গায়ে। মাথার সামনের দিকটা কেশ-বিরল, চোখ নিষ্প্রভ, ভুরুতে পাক ধরেছে, সমস্ত মুখে বলিরেখা, সামনে গোটা দুই দাঁত নেই।"** হঠাৎ গল্পবক্তা চিনতে পারলেন অর্জুন কাকাকে। তিনি তীর্থে যাচ্ছেন। যাওয়ার আগে একবার দেখা করতে এসেছেন। অর্জুন কাকার নাতি চিত্তরঞ্জন, মানে চিতুয়া এবারও মেট্রিক পাশ করতে পারেনি সে কথা তিনি জানালেন। খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করাতে তিনি বলে উঠলেন **"তোমার সঙ্গে কি আমি লৌকিকতা করছি?. . . . দেখ বেশি যদি পীড়াপীড়ি কর, বিছানাপত্র গুটিয়ে নিয়ে ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে চলে যাব তাহলে।"** অর্জুন কাকার কথাই বক্তা ভাবতে ভাবতে একটি ঘটনা দৃশ্য মনে পড়ে গেল। একদিন হাটে জমিদারের সিপাহীদের অর্জুন কাকার মাছ না দেওয়া নিয়ে গণ্ডগোল। সিপাহীরা জোড় করে অর্জুন কাকার থেকে মাছ কেড়ে নিতে চাইলে অর্জুন কাকা দিতে না চাওয়ায় সিপাহীরা তাকে এক চড় মারে। অর্জুন কাকাও সেই সিপাহীকে চড় মেরে বসে। গণ্ডগোলের জেড়ে দৌড়ে অর্জুন কাকা গল্পবক্তার পিতার কাছে ছুটে আসে। গল্পবক্তার পিতার লিক্‌লিকে চেহারা হলেও বিদ্যার প্রতাপে কিভাব জমিদারের সিপাহীরা **'কেঁচো'** হয়ে গেল, তা দেখে অর্জুন কাকার লেখাপড়া করার ইচ্ছে জাগল। বছর চল্লিশ পর্যন্ত অর্জুনকাকা নিরক্ষর ছিলেন, মাথায় করে মাছের ঝুড়ি বয়ে এনে গল্পবক্তাদের বাড়ির সামনে হাটে মাছ বেচতেন। তা এমন অর্জুন মণ্ডলের পড়ার শখ দেখে আশ্চর্য হলেও গল্প কথকের পিতা সাতমেয়ে-স্ত্রী-পরিবৃত্ত সংসার কিভাবে চলবে তা জানতে চাওয়ায় অর্জুন মণ্ডল জানায় তার স্ত্রী সংসার চালাবে। তার কিছু জমিজমা আছে, স্ত্রী ধান কুটে, ছাতু পিষে কোন মতে চলে যাবে, তিনি নিজেও কিছু রোজগার করবেন। যথারীতি পড়াশোনা শুরু হল। গল্পবক্তাদের প্রথম ভাগ এবং ফার্স্টবুক দিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেও পরিশ্রমের জোড়ে অল্পদিনের মধ্যেই অর্জুনকাকা তাদের ছাঁড়িয়ে গেলেন। খুব ভোরে পড়াশোনা করতেন, সারাদিন খাটতেন, গভীর রাত পর্যন্ত আবার পড়াশোনা করতেন। ঘুম এলে **"চোখে সরষের তেল দিতেন। মাথার চুল ধরে টানতেন। ঠাস্ ঠাস্ করে নিজের গালে চড় মারতেন কখনও কখনও।"** এমন বিদ্যার্থী সুলভ মনোভাব, নিষ্ঠা কোথাও দেখেননি গল্পবক্তা। এরমধ্যে অর্জুন মণ্ডল বহু ইংরেজিও বাংলা গ্রন্থ পাঠকরে ইংরেজি ভাষাও আয়ত্ব করেছে বেশ। হাসপাতালের পরিদর্শনে এক সিভিল সার্জেন সাহেব এলে অর্জুন মণ্ডলের কথাবার্তায়, ব্যবহারে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে তাকে কম্পাউণ্ডারি পড়ার স্কলারশিপ জোগার করে দেন। রীতিমত একজন দক্ষ ড্রেসার হয়ে উঠলেন অর্জুন মণ্ডল। কিন্তু ড্রেসারের পরীক্ষায় পরীক্ষকের সঙ্গে তর্ক করায় একবার ফেলও করতে হয়। তবু দমেননি তিনি। কম্পাউণ্ডারি পড়লেন। গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু গৃহস্থ ঘরের সাতছেলের সঙ্গে অর্জুন মণ্ডল সাত মেয়ের বিয়ে দিলেন অনিচ্ছা সত্বেও। একবার এমন ঘটনাও ঘটে যে জামাইরা বখাটে হওয়ায় তাদের **'গো-বেড়েন'** করতেও দ্বিধা করেননি। গল্পবক্তা তখন ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলেজে ভর্তি

করে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নানা হাসপাতালে চাকরি করে বেড়াচ্ছেন। একবার পূজোর ছুটিতে অর্জুন মণ্ডল গল্পবক্তার কাছে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি এবং ফার্মোকলজি বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করতে হাজির। তখন তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। তবু গল্পবক্তা বৃদ্ধের উৎসাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠে পারতেন না। এমনি তাঁর একাগ্রতা, নিষ্ঠা, তারপর বিলেত যাওয়ার প্রসঙ্গে আর একটি স্মৃতির কথা বলেছেন গল্পবক্তা। গল্পবক্তার পিতার যখন ছেলেকে বিলেতে পাঠানোর আর্থিক সঙ্গতি ছিল না, তখন অর্জুন মণ্ডল তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় দু'হাজার টাকা অনায়াসে দিতে রাজি হয়ে যান। যারা মানুষ হতে চায় তাদের জন্য অর্জুন মণ্ডল সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত। অর্জুন মণ্ডল গল্পবক্তাকে টাকা দেওয়ার সময় বললেন তার নাতি জামাইদের কিছু দেবেন না, কারণ সব উচ্ছন্নে যাবে। তাই অনুনয় করে বললেন — **'তুমিই নাও, ভাল কাজে খরচ হলে তৃপ্তি হবে আমার।'** জীবনে কোন কিছুই অর্জুন মণ্ডলের মনের মতো হয়নি। তাই তাঁর সব জিনিসপত্র এঁটে যায় এমন একটা মজবুত সিন্দুক গড়তে লেগে পড়েন অর্জুন মণ্ডল। তীর্থে বেরুবেন তিনি। তাই তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত আগ্রহ, প্রচুর টাকা দিয়ে সিন্দুক তৈরী হল। **"সিন্দুকটাও হল চমৎকার। যেমন প্রশস্ত, তেমনি মজবুত, তেমনি সুন্দর দেখতে।"** সমস্ত জিনিসপত্র তাতে ভরে প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ধরতে এসেছেন অর্জুনকাকা। **"ট্রেন এল। কুলি দু'জনে প্রাণপনে চেষ্টা করলে সিন্দুকটাকে গাড়িতে তুলতে। কিন্তু কিছুতেই পারলে না। সিন্দুকটা এতবেশি বড় হয়েছিল যে ট্রেনের দরজা দিয়ে কিছুতেই ঢুকল না। সুটকেশ নিয়ে কত লোক উঠল নামল, কিন্তু সিন্দুক নিয়ে অর্জুন কাকা উঠতে পারলেন না; ট্রেন ছেড়ে গেল।"** অর্জুন কাকার দিকে গল্পবক্তা চেয়ে দেখলেন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে **'তাঁর সমস্ত মুখ ভ্রূকুটি কুটিল, ঘন ঘন জিব চিবুচ্ছেন তিনি।'**

গল্পের এই দীর্ঘ বর্ণনাংশে অর্জুন মণ্ডল চরিত্র থেকে কাহিনী এতটুকুও বিচ্যুত হয়নি। একমুখী গতিতে পরিণতির পথে এগিয়েছে গল্প। কাহিনীতে চিতুয়ার প্রসঙ্গ, জমিদার সিপাহীদের প্রসঙ্গ, জামাইয়ের পিতার চরিত্র, গল্পবক্তার পিতার চরিত্র, গল্পবক্তার বিলেতে পড়তে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা অনেকের কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটি কাহিনী অর্জুনমণ্ডলের চরিত্রের এক একটি বিশেষ বৈশিষ্ট চিহ্নিত করেছে। অর্জুনমণ্ডল যে সাহসী, মহৎ ,সৎ, প্রতিবাদী, নিষ্ঠাবান, নামের বিকৃত ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ, পরোপকারী, আদর্শবাদী তা প্রকাশিত। তাছাড়া সিন্দুক তৈরি প্রসঙ্গটি একটু দীর্ঘবর্ণনার মনে হতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে ঐ সিন্দুক তৈরীর প্রতি একাগ্রতা ও সিন্দুক নিয়ে ট্রেনে তীর্থভ্রমনে যেতে না পারার ঘটনাই গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনাকে চিহ্নিত করে। অর্জুন মণ্ডলের জীবন যতই অসাধারণ হোক না কেন, যতই শ্রদ্ধেয় হোক না কেন, সহজ-স্বচ্ছন্দ জীবন ধারায় তা অচল। তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠার উন্মাদনাই তার চরিত্রের ট্রাজিক পরিণতির জন্য দায়ী। আসলে যা অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে স্বাভাবিক ভাবেই তা দণ্ডনীয়। অর্জুন মণ্ডলের জীবন কাহিনীতে সে কথাই বলতে চেয়েছেন বনফুল। গল্পের Climax তৈরী হয়েছে যেখানে গল্পবক্তা অর্জুন মণ্ডলকে প্রশস্ত, মজবুত, সুন্দর সিন্দুকটি নিয়ে ট্রেনে তুলে দিতে গেলেন — **'অর্জুন কাকাকে তুলে দিতে স্টেশনে গেলাম।'** তারপরেই গল্পের

Falling Action এ দেখা গেল একজন কুলি সিন্দুকটিকে ওঠাতে পারলেন, যা দু'জন কুলি লাগল। তার পরেই গল্পের পরিণামীব্যঞ্জনা সৃষ্টি — ট্রেন এল কিন্তু দু'জন কুলিও গড়িয়ে সেই বিরাটাকায় সিন্দুককে ট্রেনের দরজা দিয়ে ঢোকাতে পারল না সুটকেশ নিয়ে কত লোক উঠল নামল, কিন্তু অর্জুন কাকা উঠতে পারলেন না, ট্রেন ছেড়ে দিল। আর অর্জুনকাকা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। গল্পের পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতা প্রকাশ পেয়েছে এই বাক্যটিতে — **"সুটকেশ নিয়ে কত লোক উঠল নামল, কিন্তু সিন্দুক নিয়ে অর্জুন কাকা উঠতে পারলেন না; ট্রেন ছেড়ে গেল।"** যেখানে গল্পকার তাঁর বক্তব্যটিকে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন।

এ গল্পের কাহিনী একটিই। চরিত্র সংখ্যাও অল্প। মূল চরিত্র দু'টি — অর্জুন মণ্ডল ও গল্পবক্তা তাঁদের পরিপুষ্টি দিয়েছে জমিদার সিপাহী, গল্পবক্তার পিতা, সিভিল সার্জেন সাহেব, চিতুয়া, অর্জুন মণ্ডলের জামাই ও বেয়াই। সেদিক থেকেও এটি একটি সার্থক ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য পুরণ করেছে।

এগল্পে **'Unity of time'**- ও রক্ষিত হয়েছে। অর্জুন মণ্ডলের চল্লিশ বছর বয়সে পড়াশোনা শুরু, চর্চার মধ্য দিয়ে ইংরেজি ভাষা আয়ত্বে এনে ব্যবহার করা, কম্পাউণ্ডারী পাশ করে চাকরী করা, কুড়ি বছর ব্যবধানের জীবনকথা – সবই সময় সাপেক্ষ হয়েছে।

এ গল্পে স্থান – কাল – পাত্র ও লেখক-ব্যক্তিত্ব গভীর ভাবে উপস্থিত। গল্পটিকে ভাগলপুরের আদমপুরের পটভূমিতে রচিত তা গল্পবক্তার কথায় স্পষ্ট। বনফুলের পিতা একজন ডাক্তার ছিলেন; তাঁর পরিচয় আছে অর্জুন কাকা যে বনফুলদের বাড়ির সামনের হাটে মাছ বিক্রি করতে আসতেন সে কথাও বনফুল বলেছেন। এছাড়া মণিহারী গ্রামের কথায়, বনফুলের পড়াশোনায়, স্কুল থেকে কলেজে পড়ার সময়কার কথায়, চিতুয়াকে কোলকাতার মর্টন স্কুলে ভর্তির প্রসঙ্গে, বনফুলের বিলেতে পড়তে যাওয়ার প্রসঙ্গে, তৎকালীন জমিদার সিপাহীদের অত্যাচারের প্রসঙ্গে লেখকের আবাল্য পরিচিত অর্জুন কাকার প্রসঙ্গে স্থান-কাল-পাত্র অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে বিধৃত হয়েছে। এছাড়া বনফুলের জীবন দর্শন এগল্পে গভীর ভাবে রূপায়িত হয়েছে।

এগল্পের ভাষা চরিত্র অনুযায়ী ব্যবহৃত হওয়ায় ভাব যথোপযুক্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। স্থানীয় জমিদার সিপাহীরা যে হিন্দী ভাষী এবং অত্যাচারী তা তাদের কথাতেই বোঝা যায় — **"এই সেই তো রেওয়াজ হ্যায় হজুর। মাহিনামে একঠো বড়া মছলি তো উসকো দেনাই** চাহিয়ে।" অর্জুন মণ্ডল প্রতিবাদী, তাই সে গর্জন করে বলেছে **'নেহি দেগা।'** আবার তিতিবিরক্ত অর্জুন মণ্ডল যখন তার জামাই-মেয়ে-নাতিদের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেছে — **'সব শালা গুণ্ডা হচ্ছে'**- তখন অনায়াসে **'শালা'** এই স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ মানান সই হয়ে উঠেছে। এছাড়া একাগ্রচিত্ত অর্জুন মণ্ডলের পড়াশোনার করার বর্ণনায় বনফুল যখন বলেন — **'চোখে সরষের তেল দিতেন। মাথার চুল ধরে টানতেন। ঠাস্ ঠাস্ করে নিজের গালে চড়ও মারতেন।'** তখন সে ভাষা চিত্রধর্মীতা অর্জন করে। এছাড়া অর্জুন মণ্ডল ইংরেজি শিখে যেভাবে কথাবার্তা বলেছে সিভিল সার্জন সাহেবটির সঙ্গে তা বেশ মানানসই হয়েছে তাঁর সঙ্গে এবং তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্যও ফুটে

উঠেছে সে ভাষা ব্যবহারে— **'Yes Sir, I shall carry your things most gladly', 'Thank you Sir, I am a labourer, no doubt, but I shall not accept anything from you', 'You are Doctor Babu's honoured guest'**—অর্জুন মণ্ডল যে সৎ, বিনয়ী, কৃতজ্ঞ, তা এই বাক্যগুলি থেকেও বোঝা যায়। তাছাড়া সিন্দুক তৈরিতে অর্জুন মণ্ডলের ব্যস্ততা, একাগ্রতা, আগ্রহ, শক্তি, বুদ্ধি সমস্তই যে নিয়োজিত হয়েছে তা তার মুখের ভাষা ব্যবহারে মূর্ত করে তুলেছেন বনফুল — **"উঠে-পড়ে লাগলেন তিনি। সকাল থেকে আরম্ভ করে সন্ধ্যা পর্যন্ত মিস্ত্রিটার সঙ্গে ধস্তাধস্তি চলল। ভাল করে র‍্যাঁদা দাও না, ওর নাম কি র‍্যাদা দেওয়া। বার্ণিশ হবে। ওকি করছ তুমি? একটু ভালো করে খেটে খুটে কর বাবা, মজুরি ছাড়া বখশিশও দেব তোমাকে। ফাঁকি দিও না—হ্যাঁ, ঠিক করে মেপে নাও — থাম থাম, আমি ধরছি —আরে বাবা কতবার বলব তোমাকে, ভিতরে বড় বড় চারটে খোপ হবে, হ্যাঁ, চারটে।**
হাঁ হাঁ হাঁ, প্যাঁচ কষো না এখন, দাঁড়াও দেখি—" — ভাষার এই কথ্যভঙ্গি বিষয়ের সজীবতা তুলে ধরেছে।

এছাড়া গল্পবক্তা যখন উত্তম পুরুষে বলেন — **"ট্রেন এল। কুলি দু'জন প্রাণপনে চেষ্টা করলে সিন্দুকটাকে গড়িয়ে তুলতে, কিন্তু কিছুতেই পারলে না। সিন্দুকটা এত বেশি বড় হয়েছিল যে ট্রেনের দরজা দিয়ে কিছুতেই ঢুকল না। সুটকেশ নিয়ে কতলোক উঠল নামল, কিন্তু সিন্দুক নিয়ে অর্জুন কাকা উঠতে পারলেন না, ট্রেন ছেড়ে গেল।"** — তখন গল্পের ব্যঞ্জনা বহুগুণিত হয়ে ইঙ্গিতে প্রকাশ লাভ করে।

নামকরণ সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ন প্রসঙ্গ। কেননা এই নামকরণের মধ্য দিয়েই শিল্পী তাঁর বক্তব্য-বিষয়কে ইঙ্গিত করতে চান বা ধরতে চান। তাই নামকরণ যথাযথ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ব্যক্তি নামের সঙ্গে চরিত্রের সাজুয্য না থাকলেও কিছু যায় আসে না। তাতে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন, অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ মেয়ের নাম পূর্ণিমা, শীর্ণ ব্যক্তির নাম গণেশ হলেও রসহানি ঘটে না, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ যথাযথ না হলে রসহানি ঘটে। তাই নামকরণের ব্যাপারে শিল্পীরা যত্নবান হন। এগল্পের নাম বনফুল **'অর্জুন মণ্ডল'** রেখেছেন। গোটা গল্পে অর্জুন মণ্ডলের চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব বিধৃত ও উদ্ভাসিত। তাই গল্পের বিষয়বস্তু অনুযায়ী চরিত্রকেন্দ্রিক এই নামকরণ সার্থক। আবার একটু অন্যরকম ভাবে ভাবা যায়, পৌরাণিক অর্জুন তাঁর লক্ষ্য ভেদে ছিল স্থির প্রতিজ্ঞ এবং সফল। কারণ, তাঁর মধ্যে আদর্শবাদীতা, চরিত্রগৌরব থাকলেও তা উন্মাদনার পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। কিন্তু একালের অর্জুন মণ্ডল তাঁর আদর্শসর্বস্বতার দ্বারা আচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টিত। তাই তার লক্ষ্য স্থির থাকলেও লক্ষ্য পূরণে সে ব্যর্থ। আদর্শসর্বস্বতা মানব চরিত্রের পরাভবকেই ডেকে আনে, যেহেতু তা প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী, অ-স্বাভাবিক, অ-সাধারণ। তাই **'অর্জুন মণ্ডল'** নামকরণে বনফুলের অতিচারী জীবনের প্রতি ব্যঙ্গটিও প্রচ্ছন্ন থাকে নি। সেদিক থেকেও **"অর্জুন মণ্ডল"** নামকরণটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং সার্থক।

তাই সব দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে **'অর্জুন মণ্ডল'** গল্পটিকে শিল্প সার্থক রচনা হিসেবে গ্রহণ করতে কোথাও বাধা দেখি না।

ঃঃ "ব্যতিক্রম" গল্পের শিল্পসার্থকতা বিচার ঃঃ

"ব্যতিক্রম" গল্পটি বনফুলের ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত **'বাহুল্য'** গল্পসংকলনের অন্তর্ভুক্ত। গল্পটি আটটি পরিচ্ছেদে, সাত পাতার মধ্যে সমাপ্ত। **"ব্যতিক্রম"** গল্পটি বনফুলের প্রেম চেতনার একটি বিশেষ দিককে চিহ্নিত করে। **'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'** বনফুল শবব্যবচ্ছেদাগারের ডিসেক্‌শান টেবিলে রেখে মানব চরিত্রের গভীর ডুব দিয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তার রহস্য উন্মোচন করেছেন। বনফুলের গল্পের বৈশিষ্ট্য হল — তিনি চরিত্রগুলিকে এক জটিল পরিস্থিতিতে ফেলে তাদের গূঢ় মানস প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। পরিস্থিতির চাপেই চরিত্রগুলির চলন – বলন, মানসিকতা আপনা-আপনি রূপ লাভ করে এবং পাঠকের তা থেকে লেখকের অভীপ্সিত বক্তব্য বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। বনফুল চরিত্রকে কখনো পরিচালিত করেন না, চরিত্র গুলি বাস্তব পরিস্থিতির অভিঘাতে নিজেরাই তাদের স্বরূপ উন্মোচোন করে। আর তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় লেখকের তীক্ষ্ম-তীব্র শ্লেষ, কটাক্ষ, ব্যঞ্জনা। **'ব্যতিক্রম'** গল্পে বনফুলের এই মানসিকতা ধরা পড়েছে।

'ব্যতিক্রম' গল্পের আখ্যান ভাগ বিস্তারে বনফুল সাত পাতার পরিধি নিলেও গল্পটি ছোটগল্পের স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়নি। নির্মেদী বর্ণনায় এক মুহূর্তের জন্যও কাহিনী তার গতি হারায়নি। কাহিনীর বর্ণনা যত স্বল্প বা দীর্ঘ হোক না কেন তা গল্পের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে তীব্র গতিতে পরিণতির দিকে ধেয়ে চলেছে — কোথাও একটিও বৃথা বাক্য ব্যয় নেই। প্লটের যথাযথ বিন্যাস, বক্তব্যের অভিব্যঞ্জনার উন্মোচনে সহায়ক হয়েছে। গল্পের কাহিনীটি এরকম—স্বাস্থ্যবান, সুরুপ শিক্ষিত উপার্জনক্ষম, পিতৃ-মাতৃহীন সুপুরুষ সুরেন অবিবাহিত। বিবাহ করার কথা জিজ্ঞেস করলেই বিশেষ কিছু বলেনা, শুধু বহু অর্থবোধক ছোট একটা হাসি হাসে। বহু কন্যার পিতা বহু চেষ্টা করে বিফল হয়েছে সুরেনের কৌমার্যব্রত ভঙ্গ করতে। তার বিবাহে অরুচির কারণ হল শিক্ষিত হাল ফ্যাশন দুরস্ত মেয়েদের স্বভাব চরিত্র। এ অভিজ্ঞতা তার হয়েছে অন্তরঙ্গ বন্ধু ললিতের বি.এ. পাস বউটির এক আর্টিস্টের সঙ্গে উধাও হওয়ার ঘটনা শ্রবনে। তার উপর যথেষ্ট অর্থনৈতিক অসম্বলতা। সুরেন পশ্চিমের একটি শহরে গঙ্গার ধারে একটি ছোট বাসাতে থাকে। সঙ্গে থাকে বৃদ্ধ চাকর হক্‌রু। **'সুরেন লোকটি পারিপার্শ্বিকের তুলনায় একটু বেখাপ্পাগোছের শিক্ষিত এবং মার্জিত রুচি।'** অন্যান্য লোকের মত **'হুঁকাহস্তে তাসের আড্ডা গুলজার'** করার মত তার স্বভাব নয়। **'সে একটু মুখচোরা স্বভাবের লোক এবং সম্ভবত একটু অহঙ্কারীও।' 'হেমন্তের শুক্লা দ্বাদশীতে'** হঠাৎ বন্ধু ললিতের স্ত্রী আভাদেবীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। আভাদেবীর ব্যবহার, কথাবার্তা, সৌজন্যবোধ, ভদ্রতা, শিক্ষা-দীক্ষার বহর প্রভৃতিতে সুরেন মুগ্ধ। আভাদেবী এসেছিল

স্বামীর বন্ধু হিসেবে সুরেনকে কিছু কথা বলতে। কিন্তু সেদিন সুরেনকে কিছু বলে উঠতে পারেননি আভাদেবী। তবে বন্ধুর **'রীতিমত রূপসী'** স্ত্রীকে দেখে সেদিন **'সুরেন অভিভূত হইয়া পড়িল।'** এরপর মাঝে মধ্যেই কথাটি বলার জন্য আভাদেবী সুরেনের সঙ্গে দেখা করতে আসে। কিন্তু কিছুতেই কথাটি পাড়তে পারেন না যেন। আভাদেবী সেখানকারই এক মেয়েদের স্কুলে হেড মিস্ট্রেস হয়ে এসেছেন। ইতিমধ্যে আভাদেবীর সঙ্গে বার বার সাক্ষাতে সুরেনের মনেও রঙের ছোয়া লাগে। এদিকে সেই স্কুলের সেক্রেটারী উকিল মুরারীমোহন পুরকায়স্থ প্রতিনিয়ত আভাদেবীর কাছে আসতে থাকে। আভাদেবী মানাও করতে পারেন না। সুরেনের সঙ্গে আভাদেবীর এই সাক্ষাতের মূল কারণ স্বামী ললিতের প্রসঙ্গ আলোচনা। কিন্তু **'কিন্তু'**র মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। এখন সুরেনের কাছে আভাদেবীই মুখ্য, ললিত গৌণ। মোটকথা, আভাদেবীকে তার ভালো লেগেছে। আভাদেবী যেন কোন দিন তার বাড়িতে দেখা করতে এসে ঘুরে না যান, সে উৎকণ্ঠা সুরেনের মধ্যে প্রবল হতে থাকে। দু'মাস এভাবে কেটেছে। পরপর তিনদিন আভা না আসায় সুরেন বিমর্ষ হয়ে পড়ে। হঠাৎ বাইরে পদশব্দ শুনে দেখলেন আভাদেবী নয়, **'বকের মত পা ফেলে ফেলে'** মুরারীমোহন এসেছেন। মুরারীমোহন এসে আভাদেবী-সুরেন ঘটিত বিবাদ একটু উস্কে দিয়ে চলে যান। তারপর দিনও আভাদেবী না আসায় সুরেন আভাদেবীর খবর নেবার জন্য দামী সুন্দর চিঠি লেখার প্যাড কিনে আনে। এরপর বাড়িতে এসে দরজায় খিল দিয়ে আভাদেবীকে মনের কথা লিখতে বসে সুরেন। প্যাডের দু'তিন খানা পৃষ্ঠা নষ্ট করে ফেলল। কিছুতেই যেন মনের মত হচ্ছে না। শেষে অনেক ভেবে অনেক আশা আর আশঙ্কা নিয়ে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেলল সুরেন। খামের উপর ঠিকানা লিখতে যাবার মুহূর্তে বাইরের পদশব্দে চিঠিটা প্যাডের তলায় ঢাকা দিয়ে তারাতারি কপাট খুলল। দেখে আভাদেবী! মুরারীমোহনের ও অন্যান্যদের মানসিক অত্যাচারে স্কুলের চাকরি রিজাইন দিয়ে চলে যাবার পথে সুরেনের সঙ্গে দেখা করে ললিতের সঙ্গে তার বিচ্ছেদের কারণটি বলতে এসেছেন। সুরেন নির্বাক হয়ে শুনতে লাগল। আভাদেবী জানায় ললিতের সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ললিতের এক আর্টিষ্ট বন্ধুর চিঠি লেখার ভুল বোঝাবুঝিতে। রূপসী আভাদেবী জানায় তার প্রেমে অনেকেই পড়েছে, অনেকেই চিঠি দিয়েছে তাকে। এখানেও, এমনকি স্কুলের সেক্রেটারী মুরারীমোহন বাবু ও আরো অনেকে। আভা আর ললিতের **'লাভ ম্যারেজ।'** বিবাহের পর ললিতের এক আর্টিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় হয় আভার। ললিতের সে বন্ধু আভার প্রেমে পড়ে একটি চিঠি লিখে তাকে। আভাদেবী স্বামীর বন্ধুর এই কীর্তিতে হৈ-চৈ না করে চুপ করে থাকাটাই সমীচীন মনে করলেন। চিঠিখানা ড্রয়ারে রেখে দিলেন। সে চিঠি পেয়েই আভার সঙ্গে ললিতের যত অশান্তি এবং আভার গৃহত্যাগ। বন্ধুপত্নীর সম্পর্কে যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে তাই আভাদেবী বার বার এ কথাগুলি বলতে চেয়েও বলতে পারেন নি। ললিত তার ভুল বুঝতে পেরে আবার সংসারে ফিরে যেতে বলায় আভাদেবী চাকরী ছেড়ে সুখের সংসারে ফিরতে চলেছেন। চাকরী করে আভাদেবী বুঝেছেন, স্বামীর আশ্রয় ছাড়া নারীদের আর কোন সত্য আশ্রয় নেই। যেখানেই যাক, নানা ছুতোয় নানা পুরুষ পিছু নেবে। এরপর আভাদেবী বলেন— "আপনিই

দেখছি একমাত্র ব্যতিক্রম। সত্যি বলছি আপনি একমাত্র ভদ্রলোক যিনি সত্যি সত্যি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করেছেন, চিঠিপত্র লিখে বিরক্ত করেন নি। . . . . আপনার বন্ধু যা বলতেন, ঠিকই দেখছি, ষ্ট্রিক্‌লি পিউরিটান আপনি।" এরপর আভাদেবী চলে যান আর 'সুরেন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল' — এখানেই গল্পের শেষ।

গল্পটির কাহিনী বিন্যাস রেখচিত্রের মাধ্যমে এভাবে দেখানো যেতে পারে —

রেখচিত্র – ১

(কাহিনীর আবর্তন)

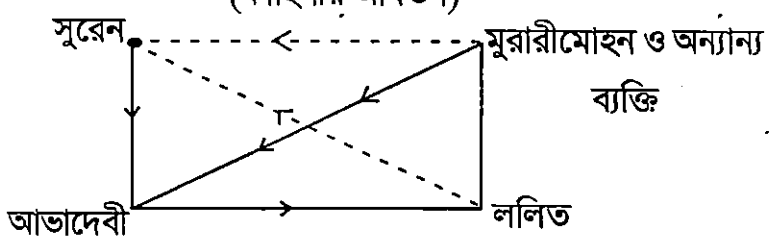

রেখচিত্র – ২

(কাহিনীর গতি)

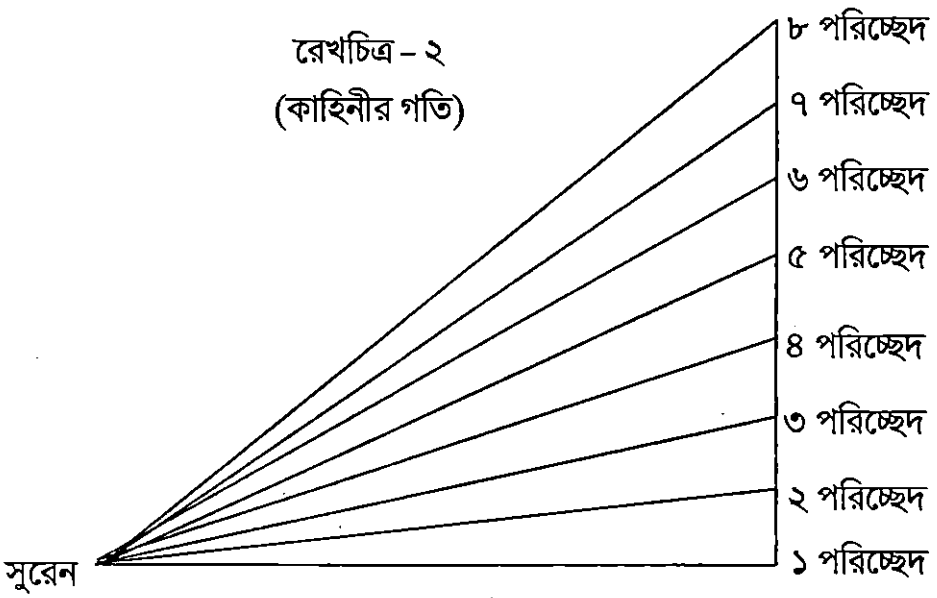

প্রথম রেখচিত্রে দেখানো হয়েছে কাহিনী সুরেনকে দিয়ে শুরু। সুরেন আভাকেন্দ্রিক, আভা ললিতকেন্দ্রিক, মুরারীমোহনবাবু ও অন্যান্যরা আভাকেন্দ্রিক আর সুরেনের সঙ্গে মুরারীমোহনের সাময়িক সম্পর্ক, ললিত ও সুরেনের সম্পর্ক সুরেনকে আভামুখী করে তার চরিত্র স্বরূপ উন্মোচন করেছে।

দ্বিতীয় রেখচিত্রে কাহিনীর গতিতে দেখানো হয়েছে, সুরেনের কাহিনীর কেন্দ্রে এবং আটটি পরিচ্ছেদই সুরেনের সঙ্গে কাহিনীর একমুখিযোগ।

গল্পের এই আখ্যান অংশে কাহিনী বৃত্ত সামান্যই। অবিবাহিত সুরেনের আজ-কালকার হাল

ফ্যাশন দুরস্থ মেয়েদের সম্পর্কে বিরুপ ভাব, অথচ শিক্ষিত রূপসী আভাদেবীকে দেখে তার সমস্ত ধ্যান-ধারণা পাল্টে যাওয়া, এমনকি **'পিউরিটান'** সুরেনের বন্ধুর বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি প্রেম নিবেদন! এটিই মূল ঘটনা। এই কাহিনীতে ফোড়ন দিয়েছে স্কুলের সেক্রেটারী মুরারীমোহনবাবু। তাতে সুরেনের মানসিক অবস্থা আরো আভামুখি হয়েছে এবং পাঠকের কৌতূহল সুরেন চরিত্রে নিবিষ্ট হয়েছে। বনফুলের গল্পরচনার বৈশিষ্ট্য এমনই। যেখানে চরিত্র থেকে ঘটনায় এবং ঘটনা থেকে চরিত্রে কাহিনী পসৃত হয়ে পরিণামীব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়।

"ব্যতিক্রম" গল্পের Climax বনফুল নিজস্ব স্টাইলে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র গল্পে ঘটনার বিবরণের পর আভার মুখে যখন সুরেনের সম্পর্কে বলান — **"আপনি দেখছি একমাত্র ব্যতিক্রম। সত্যি বলছি, আপনি একমাত্র ভদ্রলোক যিনি সত্যি সত্যি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করেছেন, চিঠিপত্র লিখে বিরক্ত করেননি।. . . . আপনার বন্ধু যা বলতেন ঠিকই দেখছি, ষ্ট্রিকলি পিউরিটান আপনি।"** - তখনই গল্পের **'মহামুহূর্ত'** নির্ধারিত হয়ে যায়। তার পর গল্পের সেই পরিণামীব্যঞ্জনা Catastrophae — **'সুরেন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।'** এভাবে কাহিনী ও প্লটের মধ্যে সনেটের ঘনপিনদ্ধতা, দৃঢ়বন্ধন বজায় থেকেছে। গল্পের পরিণামীব্যঞ্জনা, ইঙ্গিতধর্মী সংলাপে রক্ষিত হয়েছে। যে সুরেন বিয়ে করবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সে সুরেনই প্রেম নিবেদন করতে বসেছিল বন্ধুর বিবাহিতা স্ত্রীকে!

তাই গল্পটি শুধু প্রেমের গল্প নয়, প্রেম মনস্তত্বেরও গল্প। মানুষের মন কখন, কাকে আপন করে বসে তা সে নিজেও বুঝতে পারেনা। তাছাড়া নারী যে সর্বকালের সর্বদেশের পুরুষের কাছে আকর্ষণের বস্তু—এতত্ত্ব সুরেন, মুরারীমোহনবাবু ও অন্যান্য পুরুষের আভাদেবীকে বিভিন্ন রকমারী ধরনের চিঠি প্রদানের মধ্যে পরিস্ফূট।

সার্থক ছোটগল্পের মত **'ব্যতিক্রম'** গল্পের চরিত্র সংখ্যাও অল্প। মূল চরিত্র — সুরেন ও আভাদেবী। এছাড়া আছে ললিত, মুরারীমোহন চরিত্র দুটি। অপ্রধান চরিত্রগুলি কাহিনীর গতিবেগ সঞ্চারণে বিশেষ সহায়তা করেছে।

গল্পটি চরিত্রকেন্দ্রিক। মূল চরিত্র দু'টি — সুরেন ও ললিতের স্ত্রী আভা। সুরেন এ গল্পের নায়ক। তার অন্তরলোকের স্বরূপ উন্মোচনই শিল্পরস জমাট বাঁধিয়েছে। অকৃতদার **'পিউরিটান'** সুরেনের জীবনে এ যুগের শিক্ষিতা নারী এসে কিভাবে তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ধুলিসাৎ করে দিল তা চমৎকার ভাবে গল্পে চিত্রিত হয়েছে। আর আভাদেবী এযুগের শিক্ষিতা নারী হয়েও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী অথচ আদর্শবাদী নারীত্বে অবস্থিত থেকেছে। এই বিপরীত ভাবসৃষ্টি বনফুলের গল্পের একটি বিশেষ শিল্পবৈশিষ্ট্য। আভাদেবীর চরিত্রের সক্রিয়তা সুরেনের চরিত্র স্বরূপ উন্মোচনে সহায়তা করেছে, যা লেখকেরও উদ্দেশ্য ছিল। সুরেনের চরিত্রের এই পরিণতির জন্য আভাদেবী দায়ী নয়, সুরেনের চরিত্রের কামনার রন্ধ্রপথেই তার এই পরিণাম প্রবিষ্ট হয়েছে।

এ গল্পে লেখকব্যক্তিত্বটিও গভীর ভাবে উপস্থিত। প্রথম পরিচ্ছেদে যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ লেখকেরই উদ্দিষ্ট বিষয়। তিনিই যে এগল্প লিখছেন তা তার কথাতেই স্পষ্ট।

ছয় নং পরিচ্ছেদে তিনি লিখেছেন— **"যাক, কি মনে হইয়াছে তাহা আর নাই লিখিলাম। আমি গল্প লিখিতে বসিয়াছি, কাব্য নয়।"** তখন লেখকের এই বৈঠকীভঙ্গী ও সংক্ষেপরীতি তাঁর স্টাইলের অনুসারী হয়ে উঠে। যা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও দেখতে পাই। লেখকের এই সশরীরী উপস্থিতি গল্পে শ্লেষ, কটাক্ষ ও মিশ্রিত চাপাহাসি যা অনেকটা বক্রতা মেশানো তা সৃষ্টিতে এবং গল্পটিকে রসোত্তীর্ণ হতে সহায়ক হয়েছে।

গল্পের চরিত্র, বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা সৃষ্টি, যা বনফুলের শিল্প সাফল্যের একটি বিশেষ চাবিকাঠি, তা এগল্পেও দেখা যায়। এগল্পে সুরেন চরিত্রের গূঢ়রহস্য বোধক ভাষা ব্যবহার চরিত্রটির প্রতি আমাদের কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে — **"স্বাস্থ্যবান, সুরূপ, লেখাপড়া শেষ করিয়াছে, উপার্জন করিতেছে অথচ বিবাহ করেনা, এহেন সুরেনকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বিশেষ কিছু বলে না, খালি একটু হাসে। বহু অর্থবোধক ছোট্ট হাসিটুকুর বিশেষ কোনও তাৎপর্য বোঝা যায় না"** — লেখকের এ ভাষা ব্যবহারে সুরেনের হাসির তাৎপর্য অন্বেষণে পাঠক সুরেন চরিত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এছাড়া লেখক যখন সুরেনের মনের ভাব ব্যক্ত করছেন এই বলে —**"আজকাল খবরের কাগজের কল্যাণে যে-সব খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে আজকালকার মেয়েদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হয়না, ভয় হয়। মহাভারত রামায়নে পুরুষ – দুঃশাসন পুরুষ রাবণ ছিল, এখনও তাহারা অবশ্য আছে। কিন্তু স্ত্রী দুঃশাসন স্ত্রী রাবণের আমদানিটা বোধ হয় আধুনিক।"** — তখন ঠোঁটের কোনের বক্র হাসিটি আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। কিংবা গল্পকার যখন বলেন — **'এই সমস্যা সংকুল অবস্থাটার এমন একটা নিরামিষ গোছের সমাধান হইয়া যাওয়াতে . . . .'** বা সুরেন যখন বলেন **'আমিই ওকে সম্প্রতি চা-শিল্পে দীক্ষা দিয়েছি।'** তখন গল্পে হাল্কা হাসির মেজাজ লাগে। কিংবা আভাদেবী সুরেনকে যখন বলেন — **'আপনিই দেখছি একমাত্র ব্যতিক্রম . . . . . ষ্ট্রিকলি পিউরিটান।'** তখন গল্পে পরিণামী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়ে যায়।

গল্প সুরেনের ব্যতিক্রমী চরিত্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। গল্পের শেষে আভাদেবী যখন বলেন — **'আপনিই দেখছি একমাত্র ব্যতিক্রম।'** তখন সুরেন চরিত্রকেন্দ্রিক এই নামকরণের অর্থ পাঠকের বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু বনফুল এর অতিরিক্ত আরো নানা অর্থে **'ব্যতিক্রম'** শব্দটিকে প্রয়োগ করেছেন। সমস্ত গল্পে সুরেনের চোখে আভা ব্যতিক্রম। কেননা, আভাদেবীর সংস্পর্শে এসে সুরেনের আধুনিক শিক্ষিতা নারীর সম্পর্কে ধারণা একেবারে বদলে গিয়েছে। আবার আভার চোখেও সুরেন ব্যতিক্রম। কেননা অন্যান্য পুরুষ মানুষের মত সুরেন আভাদেবীকে চিঠি লিখে বিরক্ত করেনি। আবার যে সুরেন বিবাহের কথায় বিরক্তি প্রকাশ করত, সে সুরেনের মধ্যে প্রেম ভাবের উন্মোচনে সুরেন নিজেই নিজের চরিত্র-স্বভাবের ব্যতিক্রম। আবার সুরেনের মত নীতিবাগীশ মানুষের পক্ষে প্রেম, তাও বন্ধুর বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে! সুরেনের সমগ্র চরিত্রবৈশিষ্ট্যে এও এক সাংঘাতিক ব্যতিক্রম। তাই **'ব্যতিক্রম'** নামকরণটি বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা নিয়ে শিল্প সার্থক হয়ে উঠেছে।

এভাবে সমস্ত দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে **'ব্যতিক্রম'** গল্পটিকে একটি শিল্প সার্থক সৃষ্টি হিসেবে চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করতে পারি।

ঃঃ "ঐরাবত" গল্পের শিল্পসার্থকতা বিচার ঃঃ

"ঐরাবত" গল্পটি বনফুলের ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত **'বনফুলের আরো গল্প'** সংকলনে মুদ্রিত। গল্পটি ২১০টি, বাক্যে ১৬৬৮ টি শব্দে, সাতটি পরিচ্ছেদে, সাড়ে পাঁচ পাতার মধ্যে সমাপ্ত। গল্পটিতে সহজ স্বাভাবিক প্রাণধর্মের জয় ঘোষণা করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের সর্বদ্বার রুদ্ধ করে যে মনের কামনা – বাসনাকে রোধ করা যায় না, তা যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার স্বধর্মকে অনুসরণ করে চলে, তা ত্রিগুণানন্দের উদ্ভট জীবনাচরণ কিভাবে গঙ্গার তোড়ে ঐরাবতের ভেসে যাওয়ার মত জীবনস্রোতে ভেসে গেল তা চমৎকার ভাবে বনফুল গল্পে রূপায়িত করেছেন। তাই গল্পটি যে জৈব প্রবৃত্তিমূলক গল্প তা বলাই বাহুল্য।

গল্পটি চরিত্রাত্মক। ত্রিগুণানন্দবাবু যার কেন্দ্রে অবস্থিত এবং কাহিনী ত্রিগুণানন্দবাবু কেন্দ্রিক। গল্পটি কাহিনী অংশ সামান্য। ত্রিগুণানন্দ বাবু শুধু ত্রিগুণের নয়, বহুগুণের আকর। প্রচণ্ড ধার্মিক, প্রচণ্ড সংযমী অথচ বয়স চল্লিশের নীচেই। শরীরের প্রতি তাঁর ভীষণ লক্ষ্য, খুব ভোরে উঠে শরীর চর্চা করেন। লেখা পড়াও জানেন। ত্রিগুণানন্দবাবুর প্রসিদ্ধির কারণ তাঁর মৌলিকতা এবং তাঁর মৌলিকতার মূলকথা সকল জিনিসের গোড়া বেঁধে কাজ করা। এহেন ত্রিগুণানন্দ বাবু প্রত্যুষের আহারাদি শেষ করে চারক্রোশ দূরবর্তী কিষণপুর গ্রামে চলে যেতেন। যেখানে তিনি এক বিদ্যালয় খুলেছিলেন। উদ্দেশ্য —— গ্রামের বালক ও যুবকবৃন্দকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দেওয়া। ত্রিগুণাবাবু মনে করতেন, দেশের সকলে যদি ব্রহ্মচর্যের মর্মবস্তুর সঙ্গে পরিচিত হন তাহলে দুঃখ-দুর্দশা অচিরেই লুপ্ত হবে। গ্রামের সেই স্কুলে একদিন প্রাতঃকালে ত্রিগুণাবাবু গিয়ে দেখেনব্রহ্মচর্যা ভুলে তাঁর সমস্ত ছাত্রবৃন্দ বটবৃক্ষমূলে সঙ্গবদ্ধ হয়ে তন্ময়চিত্তে একটি মাসিক পত্রিকা পাঠ করছে। ত্রিগুণাবাবুকে দেখা মাত্র ত্রস্ত ছাত্রদের হাত থেকে মাসিক পত্রটি পড়ে যাওয়ায় তিনি তুলে দেখে চক্ষুস্থির। প্রথমেই মলাটের উপরে ঢেউ-খেলানো রঙিন অক্ষরে **'মরমী'** লেখা। আর তার পরের পাতা উল্টাতেই একটি নগ্ন নারীমূর্তি। তার পরই একটি কবিতা। ত্রিগুণাবাবু কবিতাটি পড়লেন, **'পড়িবামাত্র মৌলিক ত্রিগুণাবাবুও একটি অত্যন্ত অমৌলিক উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।'** তারপরেই একটি গল্প। একটি রোগাগোছের ছোকরা একসঙ্গে চারটি তরুনীর মহরা নিচ্ছে। এতো ভয়ানক কাণ্ড? পত্রিকা থেকে মুখ তুলতেই ত্রিগুণাবাবু দেখলেন সব ছাত্র পালিয়েছে। সেদিনই ত্রিগুণাবাবু কলকাতা গিয়ে **'মরমী'** কাগজের সম্পাদক, চিত্রকর নিধিরাম, গল্পলেখক সুজিত সেন

এবং কবি অমিয় পালিতকে বেধরক মার দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করান। এরকম কাজ করার কারন তিনি **'বখেরা'** মিটিয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। পুলিশ তদন্ত চলছে। ত্রিগুণাবাবু নিরুদ্দেশ। অনেক খোঁজ খবর করেও ত্রিগুণাবাবুর সন্ধান পাওয়া গেলনা। অনেকদিন কেটেছে। গল্পবক্তার মনে যখন ত্রিগুণাবাবুর স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে এসেছে, তখন তাঁর একটি চিঠি এসে হাজির। চিঠির বিষয় হল — পুলিশের ভয়ে তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। কলকাতা শহরে যেখানে যত মাসিকপত্র বিক্রি হয় সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজে, আধুনিক যুবক – যুবতীদের সংস্পর্শে এসে, সিনেমা দেখে বুঝেছেন **'বখেরা'** মেটানো অত সহজ নয়। এ অবস্থায় একরাতে শুয়ে শুয়ে কোন পন্থা অবলম্বন করা সংগত তা ভাবতে ভাবতে মানসপটে সিনেমা দৃষ্ট এক নায়িকার মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে এবং সে যেন মৃদু মৃদু তার দিকে চেয়ে হাসছে। কিছুক্ষণ পরে ইশ্বরেচ্ছায় মন থেকে মুখটি সরে গেলেও ঘুমের স্বপ্নে আবার সে মুখ দেখা দিল। স্বপ্নে যা ঘটল তা অবর্ণনীয়। ঘুম থেকে ধড়মড় করে জেগে উঠলেন ত্রিগুণাবাবু, কিন্তু তাও নিস্তার নেই। সেই মুখশ্রী ক্রমাগত মনের মধ্যে যাওয়া আসা করতে লাগল। এরূপ প্রত্যহ ঘটতে লাগল। **'কোনদিন সিনেমায় দেখা নায়িকা, কোনদিন মাসিকে দেখা ছবি, কোনদিন রাস্তায় দেখা তরুণী।'** পরে বুঝলেন বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা — তাঁর মনের কামনা মরেনি, ঘুমিয়েছিল। **'সেই সুপ্ত কামনা এখন ক্ষুদিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আহার দাবি করিতেছে।'** তাই সমস্ত **'বখেরা'** মিটিয়ে ফেলতে এক হাল ফ্যাশন দুরস্ত তন্বী তরুণীকে বিয়ে করে ফেললেন। নিজেও সাজসজ্জায় হয়ে উঠলেন আধুনিক যুবক। গল্পবক্তা প্রথমে বুঝতে পারেন নি। পরে ত্রিগুণাবাবু সেই তন্বী তরুণীকে **'বৌদি'** সম্বোধনে পরিচয় করালে গল্পবক্তা হেঁট হয়ে বৌদির পদধূলি গ্রহণ করলেন। এখানেই কাহিনীর শেষ।

সমস্ত গল্পটির কাহিনীতে ত্রিগুণানন্দবাবুর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কাহিনী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একমুখি গতিতে এগিয়েছে। মূলকাহিনীর সঙ্গে অন্যান্য ঘটনা যেটুকু যুক্ত হয়েছে তাও ত্রিগুণানন্দবাবু চরিত্রকে পরিস্ফূট করেছে এবং কাহিনীকে পরিণতির পথে এগিয়ে দিয়েছে। কাহিনীবৃত্তটি জটিল নয়, সরল। প্রথমে ত্রিগুণাবাবুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা তার ব্রহ্মচর্য স্কুল স্থাপন, সেই স্কুলের ছাত্রদের হাতে 'মরমী' পত্রিকা পেয়ে দেখে 'মরমী'র অফিসে গিয়ে সম্পাদক, চিত্রকর, গল্পলেখক, কবিকে পিটিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করান, পুলিশের শাসনজারি, ত্রিগুণাবাবুর নিরুদ্দিষ্ট হওয়া, লুকিয়ে সিনেমা দেখা, যুবক যুবতীর সান্নিধ্যে আসা, তার গোপন কামনা বাসনা উদ্রিক্ত হওয়া, শেষে এক তন্বী তরুণীকে বিবাহ করে সমস্ত 'বখেরা' মিটিয়ে ফেলা। সমস্ত কাহিনীতে বাড়তি কোন বিবৃতি নেই। ত্রিগুণাবাবুর মধ্য দিয়ে লেখকের জীবনদর্শন প্রকাশে যতটুকু পরিসর প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করেছেন। কাহিনী ঘটনা পরম্পরায় চরিত্রমুখি হয়ে পড়ায়, সংক্ষিপ্তি, সংহতি ও নাটকীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

গল্পটিতে ত্রিগুণাবাবুর চরিত্র বর্ণনা ও ঘটনা বর্ণনার মধ্য দিয়ে সংযমী ত্রিগুণাবাবুর মনে যখন সিনেমায় দেখা নায়িকা ও বাস্তবে দেখা তরুণীর মুখচ্ছবি ভেসে উঠেছে, কাহিনীও তত দ্রুত ঊর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে। Rising Action - এর পটভূমি Climax সৃষ্টি করেছে যখন ত্রিগুণাবাবু

বুঝলেন — **"আমার মনের কামনা মরে নাই, ঘুমাইয়াছিল। সেই সুপ্ত কামনা এখন ক্ষুধিত হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আহার দাবি করিতেছে।"** এর পর Falling Action - এ ত্রিগুণাবাবুর মনে পড়ে গঙ্গার তোড়ে ঐরাবত কিভাবে ভেসে গিয়েছিল। তারপরই ত্রিগুণাবাবুর তন্বী তরুণীকে বিবাহ ও গল্পবক্তার গৃহে আগমন এবং পরিণামী ব্যঞ্জনার সূচনা।

ত্রিগুণাবাবুর নিয়মনিষ্ঠা, সংযমী চরিত্র যে ঐরাবতের মত ভেসে যাবে তা গল্পকার গল্পের প্রথমেই বলে দিয়েছেন ইঙ্গিতে — **"ত্রিগুণানন্দবাবু শুধু ত্রিগুণ নয় — বহু গুণেরই আকর ছিলেন। প্রচণ্ড ধার্মিক, প্রচণ্ড সংযমী, অথচ বয়স চল্লিসের নীচেই। শরীরের প্রতি তাঁর ভীষণ লক্ষ্য।"** এরপর সিনেমার নায়িকা ও রাস্তার তরুণীর মুখচ্ছবি স্বপ্নে-জাগরণে বারবার ফিরে আসার বর্ণনায় এবং গঙ্গার তোড়ে ঐরাবতের ভেসে যাওয়ার পৌরাণিক গল্প পরোক্ষ ইঙ্গিতধর্মীতা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে।

সকল ছোটগল্পের মত এগল্পেও চরিত্র সংখ্যা স্বল্প। মূল চরিত্র ত্রিগুণানন্দবাবু। এছাড়া আছে গল্পবক্তা, **'মরমী'** পত্রিকার সম্পাদক, চিত্রকর, গল্পকার ও কবির চরিত্র, ত্রিগুণাবাবুর ছাত্র-ছাত্রীরা। কিন্তু প্রত্যেকটি অপ্রধান চরিত্রই মূল চরিত্র - বৈশিষ্ট্য উন্মোচনে সহায়তা করেছে।

এগল্পে লেখকব্যক্তিত্ব (Personality) কাহিনী বর্ণনা থেকে সরে থাকেনি। কাহিনীর শ্লেষপূর্ণ তির্যক মন্তব্যে, হাস্য পরিহাসে, ব্যঙ্গে, সংলাপ নির্মাণে, কাহিনীর নির্মেদী বর্ণনায় তা স্পষ্ট।

এ গল্পের চরিত্র, বিষয়বস্তু ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে সফল হয়েছেন বনফুল। ত্রিগুণাবাবুর চরিত্র বর্ণনায় যখন বলেন —**"ত্রিগুণাবাবু ত্রিগুণ নয় — বহু গুণেরই আকর ছিলেন। প্রচণ্ড ধার্মিক, প্রচণ্ড সংযমী অথচ বয়স চল্লিশের নীচেই।"**— তখন চরিত্রটির প্রতি লেখকের ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধে হয় না। ত্রিগুণাবাবুর প্রাত্যহিক কর্মের বর্ণনা দিয়ে যখন লেখক বলেন — **'কমপ্লিট'** বা ত্রিগুণাবাবুর **'বখেরা'** মেটানোর কথা তখন লেখকের ঠোঁটের কোনের মৃদু হাসিটি চিত্রময় হয়ে ওঠে এবং আমরাও হাসি। বনফুলের ভাষার বৈশিষ্ট হল, কাটাকাটা বাক্যে, সংযত, সংহতভাবে, ভাষায়, কাহিনীর বর্ণনা, যা এগল্পেও দেখতে পাই **'সাত'** পরিচ্ছেদে —

"ঐরাবত আসিতেছেন।
স্টেশনে গেলাম।
যথাসময়ে ট্রেন আসিল এবং ঐরাবত অবতরণ করিলেন।
সঙ্গে একটি হাল-ফ্যাশন-দুরস্ত-তন্বী তরুণী
ঐরাবতের চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।
ঐরাবত 'ক্লীন শেভড' গোঁফ দাড়ি একেবারে নাই।
মাথায় দশ-আনা ছ-আনা চুল ছাঁটা
মুখে একটি সুদৃশ্য পাইপে জ্বলন্ত সিগারেট।
পরিধানে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি এবং জরিপার মিহি ধূতি।

পায়ে পেটেন্ট লেদারের কুচকুচে কালো পাম্পসু।
হাতে সোনার রিস্টওয়াচ।
সর্বাঙ্গ হইতে ভুর ভুর করিয়া এসেন্সের গন্ধ ছড়িতেছে।"

এই বর্ণনাতে ঐরাবতের পরিবর্তিত চেহারাটি আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। এখানেই তো বনফুলের ভাষা নির্মাণের দক্ষতা।

'ঐরাবত' গল্পটি ত্রিগুণানন্দবাবুর জীবন কেন্দ্রিক। কাজেই গল্পটি চরিত্রকেন্দ্রিক। কিন্তু গল্পের নামটি ভাবকেন্দ্রিক। সমস্ত গল্পে ত্রিগুণাবাবুর কথা থাকলেও গল্পের শেষে 'সাত' পরিচ্ছেদে বনফুল ত্রিগুণানন্দ বাবুকে ঐরাবত নামে অভিহিত করেছেন। পৌরাণিক ঐরাবত যেমন গঙ্গার তোড়ে ভেসে গিয়েছিল, ত্রিগুণানন্দবাবু জীবনের স্বাভাবিক চাহিদাগুলোকে অস্বীকার করে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ ও অবসর পেতেই ত্রিগুণানন্দবাবুর মনের সেই সুপ্ত কামনা-বাসনা জেগে উঠে আহার দাবি করে এবং ত্রিগুণানন্দবাবু এক তন্বী তরুণীকে বিবাহ করতে বাধ্য হন সমস্ত 'বখেরা' মেটানোর জন্য। তাই গল্পের এই ভাবধর্মী নামকরণ তাৎপর্যবাহী, শিল্পগুণ মণ্ডিত ও সার্থক হয়েছে।

'ঐরাবত' গল্পটিকে সমস্ত দিক বিচার-বিশ্লেষণ করে একটি শিল্পগুণ সমন্বিত সার্থক ছোটগল্প হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।

-ঃ উল্লেখপঞ্জী ঃ-

১। 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস'—শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'শিল্পকলা' প্রবন্ধ। জিজ্ঞাসা প্রকাশনা। চতুর্থ প্রকাশ: জানুয়ারী ২০০৩। পৃ.-৪৭।

২। ঐ, পৃ.—৪৮-৪৯।

৩। 'সাহিত্যের মাত্রা — দ্বান্দ্বিকসূত্র'—ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থমেলা। প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৮১। পৃ.-২৯।

৪। 'Selected Literary Criticism'— edited by Anthony Beal. Heinemann pocket Book Edition, Reprint 1967. P.-260.

৫। 'An introduction to the study of literature'—Willam Henry Hudson. Kalyani Publishers, Ludhiana, Reprint - 1989. P. - 339.

৬। 'Novelist on the Novel'— Edited by Meriam Allott, Reprint-1965. P. - 235.

৭। 'English Short Stories of Today' — Second Series, Selected by DAN DAVIN, Oxford University Press, Reprinted 1959 and 1961, Pref-

ace, P.- V - VI.

৮। 'সাহিত্যে ছোটগল্প'— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চতুর্থ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৬। পৃ.–১৭৩–৭৮।

৯। 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'— শ্রী ভূদেব চৌধুরী। মডার্ণ বুকপ্রাইভেট লিমিটেড। পুনর্মুদ্রণ ২০০৬–০৭। পৃ.–৩১।

১০। 'রবীন্দ্রনাথঃ ছোটগল্পের প্রকরণ শিল্প'— গোপিকানাথ রায়চৌধুরী। সাহিত্যলোক। ডিসেম্বর, ১৯৯৭। পৃ.–২।

১১। 'সাহিত্যে ছোটগল্প'— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চতুর্থ মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৬। পৃ.–২১৮।

১২। 'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র'— চিরন্তন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বাণীশিল্প প্রকাশনা, দ্বিতীয় খণ্ড ,দ্বিতীয় সংস্করণ: সেপ্টেম্বর, ২০০৫, পৃ.–৭২১।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বনফুলের ছোটগল্পের সামগ্রিক মূল্যায়ন

ষষ্ঠ অধ্যায়

"বনফুলের ছোটগল্পের সামগ্রিক মূল্যায়ন"

'বনফুল'— এই নাম শব্দটির উচ্চারণে ও শ্রবণে বিশাল-বিস্তৃত বনভূমির বিচিত্র পুষ্পরাজির আমোদিত সৌরভের আভাস আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়। বস্তুর বিভিন্নতা, প্রকাশভঙ্গির নতুনতা, প্রকরণের অভিনবতা, জীবনব্যাখ্যার সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা প্রভৃতি আমাদের এক অনাস্বাদিতপূর্ব ছোটগল্পের জগতে নিয়ে যায়। যে জগতে ছোট লোক-বড় লোক, ধনী-দরিদ্র, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, কটাক্ষ-শ্লেষ—সবই আছে। সেখানে সহজ-সরল-স্বাভাবিক মানবজীবনের কথা যেমন আছে তেমনি তার অন্তর্শায়ী ভণ্ড, পাপী, অন্তসারশূন্য মানুষের কুটিল-জটিল জীবনকথাও। আর আছে মানবচরিত্রের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসঙ্গতির কথা, দরিদ্র নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের কথা, বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের আর্থিক দিক থেকে বিপর্যস্ত মানুষের কথা, আদিম জৈব প্রবৃত্তির কাছে মানব জীবনের পরাভবের কথা অদৃষ্টের হাতে মানবজীবনের বিড়ম্বনার কথা, সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ জীবনবোধের কথা— এক কথায় মানব চরিত্রের ও মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের স্বরূপ চিত্রায়িত ও উন্মোচিত হয়েছে তাঁর ৫৭৮ টি গল্পে।

এই বিপুল সংখ্যক গল্প আবার আকৃতির দিক থেকেও বিভিন্ন। কোনটি 'ছোট' কোনটি 'মাঝারি' কোনটি 'বড়' আকৃতির। তা সে যে আকৃতিরই হোক না কেন প্রত্যেকটি গল্পে বনফুল এমন অন্বিষ্ট জীবন দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন, যা তাঁর স্বভাব ধর্মকেও চিহ্নিত করে। বনফুল ছোটবেলা থেকেই যে পারিবারিক আবেষ্টনীতে বড় হয়ে উঠছিলেন, তাতেই তাঁর ব্যক্তিত্ব আপনা-আপনিই গড়ে উঠেছিল। বনফুলের সংযমী ব্যক্তিত্বের ছাপ আমরা তাঁর প্রত্যেকটি গল্পেই পাই। যেখানে বাক্যের বৃথা ব্যয় নেই, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি কাহিনী নাটকীয় ভঙ্গিতে দ্রুত ধাবিত হয়েছে। গল্পের কাহিনী বিন্যাসে নাটকীয় কৌশল পাঠকচিত্তকে এক অনির্বচনীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট করে। **"Dramatic Suspense- কে ক্রমশই পুঞ্জীভূত করে অত্যন্ত সন্তর্পণে অথচ স্বভাব সিদ্ধ আনমনে, শিল্প যেন সূক্ষ্মতন্ত্রী জীবনের ভাঁজ খুলে চলেছেন একের পর এক,—প্রতি ভাঁজে নতুন উৎকণ্ঠা নতুন কৌতূহল নতুন উদ্দীপনার পথে ঠেলে নিয়ে চলে। এই অর্থেই বনফুলের প্রকরণ ও বিজ্ঞানী প্রবণতার সৃষ্টি—ভাঁজে ভাঁজে সংকুচিত গোপন জীবনসত্যকে ধাপে ধাপে আবিষ্কার করে এগিয়ে চলেছেন তিনি। প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ভুল আঙ্কিক হিসাবে পরিচালিত—ফলে প্রত্যেকটি বাক্য, এমনকি প্রতিটি শব্দও, গল্প-রহস্যের উন্মোচনে যেন অনিবার্যতার কঠিন বন্ধনে সংলগ্ন। এই কারণে বনফুলের ছোটগল্পের শরীরে একটি শব্দকে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত অথবা পরিমার্জিত করার উপায় নেই।"**[১] হ্যাঁ, বনফুল এমনই লেখক। তাঁর বিবিধ আকৃতির ও বিবিধ শ্রেণীর গল্পের আলোচনায় এই বৈশিষ্ট্যগুলিই খুঁজে পেয়েছি। তবে কাহিনীর সংস্থাপনে আমার কোথাও বনফুলকে 'আনমনে' মনে হয়নি। বনফুল

তাঁর বক্তব্যকে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যে গল্পে উপস্থাপিত করেছেন। হ্যাঁ, ব্যক্তিগত জীবনে বাইরে থেকে দেখতে অনেককে **'আত্মসচেতন'** মনে নাও হতে পারে। কিন্তু সে মানুষটি যখন শিল্পসৃষ্টি করতে যাবেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকেন, নচেৎ তাঁর সৃষ্টি মাঠে মারা যাবে যে! বনফুলের মধ্যে এক **'দুর্দান্ত প্রাণশক্তি'** ছিল যার জন্য তিনি অনায়াসে বাইরের ঔদাসীন্যকে দুঃসাহসিক ব্যঙ্গের সাহায্যে উল্টে দিতে পারতেন। এটি তাঁর চরিত্রের কোন স্ববিরোধিতা নয়, এটিই তাঁর ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব যা, শিল্পসৃষ্টিতে অন্বিত। বৃত্তিতে চিকিৎসক বনফুল মানবজীবনকে অস্ত্রোপচারের ডিশেক্‌শান টেবিলে রেখে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাপ্রবণ দৃষ্টিতে মানব চরিত্রের বিবিধ বৃত্তিগুলিকে **'বুদ্ধিরস'** এর যোগানে চমকপ্রদভাবে রূপায়িত করেছেন। এই জীবন রূপায়ণে তাই কোন ভাবালুতা নেই, আছে এক নিস্পৃহ দৃষ্টি। তবে সেই নিস্পৃহ মনোভাব শেষ পর্যন্ত মানবিক বোধে উত্তীর্ণ হয়েছে। বনফুল নিজের চিন্তা-ভাবনা আদর্শ দ্বারা বিষয় নির্বাচন করে নিজের মত করে তা পরিবেশন করেছেন। মানবজীবন সম্পর্কে তাঁর সর্বদা কৌতূহল জাগরূপ ছিল। তাই মানব চরিত্রের বিবিধ রং- বৈচিত্র্য তাঁকে **'ইন্সপায়ার'** করত। সেকারণে তাঁর গল্পের এত বৈচিত্র্য, প্রকরণের এত বিভিন্নতা। বনফুলের গল্প সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়গুলির আলোচনায় আমি তা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

বনফুলের গল্পের বিষয়গুলি একটু গভীর ও নিবিড় ভাবে লক্ষ্য করলে দেখব সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অকিঞ্চিতকর। অথচ তারই মধ্যদিয়ে জীবনের এক চরম সত্য রূপায়িত করেছেন তিনি। ফুল,পশু-পাখি, জনমানুষ থেকে শুরু করে 'আগাছা' পর্যন্ত তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু পরিমল গোস্বামী লিখেছেন— **"তোমার কলমে সবরকম গল্পই এসেছে। এ এক চমকপ্রদ ব্যাপার। হাতী থেকে প্রজাপতি সব রকম গল্পসৃষ্টির ব্রহ্মা হয়ে বসে আছ তুমি, তাই তোমার লেখায় আমার বিস্ময় জাগে।"**[২] তা সে বিষয় যত অকিঞ্চিতকরই হোক না কেন তার মধ্যে গভীর জীবনসত্য রূপায়ণ করেছেন বনফুল। সমালোচকেরা বনফুলের গল্পে ভাবের গভীরতার অভাবের কথা বলেছেন। কিন্তু বনফুলের গল্পগুলি যদি **'একটু ঝুঁকে পড়ে দেখা যায়'** ও একটু গভীরভাবে ভাবা যায় তাহলেই আমরা বুঝতে পারি বনফুল কত সাধারণ ভঙ্গিতে, বিষয়ে, কত গভীর ভাবের গল্প বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন। বনফুলের সৃষ্টির কালোত্তীর্ণতা তাঁর শিল্পমূল্যকে নির্ধারণ করে দিয়েছে। বনফুলের গল্পে পরিহাস,ব্যঙ্গ,শ্লেষ, কটাক্ষ এমন এক সহজ-সরল ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে, যা বনফুলের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করে। **"বলাইবাবু একঘেঁয়ে মসৃণ কাহিনী লেখেন নি। তাছাড়া তাঁর কাহিনীতে বুদ্ধিরসের যোগান আছে। বাঙালী পাঠকের ডিস্‌পেপ্‌টিক মানসে বুদ্ধিরস দুষ্পাচ্য। এখানেই বলাইবাবুর বিশেষত্ব।"**[৩]

বনফুলের বিপুল-বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভারের গল্পগুলিকে পূর্বের অধ্যায়গুলিতে আমি **'ছোট'**(অর্থাৎ যে গল্পগুলি দুপৃষ্ঠার মধ্যে সমাপ্ত) **'মাঝারি'** (অর্থাৎ যে গল্পগুলি দু-পৃষ্ঠা থেকে বেশী কিন্তু পাঁচ পৃষ্ঠা থেকে কম) এবং **'বড়'** (অর্থাৎ যে গল্পগুলি পাঁচ পৃষ্ঠা বা তার বেশি) — এই তিন আয়তনে

বিভক্ত করে বেশ কিছু গল্প আলোচনা করেছি। সেই আলোচনায় দেখিয়েছি কি **'ছোট'**, কি **'মাঝারি'**, কি **'বড়'** তিন শ্রেণীর গল্পরচনাতেই বনফুল সমান দক্ষ। একটি গল্পকে **'ছোটগল্প'** হয়ে উঠতে গেলে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন তার সবগুলি তাঁর গল্পে উপস্থিত। তাঁর **'ছোট'** আকৃতির অণুগল্প বা মিনিগল্পগুলি তাঁকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। কিন্তু সেগুলি ছাড়াও **'মাঝারি'** ও **'বড়'** আকৃতির রচনাতেও যে তিনি সমান দক্ষ তা প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর **'ছোট'** আকৃতির কোন কোন গল্পে যেমন অনেকে গল্পত্ব বলে কিছু খুঁজে পান না, তাতে তাঁরা আখ্যানত্বই সেখানে দেখতে পান। কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বনফুল ছোটগল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্যে সেগুলিকে উদ্ভাসিত করেছেন। আর **"আধুনিক ছোটগল্পে ঘটনা থাকতেই হবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই। একটি মুহূর্তের বিলাস, একটি মনন, একটুখানি দেখা, একটি মেজাজ, খানিক জাগর-স্বপ্ন (Surrealism) — এরা সবাই-ই একালের ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে।"**[৪] কেননা আধুনিক ছোটগল্পের বিষয় বিন্দুবৎ হয়ে যাচ্ছে। তাই বৃত্তান্তের দিকে লেখক না ঝুঁকে জীবনের এক কোন চিরন্তনসত্যের রূপনির্মাণে আলোক সম্পাত করেন। একথাগুলি বনফুলের **'ছোট'** আকৃতির অণুগল্প বা মিনি গল্পগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই বনফুলের 'ছোট'গল্পগুলি যত ছোটই হোক না কেন তাতে জীবনের এক চরম সত্য রূপলাভ করেছে এবং তাতে ছোটগল্পের **'গল্পত্ব'**ও পুরোপুরি উপস্থিত। একইভাবে **'মাঝারি'** ও **'বড়'** আকৃতির গল্পগুলিতে লক্ষ্য করা যায় যে সার্থক ছোটগল্পের যা যা বৈশিষ্ট্য একটি গল্পে থাকা উচিৎ, সে বৈশিষ্ট্যগুলি সেখানেও লভ্য। এই ত্রিবিধ আকৃতির গল্পে বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিষয়বস্তুর বিন্যাস কৌশল, কাহিনীর একমুখিগতি, সংযত সংহত ভাষা ব্যবহার, আয়তনের সংক্ষিপ্তি, ব্যঞ্জনাধর্মীতা—সবকিছু মিলে সেগুলি প্রত্যেকটি সার্থক ছোটগল্পে পর্যবসিত হয়েছে। বনফুলের **'ছোট'** আকৃতির গল্পগুলি লক্ষ্য করলে দেখব যে সেখানে বিষয়বস্তুর বিন্যাস এমন আঁটসাঁটভাবে বাধা যেখান থেকে কোন একটি বাক্য বা শব্দকে বাদ দেওয়া অসম্ভব। বনফুলের কঠোর সংযমী ব্যক্তিত্ব এই ব্যতিক্রমী শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কম প্রতিভাবান লেখকের হাতে পড়লে তা যে বিফলতায় পর্যবসিত হত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বনফুলের শিল্পী-ব্যাক্তিত্বের এখানেই কেরামতি। অথচ তিনি দীর্ঘ চৌদ্দ পাতার ('অর্জুন মণ্ডল') গল্পও লিখতে পারেন। আসলে বক্তব্য-বিষয়কে যথাযথ বর্ণনার জন্য যে টুকু আয়তন প্রয়োজন সেটুকুই তিনি নিয়েছেন। কোন গল্প কোথায় শুরু করতে হবে বা শেষ করতে হবে তা তিনি ভালো ভাবেই জানতেন। বনফুলের এই কঠোর সংযমী ব্যক্তিত্বই তাঁর গল্পের আয়তন সৃষ্টির পক্ষে বড় ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া বিষয়বস্তুর নির্বাচন এবং তাকে উপস্থাপন করার মধ্যে একটি বিশেষ কৌশল নিয়েছিলেন বনফুল। যা তৎকালীন অন্যান্য লেখকদের রচণায় পাই না।

বনফুলের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই বিরোধ বা বিপ্রতীপতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বিরোধসৃষ্টিতে কাহিনী ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আপনা-আপনি পরিণতির পথে এগিয়েছে। আর শেষে নাটকীয় ভঙ্গিতে **'চাবুক-হাঁকড়ানো সমাপ্তি'**তে (Whip crack ending) পাঠকের মনে বিস্ময়

উৎপাদন করেছে। বনফুলের গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনাই তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। বনফুলের বেশিরভাগ গল্পেরই বৃত্তান্ত অংশ খুব কম। সংযত ভাষায় ব্যাখ্যাহীন, বর্ণনাহীন, দৃশ্যস্পষ্ট হীন পদাকাঙ্ক্ষার দ্বারা অন্বিত কাটা কাটা বাক্যে কার্য-কারণ সূত্রে গ্রন্থিত কয়েকটি ঘটনার ধাপ নির্মাণ করে অকস্মাৎ উঁচু সিঁড়ি থেকে অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার মত সংঘটনে সমাপ্তি টানেন। এবিষয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী মহাশয় লিখেছেন— **"কুতুহলী পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে দূর থেকে দেখেন 'বনফুল'। সবটুকুকে একসঙ্গে এক নজরে দেখেন না। নাটকের দৃশ্যের মত ছোট টুকরো করে নিয়ে দেখেন। বৈজ্ঞানিক বাইনোকুলার দিয়ে যেন পাখি দেখছেন। এক এক সময় এক সীমাবদ্ধ বৃত্তের উপর তার নজর। এই কাটা কাটা ভাবটাই তাঁর পছন্দ।"**[৫] এই বৈশিষ্ট্যগুলি বনফুলের **'ছোট'** ('নিমগাছ','ছোটলোক','জ্যোৎস্না', প্রভৃতি), **'মাঝারি'** ('জৈবিক নিয়ম', 'মুহূর্তের মহিমা' প্রভৃতি) এবং **'বড়'** ('ঐরাবত' প্রভৃতি) —এই তিন আয়তনের গল্পেই লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকটি কাটা কাটা বর্ণনা পদাকাঙ্ক্ষার দ্বারা কাহিনীর মধ্যে ঐক্য বজায় রেখেছে। এই কাটা কাটা বর্ণনাতে গল্প দ্রুত গতি প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরিণতিকে তীব্রতর,শক্তি শালী ও নাটকীয় করে তুলেছে।

বনফুলের গল্পের বিষয় মহাকাব্যোপম স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিস্তারী। তাই সেখানে মানব জীবনের বিবিধ অনুভূতি রূপায়িত হয়েছে। বিষয়বস্তু বাস্তব আর কল্পনার মিশ্রণে,লৌকিক আর অলৌকিতার সমন্বয়ে, বর্তমান আর পুরাণের সংমিশ্রণে, সমান্তরতা আর বিরোধের সমবায়ে চমৎকারিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। একালের সমালোচনায় যাকে 'ম্যাজিক রিয়ালিজম' (যাদু বাস্তবতা), বা 'হ্যালোসিনেশন' বা 'ড্রিম রিয়ালিজম' বলেছেন তা বনফুলের গল্পে আমরা নানাভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি। এ সবের রূপায়ণ হয়েছে কাহিনীর চয়ন, বয়ন এবং 'Cohesion' নির্মাণে। 'Cohesion' হল পূর্বের সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাকে যুক্ত করে আখ্যানকে ঐক্য দান করা। আসলে **"তিনি ছিলেন আধুনিক ও উত্তীর্ণ-আধুনিক সাহিত্যের আঙ্গিক অনুশীলনকারী যা আমরা সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে পাইনি।"**[৬]

কোন মহান সাহিত্যিকই দেশ-কাল নিরপেক্ষ হতে পারেন না। সমকালের ও পূর্ববর্তীকালের নানা ঘটনা, বিষয়, পরিবেশ-পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিকতা, সমাজ-অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সাহিত্যিকদের রচনা কোন না কোন ভাবে পড়বেই। অন্যান্য সাহিত্যিকদের মত বনফুলের মধ্যেও পড়েছিল। তাঁর সমসাময়িক নানা ঘটনা, বিষয়, রাজনীতি, রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি, সমাজনীতি লেখক শিল্পীদের রচনার ধারা ও ধরন কোন কোন ক্ষেত্রে পড়লেও পড়তে পারে। কেননা সমালোচকেরা বনফুলের **'ছোট'** আকৃতির অণু বা মিনি গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথের লিপিকা-র ও ও'হেনরির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এধরনের ছোট ছোট ('Short short') গল্প রচনার প্রবণতা বহু প্রাচীন। বিষ্ণুশর্মার 'পঞ্চতন্ত্র', 'হিতোপদেশ', ইশপের গল্পগুলি, সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর' বাইবেলের দুখণ্ডের গল্পগুলি, ইংরেজিতে প্যারাবল বা রূপকজাতীয় গল্পগুলি, জোক্স জাতীয় রচনাগুলিতে ইতিপূর্বে তার আভাস ফুটে উঠেছে। তবে মোদ্দাকথা হল সেই

অনুসৃত ভাবনাকে নিজস্ব ভঙ্গিতে রূপদানের মধ্য দিয়ে মৌলিক এবং বিশিষ্ট করে তোলার মধ্যে। যা বনফুল অনায়াসে করেছেন। পূর্ববর্তী ও সমকালীন কোন কোন মহৎ সাহিত্যিকদের প্রভাব কারো উপর পড়বে না বা থাকবে না — তেমনটা হতেই পারে না। কেউই আকাশ থেকে পড়ে না। বাস্তবের আলো হাওয়া মাটিতেই তাঁর জীবনের সূচনা, ভিত্তি ও সমাপ্তি। তা সে প্রভাবজাত হোক বা মৌলিকই হোক বনফুলের সমগ্র গল্পে মানব জীবনের যে রূপ চিত্রায়িত হয়েছে তা যেমন আমাদের ভাবিয়ে তোলে তেমনি চমকে দেয়। ছোটগল্পে যে চিত্র উদ্ভাসিত হয় তা দু'জাতের – **"পোট্রেট অর্থাৎ ছবি, এবং ক্লোজ-আপ অর্থাৎ চেহারা। পোট্রেট ভাবিয়ে তোলে ক্লোজ্ আপ্ চমক দেয়। বনফুলের অসাধারণ দক্ষতা ক্লোজআপে।"**[৭] কিন্তু বনফুলের সমস্ত গল্প নিবিড়ভাবে পাঠ করে আমার মনে হয়েছে, বনফুলের দক্ষতা শুধু চমক লাগানোতে নয়, ভাবিয়ে তোলাতেও। বনফুলের গল্পের শেষের নাটকীয় চমক যে সত্যের উদ্ভাস ঘটায় সেখান থেকেই পাঠকমনে ভাবনার অনুরণন চলতে থাকে।

বনফুল সারা জীবনব্যাপী যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাঁর সঙ্গে নিজের জীবনদর্শনকে সুচারুরূপে মিশিয়ে এক-একটি অসাধারণ গল্প রচনা করেছেন। বনফুল তাঁর গল্পে চলমান জীবনের কথা বলেছেন, যে জীবন সুস্থভাবে, সুষ্ঠুভাবে, সত্যের সঙ্গে আদর্শ ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে চলার কথাই বলে। **"তাই ছোটগল্পকে 'চোরা লণ্ঠনের আলো' বলা যায় না আর;বরং তাকে ভাবতে হয় দাউদাউ আগুনের স্ফুলিঙ্গ হিসেবে।"**[৮]

বনফুল তাঁর ছোটগল্পের ভাষাশৈলী নির্মাণেও এক বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছেন। বর্ণনা অংশে সাধুভাষা এবং প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিতভাষা প্রয়োগ করেছেন। বাক্য নির্মিতিতে ছোট-মাঝারি-বড়— এই ত্রিবিধ শ্রেণীর বাক্য বিচিত্রভাবে প্রয়োগ করেছেন। এতে গল্পের বৈচিত্র্য যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি গল্পের গতি অব্যাহত থেকেছে। ছোট ছোট সরল বাক্যের ব্যবহারের পাশাপাশি একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ জটিল, যৌগিক বাক্য প্রয়োগও করেছেন। সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করেছেন। কর্তাহীন, ক্রিয়াহীন ছোট ছোট কাটা কাটা বাক্য তৈরী করেছেন। কখনো এক-একটি শব্দে এক-একটি বাক্য তৈরী করেছেন। এতে কাহিনী ক্ষিপ্রগতিপ্রাপ্ত হয়েছে। বাক্যগুলিতে কাব্যগুণ, চিত্রগুণ পরিব্যাপ্ত। বিশেষণধর্মী বাক্যাংশ ব্যবহার, উপমা-রূপক বিবিধ অলংকারের প্রয়োগ গল্পের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। তাছাড়া ভাষারীতিতে কথ্যভঙ্গির প্রবণতা এত প্রবল যে, মনেই হয় না তা সাহিত্যের ভাষা। মুখের ভাষাকে সাহিত্যের কৌলিন্যদানে বনফুলের বিশেষ অবদান আছে। চলিত ভাষারীতিতে তো আছেই, সাধুভাষারীতিতেও তিনি ক্রিয়াপদ আর সর্বনামপদ ছাড়া বিশেষ কিছু পরিবর্তন করেন নি। এমনকি যে সাধু ভাষায় তিনি এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সচরাচর আমরা কথ্যভাষায় ব্যবহার করি। সেকারণে বনফুলের গল্পে তৎসম শব্দবহুল ভাষারীতির তুলনায় তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দে বাহুল্য লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারও আছে। বনফুলের গল্পের ভাষাশৈলীর আর একটি বিশিষ্ট দিক হল ইংরেজি শব্দের ব্যবহার এবং ভাষামুদ্রা (Register) ব্যবহার। ট্রেন সংক্রান্ত, ডাক্তারী সংক্রান্ত অনেক

'ভাষামুদ্রা' ব্যবহার করেছেন বনফুল। বনফুল পেশায় ছিলেন চিকিৎসক এবং তাঁর বাসস্থান ও অন্যান্য জায়গায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে ট্রেনই ছিল সংযোজক। তাই এ ধরনের ভাষামুদ্রা ব্যবহার তাঁর গল্পে যেন খুবই স্বাভাবিক ছিল, তেমনি তাঁর ভাষার বিশিষ্টতাকে তা চিহ্নিত করেছে। এর সঙ্গে আছে হিন্দি শব্দ, বাক্যের ব্যবহার। তাঁর অনেক গল্পের চরিত্র হিন্দীভাষী বিহারী। এই বিবিধ শ্রেণীর চরিত্রের ভাষাশৈলী নির্মাণে বনফুলের কৃতিত্ব প্রশ্নাতীত।

বনফুলের ভাষাশৈলীর স্বচ্ছতা (ক্ল্যারিটি), সরলতা (সিম্প্লিসিটি), সংক্ষিপ্তি (ব্রেভিটি) এবং সরসতা তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। বনফুলের ভাষাশৈলী থেকেই বনফুলের ব্যক্তিত্ব 'স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এই নিগূঢ় অন্বয়ে বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী সফলতা অর্জন করেছে। বনফুলের গল্পের ভাষা বিষয়ের আলোকে উদ্ভাসিত ঝকঝকে এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন। বনফুলের গল্পের ভাষা, বাক্য এমনভাবে বিন্যস্ত যাতে শুধু ভাষার বিশিষ্টতা নয়, চরিত্রটির অন্তর্ধর্ম সেই বাক্য ছাঁচে ধরা পড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে **'মুহূর্তের মহিমা'** ঐরাবত গল্পের নাম উল্লেখ করতে পারি। এবিষয়ে পূর্বের অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। বনফুলের প্রত্যেকটি গল্পের ভাষাশৈল্পী নির্মাণে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ মুদ্রিত করেছেন। ভাষার সঙ্গে বিষয় এবং লেখক ব্যক্তিত্বের অন্বয়ে এক বিশিষ্ট ভাষাশৈলী নির্মিত হয়েছে বনফুলের ছোটগল্পে। যেখানে তিনি পুরোপুরি সফল এবং একক।

বনফুলের ছোটগল্পের শিল্পসার্থকতা প্রসঙ্গে একথা নিসন্দেহে বলা যায় যে তিনি একজন সার্থক শিল্পী। কাহিনীর চয়ন, কাহিনীর বয়ন, কাহিনীর একমুখিনতা, ব্যঞ্জনাধর্মীতা, বিষয় ও চরিত্র অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের নিপুণতা বনফুলের ছোটগল্পগুলিকে সার্থক ছোটগল্পে পরিণত করেছে। তাঁর কি **'ছোট'** কি **'মাঝারি'** কি **'বড়'** তিন ধরনের গল্পেই ছোটগল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সার্থকভাবে উপস্থিত।

–ঃ উল্লেখপঞ্জী ঃ–

১) 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' —শ্রীভূদেব চৌধুরী। মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃলিঃ। পুনর্মুদ্রণ ২০০৬–২০০৭। পৃ.– ৫৪১।

২) 'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র'—চিরন্তন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। বাণীশিল্প। দ্বিতীয় সংস্করণ:, সেপ্টেম্বর ২০০৫, দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ.–৭৫৫।

৩) 'বনফুলের ফুলবন'—ড.সুকুমার সেন। সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ: দোল পূর্ণিমা ১৩৯০। পৃ.– ১০।

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী এবং প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী এবং প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা

(ক) বাংলা গ্রন্থঃ-

(অ)

১) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—'কালের পুত্তলিকা'। দে'জ পাবলিশিং। তৃতীয় সংস্করণ : বৈশাখ ১৪১১, এপ্রিল ২০০৪।

২) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—'সাহিত্য সন্ধান'। সাহিত্য বিহার। দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ ১৯৮৮।

৩) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—'কল্লোলযুগ'। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। দশম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৪১৬।

৪) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—'বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা'। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৪।

৫) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—'কালের প্রতিমা'। দে'জ পাবলিশিং। চতুর্থ সংস্করণ : নভেম্বর ২০০৫।

৬) অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস'। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম দে'জ সংস্করণ : জুলাই, ২০০০।

৭) অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—'সমালোচনার কথা'। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। পুনর্মুদ্রণ : ২০০৮-২০০৯, পরিশিষ্ট—১।

৮) অন্নদাশঙ্কর রায়—'বনফুল প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ। ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত। বাণীশিল্প প্রকাশনা । প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮২।

৯) অপূর্বকুমার রায়—'শৈলী বিজ্ঞান'। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম দে'জ সংস্করণ : অক্টোবর ২০০৬।

(উ)

১০) উজ্জ্বল কুমার মজুমদার— 'বনফুলের ছোটগল্প' প্রবন্ধ। ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত। বাণীশিল্প প্রকাশনা । প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮২।

১১) উজ্জ্বল কুমার মজুমদার— 'সাহিত্য সমালোচনার রূপ ও রীতি'। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী২০০৩।

(গ)

১১) গোপিকানাথ রায়চৌধুরী— 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য'। দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৪০৭/জুন ২০১০।

১২) গোপিকানাথ রায়চৌধুরী— 'রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের প্রকরণশিল্প'। সাহিত্যলোক। ডিসেম্বর,১৯৯৭।

(চ)

১৩) চিরন্তন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত— 'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র'। বাণীশিল্প প্রকাশনা । প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০৫।

১৪) চিরন্তন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত— 'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র'। বাণীশিল্প প্রকাশনা। দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০০৫।

(জ)

১৫) জগদীশ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত— 'বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প'। বাণীশিল্প সংস্করণ : জুলাই ২০০১, ভূমিকা।

(ড)

১৬) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' । মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ : ১৯৯৫।

১৭) ড. সুকুমার সেন— 'বনফুলের ফুলবন'। সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা ১৩৯০।

১৮) ড. সরোজমোহন মিত্র— 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প'। তুলসী প্রকাশনী। প্রথম সংস্করণ : আগষ্ট ১৯৯৭।

১৯) ড. ঊর্মি নন্দী—'বনফুল : জীবন, মন ও সাহিত্য'। করুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ:কলিকাতা পুস্তকমেলা – ১৯৯৭।

২০) ড. ঊর্মি নন্দী—'বনফুলের জীবনকথা: শিল্পপ্রসঙ্গে'। করুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ– ১৯৯৯।

২১) ড. অভিজিৎ মজুমদার—'শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব'। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম প্রকাশ : কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ২০০৭ ।

২২) ড. গিরিন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—'শৈলীবিজ্ঞান পরিচিতি'। প্রজ্ঞা বিকাশ। প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ২০০৭।

২৩) ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত—'কাব্যালোক'। দে'জ পাবলিশিং। প্রথম দে'জ সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৯৮।

২৪) ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়—'সাহিত্য-বিবেক'। দে'জ পাবলিশিং। তৃতীয় সংস্করণ: জানুয়ারী ২০০৩ ।

২৫) ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়—'সাহিত্যের মাত্রা — দ্বান্দ্বিকসূত্র'। গ্রন্থমেলা। প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৮১।

(ত)

২৬) তপোধীর ভট্টাচার্য—'ছোটগল্পের বিনির্মাণ'। অঞ্জলি পাবলিশার্স। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ: জুলাই, ২০০৬।

(দ)

২৭) দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ—'আত্মশুদ্ধ জীবন দৃষ্টির আলোকে বনফুল'(প্রবন্ধ)। ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' – গ্রন্থে মুদ্রিত। বাণীশিল্প প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৮২।

(ধ)

২৮) ধীমান দাশগুপ্ত —সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য'। বাণীশিল্প প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৮২।

(ন)

২৯) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—'বাংলা গল্প বিচিত্রা'। প্রকাশ ভবন। পঞ্চম মুদ্রণ: আশ্বিন ১৪১০।

৩০) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—'সাহিত্যে ছোটগল্পে'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চতুর্থ মুদ্রণ: শ্রাবণ ১৪১৬।

৩১) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়— 'ছোটগল্পের সীমারেখা'। বাক্‌সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় মুদ্রণ: ফাল্গুণ, ১৪১২।

(প)

৩২) পবিত্র সরকার—'কথাসূত্র'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১০।

৩৩) পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য— 'সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'। দ্বিতীয় খণ্ড, জয়দুর্গা লাইব্রেরী প্রকাশনা। দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০০২।

৩৪) পবিত্র সরকার—'গদ্যরীতি পদ্যরীতি'। সাহিত্যলোক। প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫।

(ব)

৩৫) বনফুল— 'রচনাবলী' (১-২৪ খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় প্রকাশ: ১৮ই জুলাই ২০০১।

৩৬) বীরেন্দ্র দত্ত—'বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ' । প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ: ২০০৩ মার্চ –২০০৪ এপ্রিল।

৩৭) বুদ্ধদেব বসু—'প্রবন্ধ সংকলন'। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধ। দে'জ পাবলিশিং। ষষ্ঠ সংস্করণ: আগষ্ট ২০০৮।

৩৮) বুদ্ধদেব বসু—'রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য'। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। চতুর্থ মুদ্রণ: জানুয়ারী ১৯৮৩।

৩৯) বনফুল—'পশ্চাৎপট'(১৬ - তম খণ্ড) । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় প্রকাশ: ২রা শ্রাবণ, ১৪০৭/১৮ই জুলাই, ২০০০।

৪০) বনফুল—'মর্জিমহল'(২৪-তম খণ্ড)। তৃতীয় সংস্করণ: ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০০।

৪১) বনফুল—'কাব্যপ্রসঙ্গ' : 'শিক্ষার ভিত্তি' (দ্বাদশ খণ্ড), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় প্রকাশ: ২৭শে আশ্বিন ১৪১০/১৪ই অক্টোবর ২০০৩।

৪২) বনফুল— 'রবীন্দ্রস্মৃতি' (বনফুল রচনাবলী ১৯তম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। তৃতীয় প্রকাশ ২রা শ্রাবণ, ১৪০৭/১৮ই জুলাই, ২০০০।

৪৩) বীতশোক ভট্টাচার্য—'বনফুল ঃ শৈলী বিজ্ঞানের একটি সমীক্ষা' (প্রবন্ধ) । ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত। বাণীশিল্প প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ : মে ১৯৮২।

৪৪) বীতশোক ভট্টাচার্য—'বৃন্তলগ্ন বনফুল'(প্রবন্ধ)। ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' - গ্রন্থে মুদ্রিত। বাণীশিল্প প্রকাশনা। প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৮২।

৪৫) 'তিলোত্তমা' গল্প— বনফুল। জগদীশ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত— 'বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প'। বাণীশিল্প সংস্করণ ঃ জুলাই ২০০১।

ভ)

৪৬) ভূদেব চৌধুরী—'ছোটগল্পের কথা'। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ: জানুয়ারী ২০০০।

(ম)

৪৭) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—'লেখকের কথা'। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭।

৪৮) মোহিতলাল মজুমদার— 'সাহিত্য-বিতান'। করুণা প্রকাশনী। প্রথম করুণা সংস্করণ: নভেম্বর ২০০৬।

(র)

৪৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'কালান্তর'। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পুনর্মুদ্রণ:চৈত্র ১৪০৩।

(শ)

৫০) শ্রীভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৬-২০০৭।

৫১) শ্রী ভূদেব চৌধুরী—'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'। চতুর্থ পর্যায়, (রবীন্দ্র যুগ: দ্বিতীয় পর্ব)। দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ: জুন ২০০৩, আষাঢ় ১৪১০।

৫২) শিশির কুমার দাস—'বাংলা ছোটগল্প'। দে'জ পাবলিশিং। পঞ্চম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০০৭।

৫৩) শিশির কুমার দাস— 'গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব'। দে'জ পাবলিশার্স। ১৩৯২ বৈশাখ।

৫৪) শ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস'। 'শিল্পকলা' প্রবন্ধ। জিজ্ঞাসা প্রকাশনা। চতুর্থ প্রকাশ: জানুয়ারী ২০০৩।

৫৫) শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড। পুনর্মুদ্রণ: ২০০১।

৫৬) শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত— 'বাংলা সমালোচনা পরিচয়'। এ.মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড। প্রথম প্রকাশ: ১৩৭৬।

(স)

৫৭) সুকুমার সেন—'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'। আনন্দ । পঞ্চম খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে, ২০০২।

৫৮) সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায়— 'বংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ'। প্রজ্ঞাবিকাশ। দ্বিতীয় সংস্করণ: ২৬শে জানুয়ারী ২০০৭।

৫৯) সরিৎশেখর মজুমদার সম্পাদিত— 'সুনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ বড় গল্পঃ বনফুল'। মডেল পাবলিশিং হাউস। প্রথম প্রকাশ: কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৭।

(ক্ষ)

৬০) ক্ষেত্র গুপ্ত— 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস'। গ্রন্থনিলয়। একাদশ সংস্করণ: জুলাই ২০০৬।

(খ) প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা ঃ-

১) 'বনফুলের জন্মশতবর্ষ স্মরণ ক্রোড়পত্র'— পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। ৬ ও ১৩ই আগষ্ট, ১৯৯৯।

২) 'শনিবারের চিঠি'—— সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। নাথ প্রাইভেট লিমিটেড। ডিসেম্বর ১৯৯৪।

৩) 'স্বর্ণমুষ্টিঃ বনফুলের গল্প'——ক্ষেত্রগুপ্ত, যষ্ঠিমধু, বনফুল শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা ১৩৮৬, বৈশাখ-আষাঢ়।

৪) 'বনফুল-এর গল্পসংগ্রহ'-এর দ্বিতীয় শতকে অন্তর্ভুক্ত ভূমিকা—পরিমল গোস্বামী।

৫) 'বনফুল-এর গল্পসংগ্রহ'-এর প্রথম শতকে অন্তর্ভুক্ত ভূমিকা—রাজশেখর বসু।

৬) 'বনফুল-এর গল্পসংগ্রহ'-এর তৃতীয় শতকে অন্তর্ভুক্ত ভূমিকা—সুকুমার সেন।

ইংরেজি গ্রন্থঃ-

১) Allardyce Nicoll--- 'The Theory of Drama'. Doaba House Pub lishers, Reprinted: 2002.

২) Edited by Anthony Beal---'Selected Literary Criticism'. Heinemann pocket Book Edition, Reprint 1967.

৩) Second Series, Selected by DAN DAVIN---'English Short Stories of Today'. Oxford University Press, Reprinted 1959 and 1961, Preface.

৪) G.W Turner--- 'A Pelican Book-Stylistics'. Penguin Books. Reprinted 1979.

৫) Edited by Meriam Allott---'Novelist on the Novel'. Reprint-1965.
৬) Peter Trudgil--- 'Sociolinguistics: An Introduction'. Pelican Books.Reprinted 1982.
৭) Willam Henry Hudson---'An introduction to the study of literature'. Kalyani Publishers, Ludhiana, Reprint - 1989.

Nikhil Ch Ray
4.2.2011

Associate Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

৪/২/২০২২

ষষ্ঠ অধ্যায়

বনফুলের ছোটগল্পের সামগ্রিক মূল্যায়ন

ষষ্ঠ অধ্যায়

''বনফুলের ছোটগল্পের সামগ্রিক মূল্যায়ন''

এক এক জন লেখকের জীবনদর্শন ও প্রকাশভঙ্গি এক এক রকম । একজন লেখকের সৃষ্টির সমস্ত মহৎগুণ থাকলেও তাঁর লেখায় যদি মানবিকবোধ এবং জীবনের প্রতি একটা সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে, তাহলে তিনি কখনোই পাঠকের হৃদয়রাজ্যে স্থায়ী আসন পেতে পারেন না । কেননা, ওই দুটো বিষয়ই জীবনকে স্বীকার করে, জীবনের চলমানতাকে স্বীকার করে, আংশিক থেকে পূর্ণতর সত্যের প্রতিষ্ঠা করে । বনফুল সেই সত্যসন্ধানী শিল্পী, চিরজীবী শিল্পী । তাঁর সাহিত্য পাঠ আমাদের সেই চিরন্তন সত্যের মুখোমুখি করায় । এখানেই সার্থক জীবনশিল্পী হিসেবে বনফুলের চিরকালীন প্রতিষ্ঠা । আর বিশেষ কথা, এই জীবনকথা রূপায়ণে তিনি ভাবাবেগে আক্রান্ত হননি কখনো । নির্মোহ অপক্ষপাত বিজ্ঞাননিষ্ঠ দৃষ্টি ভঙ্গিতে তার স্বরূপ তিনি বিশ্লেষণ করেছেন ।

'বনফুল' --- এই নামশব্দটির উচ্চারণে ও শ্রবণে বিশাল-বিস্তৃত বনভূমির বিচিত্র পুষ্পরাজির আমোদিত সৌরভের আভাস আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হয় । বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়ের বিভিন্নতা, প্রকাশভঙ্গির নতুনতা, প্রকরণের অভিনবতা, জীবনব্যাখ্যার সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা প্রভৃতি আমাদের এক অনাস্বাদিতপূর্ব ছোটগল্পের জগতে নিয়ে যায় ; যে জগতে ছোটলোক-বড়লোক, ধনী-দরিদ্র, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, কটাক্ষ-শ্লেষ --- সবই আছে । সেখানে সহজ-সরল স্বাভাবিক জীবনকথা যেমন আছে তেমনি আছে তার অন্তর্শায়ী ভণ্ড, পাপী, অন্তঃসারশূন্য মানুষের কুটিল-জটিল জীবনকথাও । আর আছে মানবচরিত্রের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি-অসঙ্গতির কথা, দরিদ্র নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের জীবনসংগ্রামের কথা, বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের আর্থিক দিক থেকে বিপর্যস্ত মানুষের কথা, আদিম জৈবপ্রবৃত্তির কাছে মানবজীবনের পরাভবের কথা, অদৃষ্টের হাতে মানবজীবনের বিড়ম্বনার কথা, সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ জীবনবোধের কথা --- এককথায় মানবচরিত্রের ও মানবজীবনের বিভিন্ন দিকের স্বরূপ চিত্রায়িত ও উন্মোচিত হয়েছে তাঁর ৫৭৮ টি গল্পে ।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য রেনেসাঁসের ঢেউ বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আছড়ে পড়লেও ভাববাদী ভারতীয় তথা বাঙালির মনে তখনো যুক্তি-বুদ্ধি ও বিজ্ঞানচেতনা তেমন প্রভাব ফেলে নি । বিজ্ঞানচেতনা নির্ভর সাহিত্য তখনো ততটা সাহিত্যিকেরা রচনা করেন নি । কিন্তু সে ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ফ্রয়েড, এমিল জোলা, হ্যাভলক, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, প্রুস্ত, ন্যুটহ্যামসুন, হকিন্স, গোর্কি প্রমুখের রচনাপাঠে ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে । ভাববাদের জায়গায় বস্তুবাদী ভাবনা স্থান দখল করতে থাকে । ফলে জীবনকে আর আবেগের সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণ না করে যুক্তি-বুদ্ধির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হতে থাকল । এর একটি প্রত্যক্ষ কারণ ছিল প্রথম

বিশ্বযুদ্ধ । এই বিশ্বসমরই মানুষের পূর্বেকার ধ্যান-ধারণাকে পুরোপুরি পাল্টে দেয়, মানুষ মাটিঘেঁষা বাস্তবমুখী হতে থাকে, বাস্তব জীবনকাহিনী শুনতে চায় । সাহিত্যেও তাঁর প্রতিফলন ঘটতে থাকে । আর বিংশ শতাব্দীতো বিজ্ঞানের যুগ, স্বভাবতই বস্তুবাদী ভাবনা ও বিজ্ঞানচেতনানির্ভর সাহিত্য রচিত হওয়ার অবকাশ তৈরী হয় । তবে তথাকথিত **'কল্লোলীয়'** বাস্তববাদী ভাবনায় কতটা **'বাস্তবতা'** ছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে । এই বাস্তববাদী ভাবনা থেকেই রবীন্দ্রবিরোধিতা শুরু হলেও রবীন্দ্রভাবপরিমন্ডলকে অতিক্রম করে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন খুব কম লেখকই । রবীন্দ্রবিরোধিতা না করেও যে চিন্তার বিশেষ রূপায়ণে শিল্পের স্বতন্ত্র রূপ নির্মাণ সম্ভব তা বনফুল বিশেষভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন । বনফুল কল্লোলীয় যুগের সাহিত্যের উচ্ছৃঙ্খলতাকে পছন্দ করতেন না, সে পথ যে সাহিত্য রচনার প্রকৃত পথ নয়, তা বনফুল জানতেন । তাই তিনি বলেছেন, সাহিত্যিকদের নীলকণ্ঠ হতে হয়, গরল গলাধঃকরণ করে অমৃতই পরিবেশন করতে হয় । তিনি তাই করেছেন । তাই বনফুলের লেখায় সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক উত্তেজনার প্রত্যক্ষ ছবি যতটা না উঠে এসেছে, তার চেয়ে বেশি রূপলাভ করেছে সেই সময়ের অভিঘাতে বিপর্যস্ত মানুষের জীবনযন্ত্রণা ও জীবনজিজ্ঞাসার কথা । প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে **'রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো'** জীবন কথার চাইতে বিজ্ঞানচেতনা নির্ভর বুদ্ধিবাদী সাহিত্য এক বিশেষ মাত্রা যোজনা করেছিল, যার সুচারু রূপ নির্মাণে বনফুল রূপদক্ষশিল্পীতে পরিণত হয়েছেন এবং সমকালীন অন্যান্যদের চাইতে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন ।

কল্লোল যুগের সাহিত্যিকেরা রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতার বিরোধিতা করে যে সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন তাতে নাগরিক সভ্যতার কুশ্রীতা, দৈন্য, হতাশাকেই তাঁরা তুলে ধরেছিলেন । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দশ-পনের বছর যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছে তাতে মূলত রবীন্দ্রবিরোধিতাই বেশি সক্রিয় ছিল । শিল্পের প্রকাশভঙ্গির নতুনত্ব সেখানে তেমন খুব একটা ছিলনা, কল্লোল ও কল্ললোত্তর যুগের সাহিত্যিক বনফুল ছোটগল্পের আঙ্গিকের সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন । বনফুলকে কল্লোলত্তর যুগের সাহিত্যিক বলার কারণ, বনফুল ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্য রচনার জন্য অবতীর্ণ হননি । যদিও তিনি এর বহু পূর্ব থেকেই স্কুলে-কলেজে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট বহু প্যারডি কবিতা ও ছোটগল্প রচনা শুরু করেছিলেন । যাইহোক, কল্লোল-কালিকলম মনোভঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র ধরণের গল্প লেখা শুরু করেন । তাঁর ছোটগল্প স্বতন্ত্রতার বাণীবাহক । বিষয়বস্তু, বর্ণনাভঙ্গি, আঙ্গিক, চরিত্রাঙ্কন, জীবনদৃষ্টি--- সবদিক থেকেই তাঁর গল্প আলাদা পরিমন্ডল সৃষ্টি করেছিল । **''শিল্পী যেমন করে দু'-একটি রেখার টানে একটি বৃহতের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলেন বনফুলও তেমনি তাঁর ছোটগল্পের অতিসংক্ষিপ্ত পরিসরে একটা বড় গল্পের আভাস দিয়ে পাঠককে চমকিত করে দেন । বনফুলের আধিকাংশ গল্পই এক বা দুই পাতার গল্প । এখানে গল্পের চিরাচরিত চরিত্রাঙ্কন নেই, ঘটনার সংঘাত নেই, পাতার পর পাতা বর্ণনা নেই । আছে কেবল কয়েকটি আভাস এবং ইঙ্গিত, মনন ও কল্পনার সমাহার**

।'''[১] বস্তুতঃ এখানে সমালোচক মূলত বনফুলের **'ছোট'** আকৃতির গল্পের কথা বললেও **'মাঝারি'** ও **'বড়'** আকৃতির গল্পের ক্ষেত্রেও বনফুল সমান সিদ্ধি অর্জন করেছেন ।

বিশের দশকের ভাবনা তিরিশের দশকেও খানিকটা সঞ্চারিত হল, কিন্তু নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ-পরিস্থিতি গল্পের ভাবনাকে প্রভাবিত করতে থাকল, যার রূপও আমরা বনফুলের রচনায় পাই । তারপর তিরিশের দশকের শেষ পাদ ও চল্লিশের দশক জুরে ভারত তথা বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পটভূমির আবার পরিবর্তন ঘটে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায় । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিঘাত বাংলার সমাজজীবনকে ততটা স্পর্শ না করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার চোরস্রোত ভারত তথা বাংলার সমাজজীবনকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল, সেই দুঃস্থ মর্মান্তিক সময়ক্রমের প্রতিচ্ছায়াও বনফুলের গল্পে রূপলাভ করেছে । তারপর পঞ্চাশের দশকে চূড়ান্ত অবক্ষয় ও নৈরাশ্যের মধ্যে স্বাধীনতাকে ঘিরে এক নতুন আশা, উদ্দীপনা মানুষের প্রাণকে উদ্বেল করলেও স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে বিশ্বের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বাংলার সমাজজীবনের চিত্রকেও নাড়া দিল । মেকি স্বাধীনতা প্রাপ্তির হতাশায় মুহ্যমান বাঙালি বস্তুবাদী ভাবনায় আর আস্থা রাখতে পাড়লো না, চারিদিকে হতাশা, নৈরাশ্য, বিষন্নতায়ভরা আবহাওয়ায়, যুগের প্রতিক্রিয়ায় আত্মসন্ধান ও আত্মসমীক্ষায় ডুব দেয় । ষাট ও সত্তরের দশকের ছোটগল্পের এই আত্মসন্ধান ও আত্মসমীক্ষার সাথে সাম্যবাদী ভাবনা রূপ লাভ করতে থাকে । আশির দশকের ছোটগল্প পূর্বের বিশ্বাস, আস্থাশীলতা থেকে ব্যক্তিত্বের সংকট, নিঃসঙ্গতার দিকে অগ্রসর হয় । বনফুলের বিভিন্ন গল্পে সময়ের অভিঘাতে বিপর্যস্ত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনচিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে । সমকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতি গল্পকারদের ভাবালুতা থেকে নিস্পৃহ দৃষ্টিভঙ্গির দিকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করেছিল, কিংবা সময়ের অভিঘাতে আপনা আপনি তা হয়ে গিয়েছিল । বনফুল এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির একজন উৎকৃষ্ট ধারক ও বাহক।

যে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার পারিবারিক গণ্ডির মানুষজন, পরিবেশ-পরিস্থিতি, তার পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থা, সর্বোপরি তার অর্জিত শিক্ষার দ্বারা ঋদ্ধ জীবনদর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে । বনফুলের চরিত্র গঠনের এই বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করেছিল । বনফুলের পিতা সত্যচরণ ছিলেন পেশায় ডাক্তার, কিন্তু পয়সার চেয়েও নিঃস্বার্থ সেবাই ছিল তাঁর ব্রত । গান-বাজনা, সাহিত্য চর্চাতেও তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল । সেকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা (প্রবাসী, হিতবাদী, বসুমতী, সাহিত্য প্রভৃতি) ও সাহিত্যের বহু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক সূত্রে বনফুল

ছোটবেলা থেকেই সমকালীন সাহিত্য চর্চার একটা ধারণা করে নিয়েছিলেন । বনফুলের বাড়ি পূর্ণিয়া জেলার সাহেবগঞ্জের নিকটবর্তী মণিহারী গ্রামে । বাড়ির কাছে ছিল গঙ্গার ঘাট ও রেলষ্টেশন । বহুলোক প্রত্যহ তাঁদের বাড়িতে দু'-একবেলা খাওয়া-দাওয়া করে ট্রেন ধরতেন এবং গঙ্গাস্নান উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীরা তাঁদের বাড়িতে ভিড় জমাতো । অথিতি, ছাত্র, শিক্ষক, ভবঘুরে মানুষ, চাকুরী প্রার্থী, সরকারী চাকুরে, বাড়ির দশ-বারোজন কৃষক-মজুর, রাঁধুনি প্রমুখ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের আশ্রয়স্থল ছিল বনফুলদের বাড়ি । স্থায়ী অতিথিও কেউ কেউ হয়ে যেতেন । এরকমই দু'জন মানুষ কেশ মশাই ও মুখুজ্জে মশাই । যাদের আমরা বনফুলের **'জঙ্গম'** প্রভৃতি রচনায় পাই । পিতার পরপকারী মানসিকতা, উদারতা, সংস্কৃত ও সংযমী স্বভাব, মাতা মৃণালিনী দেবীর নিষ্ঠা, সততা, সারল্য ও রক্ষণশীল মানসিকতা বনফুলের চরিত্র গঠনের প্রভাব বিস্তার করেছে । এছাড়া স্কুলের মাষ্টার মশাই রামচন্দ্র ঝাঁ প্রমুখ, কঠোর রক্ষণশীল কাকা চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখের চরিত্রবৈশিষ্ট্য বনফুলের চরিত্রের ভিত নির্মাণে প্রভাব ফেলেছে । উদার ও রক্ষণশীল --- এই দুই বিপরীতমুখিভাব তাঁর জীবনকে সংযমের বাঁধনে বেঁধেছে । তাছাড়া বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই ভাবালুতামুক্ত মানসিকতা ও যুক্তিনিষ্ঠ হয়েছেন । তারপর পেশারসূত্রে বীজানু পরীক্ষক হিসেবে সবকিছুতে নির্মোহ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা, তাদের স্বরূপ নির্ণয় করা, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে মেলামেশা, পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরের প্রকৃতি, বিভিন্ন পশু-পাখির সঙ্গে পরিচিতি প্রভৃতি বনফুলের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলেছিল । তারপর কলকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়তে আসলে শহরের বিচিত্র মানুষ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে শাহরিক জীবনযাত্রা সেসময় থেকে গ্রাস করতে লাগলেন । এর সঙ্গে যুক্ত হল তাঁর সংস্কারমুক্ত মানবিক ভাবনা-চিন্তা ও সত্য-অন্বেষা । এসবের সমন্বয়ে উদার-উন্মুক্ত শুদ্ধ জীবনসত্য ও অত্যন্ত সংযমী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন বনফুল। এভাবে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে বনফুলের গল্পও বিচিত্রস্বাদী হয়েছে ।

কোন একজন ছোটগল্পকারের সযত্ন বিষয় নির্বাচন, ঘটনা বিন্যাসে পরিমিতিবোধ এবং সহজাত মৌলিক বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে বিশেষ করে তোলে । এই সহজাত দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে বর্ণনার তাৎপর্য থাকে না, শিল্পের দিক থেকে তা একঘেঁয়েমি হয়ে পড়ে । ছোটগল্পকার যে বিষয়টি নির্বাচন করেন সেটি জীবনসংগ্রামের পরিণতি হতে পারে কিংবা জীবনের মোড় ফেরানোর উদ্‌ভ্রান্তিও হতে পারে । তা সে যাইহোক, এই বিষয় নির্বাচন, তারপর নিজস্ব জীবনদর্শনে জারিত করে হৃদয়ানুভূতির রসে সিক্ত করে পরিবেশনের সময় সেই সহজাত দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে । বনফুলের সহজাত মৌলিক বিশ্লেষণী দক্ষতা তাঁকে বাংলার ছোটগল্পের ইতিহাসে বিশেষ করে তুলেছে ।

বনফুলের ছোটগল্পের বিষয়-বৈচিত্র্য অফুরন্ত । স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল জুড়ে তাঁর শিল্পীসত্ত্বা বিষয় অন্বেষণ করেছে । আমরা এতদিন যে বিষয়গুলি নিয়ে ভাবতেও পারিনি যে এগুলোও ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে, কিন্তু বনফুল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নানা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় ও ঘটনা গল্পের সীমায় আবদ্ধ করেছেন । জীবন সমুদ্রের বিবিধ

তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনা প্রবাহে ডুব দিয়ে গল্পের বিষয় আহরণ করে তাতে নির্মোহ দৃষ্টির প্রয়োগে প্রগাঢ় জীবনবোধ ও জীবনসত্য রূপায়িত করেছেন বনফুল । এই বিষয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের চরিত্র । জীবনসন্ধানী বনফুল মানুষকে দেখেছেন মানুষ হিসেবেই । যেখানে মানুষের ভালো-মন্দ, হাসি-কান্না, ভণ্ডামি-শঠতা, স্খলন-পতন প্রভৃতি আচার-আচরণ নিবিড় পর্যবেক্ষণী মানসিকতায় প্রকাশিত । **''বনফুলের ছোটগল্পে মানবজীবনের এই বহুরূপী রূপটিই বিচিত্রভাবে ধরা দিয়েছে । কখনো তা সুন্দর, কখনো কুৎসিত, কখনো উদার, কখনো তা নীচ, কখনো আত্মসুখপরায়ণতায় অতিসংকীর্ণ, কখনো পরার্থে আত্মোৎসর্গের মহিমায় গৌরবান্বিত । মানুষ স্বর্গের দেবতাও নয়, আবার নরকের শয়তানও নয় । মানুষ মানুষই । সে ভুল করে, অন্যায় করে, পাপাচরণ করে, আবার ভুলের মাশুলও তাকে দিতে হয় , পাপের প্রায়শ্চিত্তও করতে হয় মহার্ঘ্য মূল্যে । সবকিছু মিলিয়েই মানবজীবন, আবার তাই মানুষের নিয়তি । অদ্ভুত কিন্তু অত্যাশ্চর্য । বনফুল মানুষের এই জীবনকে তার যথাযথ মূল্যে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন । জীবন সম্পর্কে যেমন তাঁর কোন অতীন্দ্রিয় মোহ ছিল না, তেমনি কোন বিশেষ আদর্শের প্রতিও তাঁর অকারণ অনুরুক্তি ছিল না । দার্শনিকের ভাষায় যাকে 'তটস্থ দৃষ্টি' বলে, তাঁর দৃষ্টি সেই দৃষ্টি । জীবনসত্যের নিরীক্ষায় কোন পূর্বধার্য তত্ত্বের অনুশাসন স্বীকার না করে সর্বসংস্কারমুক্ত দৃষ্টির সম্মুখে বহু পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে জীবনকে জানার যে আবেগ, তাঁর ব্যক্তিমানসে সেই আবেগই প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল । এদিক দিয়ে তাঁর মনের গড়ন ছিল দার্শনিকের নয়, বৈজ্ঞানিকের । বস্তুতঃ আমাদের সাহিত্যে তাঁকে প্রথম পরিপূর্ণ বিজ্ঞাননিষ্ঠ বুদ্ধিবাদী লেখক বলা যেতে পারে ।''**[২] জীবনকে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বনফুল যতটা জেনেছেন যথার্থ মহিমায় ততটাই তিনি রূপ দিয়েছেন । স্বাভাবিকভাবে তাই দিন দিন তাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র যত প্রসারিত হয়েছে, জীবনসত্যও ততই রূপ থেকে রূপান্তরে প্রসারিত হয়েছে । এদিক থেকে তাঁকে অভিজ্ঞতাবাদী লেখক হিসেবে চিহ্নিত করা যায় ।

বনফুল ছিলেন একাধারে কবি ও বিজ্ঞানমনস্ক লেখক । তাই তার ছোটগল্পে বিচিত্র মানবচরিত্র বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিকসুলভ নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করে মানুষের অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গের তীক্ষ্মতায় রূপ দিয়েছেন, তেমনি গীতিকবিসুলভ মমত্বে, সহানুভূতিতেও মানুষকে দেখেছেন । তাই তাঁর চরিত্রগুলি আমাদের মনে এত দাগ কাটে । বনফুল তাঁর স্মৃতিচারণের এক জায়গায় বলেছেন ---**''মানুষই আমার বিষয় এবং প্রেরণা । অথচ মানুষকে নিয়ে আমি কোনো ফিলসফি বা ফর্মুলা দাঁড় করাই নি । আমার বিশ্বাস সেরকম কিছু করাও যায় না । আমার লেখায় একটা মেসেজ বা বলবার কথা আছে । সেটা হল, মানুষ বহু বিচিত্র । ..... মানুষকে অনুসরণ করে আমি আমার লেখার নিত্যনতুন বিষয় ও ভঙ্গি আবিষ্কার করেছি ।''** বনফুলের গল্পের পরিমিতিবোধ, হাস্যরসিকতা, সহজ সরল ভাষা, আখ্যানধর্মীতা, তির্যকতা --- সবই আছে । কিন্তু বিবিধ শ্রেণির মানবচরিত্র অঙ্কনের

অসীম ক্ষমতা আমাদের অভিভূত করে, বিস্ময় উৎপাদন করে । এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন --- **''বনফুলের রচনায় পরিকল্পনার মৌলিকতা, আখ্যানবস্তু - সমাবেশে বিচিত্র উদ্ভাবনী শক্তি, তীক্ষ্ম মননশীলতা ও নানরূপ পরীক্ষা- নিরীক্ষা মধ্য দিয়া মানবচরিত্রের যাচাই পাঠকের বিস্ময় উৎপাদন করে ।''**[৩] মানুষের বিচিত্র স্বভাবের বিশ্লেষণের তাগিদেই বনফুলকে কবিতার ভাবরাজ্য থেকে নামিয়ে এনে ছোটগল্পের বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়েছিল । মানুষের নানা প্রবৃত্তি নিয়ে তিনি যেমন স্নিগ্ধ হাস্যরসিকতা করেছেন, তেমনি সেই প্রবৃত্তির স্খলনে তীব্র খোঁচাও দিয়েছেন । এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কাহিনীর নির্মাণ কৌশল, পরিস্থিতি সৃষ্টির ক্ষমতা, আকস্মিক তাৎপর্যের উদ্ভাবন, তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি, চিকিৎসকের নিরাসক্তি দৃষ্টিভঙ্গি ও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি তাঁর গল্পে বিশেষত্ব আমদানি করেছে । বীজানু পরীক্ষার চিকিৎসক হওয়ার সুবাদেই বনফুলের চরিত্রে এই নিরাসক্তি দৃষ্টিভঙ্গি ও তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি মানব চরিত্রকে ডিসেকশানের টেবিলে রেখে অনুপুঙ্ক্ষ পরীক্ষা করেছেন, তার চরিত্রস্বরূপ উন্মোচণ করেছেন ।

বনফুলের বিভিন্ন গল্পের আলোচনায় দেখা যায়, বনফুল মানুষের চরিত্রের অন্তহীন বৈচিত্র্য যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমনি মানুষের চরিত্রের অন্তর্নিহিত শুদ্ধতাও তুলে ধরেছেন । মানুষের প্রতি অন্তহীন ভালোবাসাই তাঁকে বড় শিল্পী করে তুলেছে । বনফুল সমাজের অবক্ষয় দেখেছেন, মানুষের চরিত্র স্খলনে বিদ্রূপ করেছেন, কিন্তু মানবজীবনকে নৈরাশ্যময় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেন নি, একটি বিশুদ্ধ আত্মবিশ্বাস, আত্মশুদ্ধি, শেষ পর্যন্ত তাঁর গল্পে জয়লাভ করেছে । বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েও সেই যুগ-জ্বালা-যন্ত্রণাকে নীলকণ্ঠের মত গলাধঃকরণ করে বাংলা সাহিত্যকে তিনি অমৃত পরিবেশন করেছেন ।

বনফুলের **''ছোটগল্পের জগতে এলে পাঠকের মনে হয় Here in God's Plenty--- বিধাতার সৃষ্টির মতোই তাঁর সৃষ্টি বিচিত্র ও বর্ণবহুল ।''**[৪] বনফুল বিবিধ সাহিত্য শাখায় কৃতিত্বের সঙ্গে সৃষ্টিসামর্থ্য প্রমাণ করলেও, বিশেষতঃ ছোটগল্পের জন্যই তাঁর সমধিক জনপ্রিয়তা । ছোটগল্পের খণ্ড জীবনের মধ্যে অনন্ত জীবনসত্য রূপায়ণে তিনি অনন্য । যে খণ্ড জীবন হাটে-বাজারে, লোকালয়ে, নির্জনে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে । এই প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন --- **'' রেল গাড়িতে, স্টেশনে, ওয়েটিং রুমে, আড্ডায়, বাসরঘরে, উৎসবে, ব্যসনে, শ্মশানে নিরন্তর যে জীবন তরঙ্গ উঠিতেছে, পড়িতেছে তিনি সুনিপুণ কলমে তাহাদের ছবি আঁকিয়াছেন--- কোথাও মন্তব্য করেন নাই ।''** (বনফুলের ছোটগল্প, কথাসাহিত্য, বনফুল সংবর্ধনা সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৬৪) বস্তুতপক্ষে বনফুলের চোখ মন যতদূর প্রসারিত হয়েছে তা থেকে তিনি গল্পের উপাদান সংগ্রহ করেছেন । দৃষ্টির প্রসারতা যার যত বেশি, সৃষ্টির বিভিন্নতাও তার তত ।

বনফুল প্রায় ছ'শর মত গল্প লিখেছেন । এই বিপুল সংখ্যক গল্প আবার আকৃতির দিক থেকেও বিভিন্ন । কোনটি **'ছোট,** কোনটি **'মাঝারি'**, কোনটি **'বড়'** আকৃতির

। তা সে যে আকৃতিরই হোকনা কেন, প্রত্যেকটি গল্পে বনফুল এমন অন্বিষ্ট জীবনদৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন, যা তাঁর স্বভাবধর্মকেও চিহ্নিত করে । বনফুল ছোটবেলা থেকেই যে পারিবারিক আবেষ্টনীতে বড় হয়ে উঠেছিলেন, তাতেই তাঁর ব্যক্তিত্ব আপনা-আপনিই গড়ে উঠেছিল । বনফুলের সংযমী ব্যক্তিত্বের ছাপ আমরা তাঁর প্রত্যেকটি গল্পেই পাই । যেখানে বাক্যের বৃথা ব্যয় নেই, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি কাহিনী নাটকীয় ভঙ্গিতে দ্রুত ধাবিত হয়েছে । বনফুলের গল্পের কাহিনী বিন্যাসে নাটকীয় কৌশল পাঠকচিত্তকে এক অনির্বচনীয় আকর্ষণে আকৃষ্ট করে । **" Dramatic Suspense- কে ক্রমশই পুঞ্জীভূত করে অত্যন্ত সন্তর্পণে অথচ স্বভাবসিদ্ধ আনমনে, শিল্পী যেন সূক্ষ্মতন্ত্রী জীবনের ভাঁজ খুলে চলেছেন একের পর এক --- প্রতি ভাঁজে নতুন উৎকণ্ঠা নতুন কৌতূহল নতুন উদ্দীপনার পথে ঠেলে নিয়ে চলে । এই অর্থেই বনফুলের প্রকরণ ও বিজ্ঞানী প্রবনতার সৃষ্টি --- ভাঁজে ভাঁজে সংকুচিত গোপন জীবনসত্যকে ধাপে ধাপে আবিষ্কার করে এগিয়ে চলেছেন তিনি । প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ভুল আঙ্কিক হিসাবে পরিচালিত --- ফলে প্রত্যেকটি বাক্য, এমনকি প্রতিটি শব্দও, গলপ-রহস্যের উন্মোচণে যেন অনিবার্যতার কঠিন বন্ধনে সংলগ্ন । এই কারণে বনফুলের ছোটগল্পের শরীরে একটি শব্দকে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত অথবা পরিমার্জিত করার উপায় নেই ।"**[৫] হ্যাঁ, বনফুল এমনই লেখক । তাঁর বিবিধ আকৃতির ও বিবিধ শ্রেণির গল্পের আলোচনায় এই বৈশিষ্ট্যগুলিই আমরা খুঁজে পেয়েছি । তবে কাহিনীর সংস্থাপনে সমালোচকেরা বনফুলকে কিছুটা অসচেতন মনে করলেও আমাদের কোথাও বনফুলকে **'আনমনে'** মনে হয়নি । বনফুল তাঁর বক্তব্যকে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব-বৈশিষ্ট্যে গল্পে উপস্থাপিত করেছেন । হ্যাঁ, ব্যক্তিগত জীবনে বাইরে থেকে দেখতে অনেককে **'আত্মসচেতন'** মনে নাও হতে পারে । কিন্তু সে মানুষটি যখন শিল্প সৃষ্টি করতে যাবেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকেন, নচেৎ তাঁর সৃষ্টি মাঠে মারা যাবে যে ! বনফুলের মধ্যে এক **'দুর্দান্ত প্রাণশক্তি'** ছিল যার জন্য তিনি অনায়াসে বাইরের ঔদাসীন্যকে দুঃসাহসিক ব্যঙ্গের সাহায্যে উল্টে দিতে পারতেন । এটি তাঁর চরিত্রের কোন স্ববিরোধিতা নয়, এটিই তাঁর ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব, যা শিল্পসৃষ্টিতে অন্বিত । বৃত্তিতে চিকিৎসক বনফুল মানবজীবনকে অস্ত্রোপচারের ডিশেক্‌শান টেবিলে রেখে বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাপ্রবণ দৃষ্টিতে মানব চরিত্রের বিবিধ বৃত্তিগুলিকে **'বুদ্ধিরস'**- এর যোগানে চমকপ্রদভাবে রূপায়িত করেছেন । এই জীবন রূপায়ণে তাই কোন ভাবলুতা নেই, আছে এক নিস্পৃহ দৃষ্টি । তবে সেই নিস্পৃহ মনোভাব শেষ পর্যন্ত মানবিকবোধে উত্তীর্ণ হয়েছে । বনফুল নিজের চিন্তা-ভাবনা আদর্শ দ্বারা বিষয় নির্বাচন করে নিজের মত করে তা পরিবেশন করেছেন । মানবজীবন সম্পর্কে তাঁর সর্বদা কৌতূহল জাগরূক ছিল । তাই মানব চরিত্রের বিবিধ রং-বৈচিত্র্য তাঁকে **'ইন্সপায়ার'** করত । সেকারণে তাঁর গল্পের এত বৈচিত্র, প্রকরণের এত বিভিন্নতা । বনফুলের গল্প সম্পর্কে পূর্বের অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃত আলোচনায় আমরা তা দেখানোর চেষ্টা করেছি ।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য মনোরঞ্জন করানোর দায় থেকে মুক্ত, **'তার কাজ হল মনোযোগ করানো ।' 'আগেকার সাহিত্য চোখ ভোলানো সামগ্রী নিয়ে, এখনকার সাহিত্য চোখ এড়ানো সামগ্রি নিয়ে ।'** আমাদের চারিপাশে প্রতিনিয়ত যত ঘটনা ঘটে চলেছে তার সবগুলি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর নয়, কত ঘটনা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় । কিন্তু তাদের

মধ্যেও যে কোন গভীর সত্য আরোপ করা যায়, তা বনফুলের ছোটগল্প পড়লেই বোঝা যায় । জীবনের খণ্ডাংশের মধ্যে সীমাহীন এক জীবনদ্যোতনা ফুটিয়ে তোলাই ছোটগল্পের কাজ । বনফুলের মতো বিজ্ঞানীমেজাজের সাহিত্যিকের হাতে কত অকিঞ্চিতকর বিষয় কত রসঘন হয়ে উঠতে পারে তা আমরা বনফুলের গল্প পাঠে অনুধাবন করতে পারি । অথচ আশ্চার্যের বিষয় যে, সে বর্ণনায় কোন অতিরঞ্জন নেই, লেখকের কোন মন্তব্য নেই, কোন ভাবালুতা নেই, অত্যন্ত স্বচ্ছ, তির্যক বাচনভঙ্গিতে তা নিটোল মুক্তোর রূপ গ্রহণ করেছে । যা আমাদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে । বনফুলের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই গল্পগুলি হীরকদ্যুতির মতো এতো ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করেছে । বনফুলের লেখনির বিশিষ্টতা বোঝাতে ড. সুকুমার সেন লিখেছেন---**"বনফুলের গল্পে কারিগরির দিকে ঝোঁক নেই, ঝোঁক আছে আন্তজীবনের দিকে, যে জীবন বহু-বিচিত্র বহু বিসর্পিত । নিজের দৃষ্টি, নিজের অনুভব কল্পনার তাঁতে আত্মভাবনার জাল বুনে বুনে তাঁর গল্প গড়া নয় । এঁর গল্প প্রচণ্ড, হয়তো স্থানে স্থানে মোলায়েম নয়, কিন্তু সর্বদা হৃদ্য এবং পরিতৃপ্তিকর । বনফুলের গল্পে যে সব নর-নারী উপস্থাপিত হয়েছে, আমাদের অভিজ্ঞতার ভূমিতে হয়তো কেউই কখনো দেখা হয় নি, অথচ মনে হয় তারা যে অপরিচিত নয়, তাদের মত কাউকে যেন কোথাও দেখে থাকব, তাদের কথা শুনে থাকব । বনফুলের লেখনীর বলিষ্ঠতার পরিচয় এখানে । বনফুলের গল্পে জীবনের ছবি ফুটেছে --- ফোটোগ্রাফ ওঠেনি । এও তাঁর গল্পের এক বিশিষ্টতা । বহুদিন পূর্বে প্রভাতকুমারের গল্পে এই রকম আস্বাদ পাওয়া গিয়েছিল । তবে প্রভাতবাবুর গল্পের ছবিতে খুশির উজ্জ্বল আলো পড়েছে, বনফুলের গল্পে খুশি-অখুশির আলোছায়ার আল্পনা আঁকা হয়েছে ।"**[৬]

বনফুলের গল্পের বিষয়গুলি একটু গভীর ও নিবিড় ভাবে লক্ষ্য করলে দেখব, সেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে যথেষ্ট অকিঞ্চিতকর । অথচ তারই মধ্যদিয়ে জীবনের এক চরম সত্য রূপায়িত করেছেন তিনি । ফুল, প্রজাপতি, পশু-পাখি, জনমানুষ থেকে শুরু করে 'আগাছা' পর্যন্ত তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে । এ বিষয়ে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু পরিমল গোস্বামী লিখেছেন --- **"তোমার কলমে সবরকম গল্পই এসেছে । এ এক চমকপ্রদ ব্যাপার । হাতী থেকে প্রজাপতি সব রকম গল্প সৃষ্টির ব্রহ্মা হয়ে বসে আছ তুমি, তাই তোমার লেখায় আমার বিস্ময় জাগে ।"**[৭] তা সে যত অকিঞ্চিতকর হোক না কেন তার মধ্যে গভীর জীবনসত্য রূপায়ণ করেছেন বনফুল । সমালোচকেরা বনফুলের গল্পে ভাবের গভীরতার অভাবের কথা বলেছেন । কিন্তু বনফুলের গল্পগুলি যদি **'একটু ঝুঁকে পরে দেখা যায়'** ও একটু গভীর ভাবে ভাবা যায় তাহলেই আমরা বুঝতে পারি বনফুল কত সাধারণ ভঙ্গিতে, বিষয়ে কত গভীর ভাবের গল্প বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন । বনফুলের সৃষ্টির কালোত্তীর্ণতা তাঁর শিল্পমূল্যকে নির্ধারণ করে দিয়েছে । বনফুলের গল্পে পরিহাস, ব্যঙ্গ, শ্লেষ, কটাক্ষ এমন এক সহজ-সরল ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে, যা বনফুলের বিশিষ্টতাকে চিহ্নিত করে । সুকুমার সেন বলেছেন --- **"বলাইবাবু একঘেঁয়ে মসৃণ কাহিনী লেখেন নি**

তাছাড়া তাঁর কাহিনীতে বুদ্ধিরসের যোগান আছে । বাঙালী পাঠকের ডিস্‌পেপ্‌টিক মানসে বুদ্ধিরস দুষ্পাচ্য । এখানেই বলাইবাবুর বিশেষত্ব ।''[৮]

কোন কোন সমালোচক বনফুলের **'ছোট'** আকৃতির কোন কোন গল্পকে **'ছোটগল্প'** বলতে চান নি, সেগুলিকে চুটকিগল্প বা চূর্ণকগল্প বলেছেন, **'সেগুলি যেন গল্প নয়, গল্পের আভাস ।'** কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে চুটকি বা চূর্ণক গল্প জাতীয় রচনায় ছোটগল্পের মতো গভীর জীবনসত্য প্রকাশ পায় না । একটু হালকা, লঘু বিষয় সাধারণত চুটকিতে রূপলাভ করে । কিন্তু বনফুলের **'ছোট'** গল্পগুলি পাঠে আমরা দেখি, সেখানে বিষয় যতই অকিঞ্চিতকর হোক না কেন, তাতে কোন না কোন গভীর জীবনসত্য রূপলাভ করেছে এবং সেগুলি রসোত্তীর্ণ ছোটগল্পে পরিণত হয়েছে ।

বনফুলের **'ছোট'**, **'মাঝারি'** ও **'বড়'** আকৃতির গল্পে পরিসংখ্যানে দেখা যায় তিনি **'ছোট'** (যেগুলি এক থেকে দু'পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত) ও **'মাঝারি'** (যেগুলি দু'পৃষ্ঠা থেকে বেশি অথচ পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে) আকৃতির গল্প রচনাতে বেশি আগ্রহী ছিলেন । কেননা ঐ বিশেষ আয়োতনের গল্পরচনাকে তিনি শিল্পরূপ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । কেননা যিনি **'জঙ্গম' 'ডানা', 'ভূবনসোম' 'অগ্নীশ্বর'**-এর মতো বড় বড় উপন্যাস লিখেছেন, তিনি যখন এত ছোট আকৃতির গল্প রচনা করছেন, তখন তাঁর এই বিশেষ আয়তনের গল্প রচনায় একটি সচেতন মন সবসময় কাজ করেছিল বলে আমাদের মনে হয় । তাঁর সংযমী ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক মানসিকতা এই হ্রস্বাবয়ব গল্পের কায়া গঠনে অদৃশ্য শক্তির মত কাজ করেছে ।

বনফুলের গল্পে অতিকথনের কোন অবকাশ নেই । বিষয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য যেটুকু আয়তন, শব্দ, বাক্য প্রয়োজন সেটুকুই তিনি নিয়েছেন । সেকারণে তাঁর গল্পে কোন একটি বাক্য, এমনকি শব্দ বাদ দেওয়া অসম্ভব । বনফুলের গল্পগুলি যেন বৃত্তান্তহীন বৃত্তান্ত । কোন বাড়তি আবেগময়তায় না ভেসেও যে অল্পকথায় অনেক গভীর কথা বলা যায়, বনফুলের গল্প তার প্রমাণ । অথচ জীবন ব্যাখ্যায় তা কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না ।

বনফুল বাস্তববাদী লেখক । তবে সেই বাস্তবতার চিত্রণে কল্পনার স্থান যে নেই তা নয়, সেই কল্পনাকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করেছেন শিল্পীসুলভ সংযমে । আবেগ ও কল্পনাকে সঠিক খাতে পরিচালনা করার, নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা বনফুলের ছিল । এটাও বনফুলের একটা বিশেষত্ব ।

আকৃতির পাশাপাশি বনফুল বিভিন্ন প্রকৃতির ছোটগল্প লিখেছেন । কোনটি রঙ্গ-ব্যঙ্গ মিশ্রিত হাস্যরসের গল্প, কোনটি বলিষ্ঠ জীবনবোধের, কোনটি নাটকীয়, কোনটি মানব চরিত্রের রহস্য উন্মোচণকারী, ইত্যাদি । কিন্তু বনফুলের গল্পের বক্তব্যের এত বিভিন্নতা যে, কোন একটি নিদিষ্ট শ্রেণিতে একের অধিক গল্পকে যেন গোত্রভুক্ত করা যায় না । তবুও বিভিন্ন শ্রেণির যে জীবন চিত্র তিনি এঁকেছেন তাঁর সেই বিষয়-বৈচিত্র্য আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে । বনফুল যেখানে স্খলন-পতন দেখেছেন সেখানে ব্যঙ্গের হুল ফুটিয়েছেন, আবার শত দারিদ্র্য-দুর্দশার মধ্যে এক সুষ্ঠু মহৎ-বৃহৎ উন্নত মানসিকতার পরিচয় তুলে ধরেছেন, কখনো মানবচরিত্রের অন্তর্শায়ী রহস্য উন্মোচণ করেছেন, কখনো নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করেছেন, কখনো রূপকের আড়ালে অন্য রূপকথা শুনিয়েছেন, কখনো কল্পনায় অলৌকিক জগতে পাড়ি দিয়েছেন, কখনো নাটকীয় চমকে জীবন রহস্য উন্মোচণ করেছেন, কখনো শিশু-কিশোরের জন্য রোমাঞ্চকর গল্প ফেঁদেছেন, কখনো মানব ও পশুকে একাত্ম করে ভিন্ন স্বাদ পরিবেশন করেছেন, কখনো বুদ্ধিপ্রধান মনন সন্নিবেশ করেছেন, কখনো নিয়তির হাতে মানুষের পরাভবের কথা বলেছেন, কখনো মানুষের জৈবপ্রবৃত্তিমূলক ভাবনা প্রকাশ করেছেন, অন্ধ কুসংস্কারে মানব জীবনের চরম বিপর্যয়ের চিত্র এঁকেছেন ।

যে কোন বিষয়ই ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে । অর্থাৎ জগতের সবকিছুই ছোটগল্পের বিষয় । আর সবকিছুর ছোটগল্প হয়ে ওঠার অপরিহার্য উপাদান হল স্রষ্টার তীব্র ইচ্ছার একক শক্তি প্রেরণা । ছোটগল্পে গলপকার অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক চরিত্র, ঘটনা নিষ্ঠুরভাবে বর্জন করেন । লেখক শুধু একটি রসঘন নিবিড় মুহূর্তের জয়োল্লাস পরিকল্পনায় মগ্ন থাকেন । একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের সংহত আধারে জীবনের অখণ্ড গভীর পরিচয়টিকে বিম্বিত করে তোলা ছোটগল্পের কাজ । বনফুল মিতবাক্য বিন্যাসে, অপ্রয়োজনীয় উপকরণগুলিকে যথাসম্ভব বাদ দিয়ে ছোটগল্পকে সবচাইতে **'ছোট'** করে রচনা করে তার মধ্যে বৃহতের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে বহু সার্থক ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন ।

বনফুলের **'ছোট'** গল্পগুলি বেশিরভাগ ভাবাশ্রিত, মেদভারবর্জিত, অতিকথনবর্জিত, সংহত, সংযত । **'মাঝারি'** আকৃতির গল্পগুলি তুলনায় বৃত্তান্তযুক্ত, কিন্তু আবেগের ডাল-পালা ছাঁটা । **'বড়'** আকৃতির গল্পগুলিতে বৃত্তান্ত থাকলেও অতিকথন নেই । গল্পের ভাব ও চরিত্রধর্ম বিকাশে যতটুকু বলা দরকার ততটাই বলেছেন ।

বনফুলের বিপুল-বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভারের গল্পগুলিকে তিন শ্রেণিতে আলোচনা করে আমরা দেখিয়েছি যে সবরকম গল্প রচনাতে বনফুল সমান দক্ষ । একটি গল্পকে ছোটগল্প হয়ে উঠতে গেলে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন তার সবগুলি তাঁর গল্পে উপস্থিত ।

তাঁর **'ছোট'** আকৃতির অণুগল্প বা মিনিগল্পগুলি তাঁকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে । কিন্তু সেগুলি ছাড়াও **'মাঝারি'** ও **'বড়'** আকৃতির রচনাতেও যে তিনি সমান দক্ষ তা প্রমাণিত হয়েছে । তাঁর **'ছোট'** আকৃতির কোন কোন গল্পে যেমন অনেকে গল্পত্ব বলে কিছু খুঁজে পান না, তাতে তাঁরা আখ্যানত্বই সেখানে দেখতে পান । কিন্তু একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বনফুল ছোটগল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্যে সেগুলিকে উদ্ভাসিত করেছেন । আর **"আধুনিক ছোটগল্পে ঘটনা থাকতেই হবে এমন কোন প্রতিশ্রুতি নেই । একটি মুহূর্তের বিলাস, একটি মনন, একটুখানি দেখা, একটি মেজাজ, খানিক জাগর-স্বপ্ন (Surrealism)--- এরা সবাই-ই একালের ছোটগল্পের বিষয় হতে পারে ।"**[৯] কেননা আধুনিক ছোটগল্পের বিষয় বিন্দুবৎ হয়ে যাচ্ছে । তাই বৃত্তান্তের দিকে লেখক না ঝুঁকে জীবনের এক কোন চিরন্তনসত্যের রূপনির্মাণে আলোকসম্পাত করেন । একথাগুলি বনফুলের **'ছোট'** আকৃতির অণুগল্প বা মিনি গল্পগুলির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । তাই বনফুলের **'ছোট'** গল্পগুলি যত ছোটই হোকনা কেন তাতে জীবনের এক চরমসত্য রূপলাভ করেছে এবং তাতে ছোটগল্পের **'গল্পত্ব'**ও পুরোপুরি উপস্থিত । একি ভাবে **'মাঝারি'**ও **'বড়'** আকৃতির গল্পগুলিতে লক্ষ্য করা যায় যে, সার্থক ছোটগল্পের যা যা বৈশিষ্ট্য একটি গল্পে থাকা উচিৎ, সে বৈশিষ্ট্যগুলি সেখানেও লভ্য । এই ত্রিবিধ আকৃতির গল্পে বিষয়বস্তু নির্বাচন, বিষয়বস্তুর বিন্যাস কৌশল, কাহিনীর একমুখিগতি সংযত সংহত ভাষা ব্যবহার, আয়তনের সংক্ষিপ্তি, ব্যঞ্জনাধর্মীতা --- সবকিছু মিলে সেগুলি প্রত্যেকটি সার্থক ছোটগল্পে পর্যবসিত হয়েছে । বনফুলের **'ছোট'** আকৃতির গল্পগুলি লক্ষ্য করলে দেখব যে সেখানে বিষয়বস্তুর বিন্যাস এমন আঁটসাঁটভাবে বাধা যেখান থেকে কোনরকম গ্রহণ বর্জন সম্ভব নয় । বনফুলের কঠোর সংযমী ব্যক্তিত্ব এই ব্যতিক্রমী শিল্প সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে । কম প্রতিভাবান লেখকের হাতে পড়লে তা যে বিফলতায় পর্যবসিত হত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । বনফুলের শিল্পী-ব্যক্তিত্বের এখানেই কেরামতি । অথচ তিনি দীর্ঘ চৌদ্দ পাতার ('অর্জুন মন্ডল') গল্পও লিখতে পারেন । আসলে বক্তব্য-বিষয়কে যথাযথ বর্ণনার জন্য যেটুকু আয়তন প্রয়োজন সেটুকুই তিনি নিয়েছেন । কোন গল্প কোথায় শুরু করতে হবে বা শেষ করতে হবে তা তিনি ভালোভাবেই জানতেন । বনফুলের এই কঠোর সংযমী ব্যক্তিত্বই তাঁর গল্পের আয়তন সৃষ্টির পক্ষে বড় ভূমিকা পালন করেছে । তাছাড়া বিষয়বস্তুর নির্বাচন এবং তাকে উপস্থাপন করার মধ্যে একটি বিশেষ কৌশল নিয়েছিলেন বনফুল । যা তৎকালীন অন্যান্য লেখকদের রচনায় পাই না ।

ব্যঙ্গ-কৌতুকে বনফুলের লেখনী ক্ষুরধার । ঈশ্বরগুপ্ত ও ত্রৈলোক্যনাথের পথ ধরেই বাংলা সাহিত্যে তিনি ব্যঙ্গ-কৌতুক রসকে পরিপুষ্টি দিয়েছেন । মানুষের চরিত্রের যেখানেই অসঙ্গতি দেখেছেন, সেখানেই ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন । একজন ন্যায়নিষ্ঠ শাসক যেমন নিয়ম লঙ্ঘনকারীকে মুখে বক্র হাসি নিয়ে পিঠে চাবুক চালাতে দ্বিধা করেন না

, বনফুল তেমনি মানব চরিত্রের স্খলনে স্খলিত চরিত্রের পিঠে সেই চাবুক হানান, ঠোঁটের কোনায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাসি নিয়ে ।

বনফুলের গল্পের মধ্যে এমন এক আকর্ষণীয় শক্তি আছে, এমন নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি আছে, যা পাঠককে প্রতিমুহূর্তে বিস্ময়, কৌতূহল ও আনন্দ দান করে । বনফুলের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে সমালোচক লিখেছেন --- **''তাঁর পরিমিতিবোধ, আখ্যানধর্মী সহজ সরল বর্ণনা --- ঋজু স্পষ্ট এবং তির্যক, অতি অল্পকথায় অদ্ভুত চরিত্রাঙ্কন, ব্যঙ্গাত্মক সরস দৃষ্টিভঙ্গি, গল্পশেষে আকস্মিকতা এবং প্রাণখোলা হাস্যরস ।''**[১০] বনফুলের চিন্তা ও লেখায় কখনো একঘেঁয়েমি আসেনি । তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ --- এককথায় বিবিধ সাহিত্য শাখায় স্বচ্ছন্দে পদচারণা করেছেন । তিনি জীবনকে যতটা বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার চেয়ে বেশি বিস্ময় ও মুগ্ধ করেছেন পাঠককে তাঁর সৃষ্টি দিয়ে । বস্তুতঃ **''বনফুলের রচনায় মুগ্ধতার উপকরণ যতটুকু, তার অনেকটাই ঐ অনির্মোচনীয় বিস্ময়-চমকে গড়া । কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে বিস্ময়ের চেয়েও প্রগাঢ় যে রহস্যগ্রন্থি বারে বারে চেতনাকে আকর্ষণ করে, অথচ প্রায় কখনোই যার মূল স্পর্শ করানো যায় না, তার উৎস রয়েছে শিল্পীর ব্যক্তিসত্তার গভীরে নিহিত । সেই মূলভূমি থেকে সৃষ্টিধারার অনুবর্তন না করলে পরিণামী রসসত্যের মোহনায় পৌঁছানো দুঃসাধ্য ।''**[১১]

বনফুলের গল্প বলার একটি বিশেষ ভঙ্গি ছিল । সে ভঙ্গি হল বৈঠকী ভঙ্গি । তিনি যেন পাঠককে বলেন --- **'শোন, একটি গল্প বলি তোমাদের ।'** এই বৈঠকী ভঙ্গি ত্রৈলোক্যনাথ থেকে পরশুরাম পর্যন্ত অনেকের লেখায় আছে । কিন্তু বনফুল সেই ভঙ্গিটিকে আরো আধুনিকীকরণ করেছেন । অসংখ্য গল্প তিনি এই ভঙ্গিতে রচনা করে পাঠকের মন জয় করেছেন ।

বনফুলের চালচলনে এমন একটা ঋজুতা এবং চিন্তায় এমন একটা স্বচ্ছতা ছিল, যা তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে এবং স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে, **'শিল্পীর নিস্পৃহতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতা মিলে'** তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে । **'' ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের হাতে শব-ব্যবচ্ছেদের যে ছুরি রয়েছে, তার নির্মম নিপুণ ব্যবহার হয়েছে ছোটগল্পে মানব জীবনের বিশ্লেষণে । পরিচিত সংসারের পরিচিত মানুষের হীনতা-নীচতা-মহত্ত্ব-ঔদার্য তাঁর বিশ্লেষণের সূচীমুখে ধরা পরে । অতিপ্রাকৃত রস সৃষ্টিতে, মানুষের হীনতা-নীচতার নির্মম বিশ্লেষণে, বিজ্ঞান দৃষ্টির সার্থক প্রয়োগে, সুদূরপ্রসারী সদাঅতৃপ্ত কৌতূহলের ব্যাপক ব্যবহারে তাঁর ছোটগল্পগুলির হীরের টুকরোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । বনফুলের**

শিল্পসামর্থ কেবল **'to open out the soul of Little and familiar things'** নয়, সেইসঙ্গে ব্যঙ্গের দর্পণে নির্মম উন্মোচণে ব্যাপৃত।''[১২]

বনফুল জীবনরসিক শিল্পী। নিয়ত সঞ্চরমান জীবন থেকে টুকরো টুকরো ঘটনা আহরণ করে তিনি পীড়িত, বঞ্চিত, দুর্দশাগ্রস্থ জীবনের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। তিনি বাস্তবতাকে কখনো এড়িয়ে যান নি। বিকৃত বর্তমানের পঙ্ক মন্থন করে জীবনের পরমসত্য সন্ধানে সর্বদা ব্যাপৃত থেকেছেন। সেই জীবন সত্য প্রকাশে তিনি নির্মম, নিষ্ঠুর, ভাবালুতামুক্ত, সংযত। বনফুলের বিচিত্রস্বাদের গল্পগুলির মধ্যে জীবনের বহু অনুদ্‌ঘাটিত রহস্য, বহু অনাবিস্কৃত দিক, বহু খণ্ড ছিন্ন মুহূর্ত চকিত চমকে উদ্ভাসিত হয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা দিক, যেগুলি অনেক ক্ষেত্রে সেই সময়কার লেখকেরা আলোকপাত করেননি, বনফুল সেইসব জীবন চিত্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাঁর ছোটগল্পের রূপ দিয়েছেন। সত্য ও সুন্দরের পূজারী বনফুলের গভীর অনুভবশক্তি তাঁর ছোটগল্পের রূপনির্মাণে সাহায্য করেছিল। মানবচরিত্রের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাঁর গল্পে।

বনফুলের গল্পে কহিনীবিন্যাসে সহজ সরল নিস্তরঙ্গ বর্ণনা থাকে প্রথম দিকে। কিন্তু গল্পের শেষের দিকে এমন একটি মোচড় বা খোঁচা দেয় যা পাঠকের চেতনার সম্বিত ফেরায়, তার বাস্তবভূমির স্পর্শছিন্ন হতে দেয় না কিছুতেই। গল্পের শেষের সেই একটি অনুচ্ছেদ বা দুই একটি বাক্য অনিবার্য পরিণতিটুকুকে পূর্ণতা দিতেই ব্যবহার করা হয়। বনফুলের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই বিরোধ বা বিপ্রতীকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বিরোধ সৃষ্টিতে কাহিনী ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আপনা-আপনি পরিণতির পথে এগিয়েছে। আর শেষে নাটকীয় ভঙ্গিতে **'চাবুক-হাঁকড়ানো সমাপ্তি'**তে (whip crack ending) পাঠকের মেনে বিস্ময় উৎপাদন করে। বনফুলের গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনাই তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। বনফুলের বেশিরভাগ গল্পেরই বৃত্তান্ত অংশ খুব কম। সংযত ভাষায়, ব্যাখাহীন, বর্ণনাহীন, দৃশ্যপটহীন পদাকাঙ্ক্ষার দ্বারা অন্বিত কাটা কাটা বাক্যে কার্য-কারণ সূত্রে গ্রন্থিত কয়েকটি ঘটনার ধাপ নির্মাণ করে অকস্মাৎ উঁচু সিঁড়ি থেকে অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার মত সংঘটনে সমাপ্তি টানেন। এ বিষয়ে সতীনাথ ভাদুড়ী মহাশয় লিখেছেন --- **''কুতুহলী পক্ষপাতহীন দৃষ্টিতে দূর থেকে দেখেন 'বনফুল'। সবটুকুকে একসঙ্গে একনজরে দেখেন না। নাটকের দৃশ্যের মত ছোট টুকরো করে নিয়ে দেখেন। বৈজ্ঞানিক বাইনোকুলার দিয়ে যেন পাখি দেখছেন। এক এক সময় এক সীমাবদ্ধ বৃত্তের উপর তার নজর। এই কাটা কাটা ভাবটাই তাঁর পছন্দ।''**[১৩] এই বৈশিষ্ট্যগুলি বনফুলের **'ছোট'** ('নিমগাছ', 'ছোটলোক', 'জ্যোৎস্না' প্রভৃতি), **'মাঝারি'** ('জৈবিক নিয়ম', 'মুহূর্তের মহিমা' প্রভৃতি) এবং **'বড়'** ('ঐরাবত', 'অর্জুন মণ্ডল' প্রভৃতি) --- এই তিন আয়তনের

গল্পেই লক্ষ্য করা যায় । প্রত্যেকটি কাটা কাটা বর্ণনা পদাকাঙ্ক্ষার দ্বারা কাহিনীর মধ্যে ঐক্য বজায় রেখেছে । এই কাটা কাটা বর্ণনাতে গল্প দ্রুত গতি প্রাপ্ত হয়েছে এবং পরিণতিকে তীব্রতর, শক্তিশালী ও নাটকীয় করে তুলেছে ।

বনফুলের গল্পের বিষয় মহাকাব্যোপম স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল বিস্তারী । তাই সেখানে মানব জীবনের বিবিধ অনুভূতি রূপায়িত হয়েছে । বিষয়বস্তু বাস্তব আর কল্পনার মিশ্রণে, লৌকিক আর অলৌকিকতার সমন্বয়ে, বর্তমান আর পুরাণের সংমিশ্রণে , সমান্তরতা আর বিরোধের সমবায়ে চমৎকারিত্ব প্রাপ্ত হয়েছে । একালের সমালোচনায় যাকে **'ম্যাজিক রিয়ালিজম'** বা **'যাদু বাস্তবতা'** (বাস্তব ও কল্পনার একধরণের মেশামেশি । অর্থাৎ ঘটনা যা ঘটছে, তার মধ্যে কতটা কল্পনায় অনুভব করা, আর কতটাইবা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করা --- তার সীমারেখা যখন টানা সম্ভব হয় না --- দুয়ে মিলেমিশে এক অদ্ভুত, আশ্চর্য অনুভূতির সৃষ্টি করে, তখনি ম্যাজিক রিয়ালিজমের উদ্ভাস ঘটে) বা **'হ্যালুসিনেশ্যন'** বা **'ড্রিম রিয়ালিজম'** (কল্পনায় অনুভব করা কোন কিছুকে চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে করা ।) বলেছেন, তা বনফুলের গল্পে আমরা নানা ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখি । এসবের রূপায়ণ হয়েছে কাহিনীর চয়ন, বয়ন এবং **'Cohesion'** নির্মাণে । **'Cohesion'** হল পূর্বের সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাকে যুক্ত করে আখ্যানকে ঐক্য দান করা । আসলে **''তিনি ছিলেন আধুনিক ও উত্তীর্ণ-আধুনিক সাহিত্যের আঙ্গিক অনুশীলনকারী যা আমরা সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে পাইনি ।''**[১৪]

আধুনিক ছোটগল্পের মূল মননধর্ম হল ঘটনার বহুধা বিস্তৃতি নয়, একক প্রতীতী বা Single Impression । বাহুল্য বর্জন করে যথাযথভাবে বিষয়ের বিন্যাসে বনফুল তাঁর বিশেষত্ব প্রতিপাদন করেছেন । তাই বনফুলের ছোটগল্প আর কোন একজন লেখকের রচনা সম্ভার শুধু নয়, তা একটি বিশেষ রীতির, বিশেষ ছাঁদের গল্পের নমুনা হয়ে উঠেছে । গল্পের এই বিশেষ ছাঁদ নির্মাণে তিনি সাফল্যের চরম শিখরে আরোহণ করেছেন ।

সাহিত্যিক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী **'আমার সাহিত্য জীবন আমার উপন্যাস'** গ্রন্থে লিখেছিলেন --- **''একটা মানুষের জীবনে সাহিত্য-রচনা শিল্প-সৃষ্টি কিছু আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । একটু একটু করে সে গল্প লেখক হয়ে ওঠে, ঔপন্যাসিক, কবি বা চিত্রকর হয়ে ওঠে । বিন্দু বিন্দু করে তার রক্তে শিহরণ সঞ্চারিত হয় ।''** --- একথা সর্বাংশে সত্য । কোন মহান সাহিত্যিকই দেশ-কাল নিরপেক্ষ হতে পারেন না । সমকালের ও পূর্ববর্তীকালের নানা ঘটনা, বিষয়, পরিবেশ-পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিকতা, সমাজ-অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সাহিত্যিকদের রচনা কোন না কোন ভাবে প্রভাব ফেলবেই । অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো বনফুলের মধ্যেও পরেছিল । তাঁর সমসাময়িক নানা ঘটনা, বিষয়,

রাজনীতি, রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি, সমাজনীতি লেখক-শিল্পীদের রচনার ধারাও ধরণ কোন কোন ক্ষেত্রে পড়লেও পড়তে পারে । কেননা সমালোচকেরা বনফুলের **'ছোট'** আকৃতির অণু বা মিনি গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথের **'লিপিকা'**-র ও ও'হেনরির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন । কিন্তু মনে রাখতে হবে এধরণের ছোট ছোট ('Short short') গল্প রচনার প্রবণতা বহু প্রাচীন । বিষ্ণুশর্মার **'পঞ্চতন্ত্র'**, **'হিতোপদেশ'**, ইশপের গল্পগুলি, সোমদেবের **'কথাসরিৎসাগর'**, বাইবেলের দু'খন্ডের গল্পগুলি, ইংরেজিতে **'প্যারাবল'** বা রূপকজাতীয় গল্পগুলি, জোক্‌স জাতীয় রচনাগুলিতে ইতিপূর্বে তার আভাস ফুটে উঠেছে । তবে মোদ্দাকথা হল, সেই অনুসৃত ভাবনাকে নিজস্বভঙ্গিতে রূপদানের মধ্য দিয়ে মৌলিক এবং বিশিষ্ট করে তোলার মধ্যে লেখক কতটা সফল হয়েছেন । যা বনফুল অনায়াসে করেছেন । পূর্ববর্তী ও সমকালীন কোন কোন মহান সাহিত্যিকদের প্রভাব করো উপর পড়বে না বা থাকবে না --- তেমনটা হতেই পারে না । কেউই আকাশ থেকে পড়ে না । বাস্তবের আলো হাওয়া মাটিতেই তাঁর জীবনের সূচনা, ভিত্তি ও সমাপ্তি । তা সে প্রভাবজাত হোক বা মৌলিকই হোক বনফুলের সমগ্র গল্পে মানব জীবনের যে রূপ চিত্রায়িত হয়েছে তা যেমন আমাদের ভাবিয়ে তোলে তেমনি চমকে দেয় । ছোটগল্পে যে চিত্র উদ্ভাসিত হয় তা দু' জাতের --- **''পোট্রেট অর্থাৎ ছবি, এবং ক্লোজ-আপ অর্থাৎ চেহারা । পোট্রেট ভাবিয়ে তোলে ক্লোজ-আপ্‌ চমক দেয় । বনফুলের অসাধারণ দক্ষতা ক্লোজআপে ।''**[১৫] কিন্তু বনফুলের সমস্ত গল্প নিবিড়ভাবে পাঠ করে আমাদের মনে হয়েছে, বনফুলের দক্ষতা শুধু চমক লাগানোকে নয়, ভাবিয়ে তোলাতেও । বনফুলের গল্পের শেষে নাটকীয় চমক যে সত্যের উদ্ভাস ঘটায় সেখান থেকেই পাঠকমনের ভাবনার অনুরণন চলতে থাকে । **''বনফুলের বিজ্ঞান চেতনা আশ্চর্য গাণিতিক পদ্ধতিতে যেন একটির পর একটি কথা গুণে গেঁথে সাজিয়ে তুলেছেন । ছোটগল্পের আঙ্গিক রচনায় এই অতিসচেতন গাণিতিক পরিমিতিবোধ সাহিত্যক্ষেত্রে একেবারেই বিরলদৃষ্ট ।''**[১৬]

বিপুল-বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির অকৃত্রিমতা নিয়ে বনফুল মানুষ ও জীবনকে চিত্রিত করেছেন । বনফুল এক জায়গায় বলেছেন ---**''একজন পাশ্চাত্য মনীষী কাব্যকে Interpretation of life বলিয়াছেন । কথাটা সম্পূর্ণ হইত 'Poet's Interpretation of life' বলিলে ।''** ('কাব্যপ্রসঙ্গ' প্রবন্ধ, 'শিক্ষার ভিত্তি') বনফুল সারা জীবনব্যাপী যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তার সঙ্গে নিজের জীবনদর্শনকে সুচারুরূপে মিশিয়ে এক-একটি অসাধারণ গল্প রচনা করেছেন । বনফুল তাঁর গল্পে চলমান জীবনের কথা বলেছেন, যে জীবন সুস্থভাবে, সুষ্ঠুভাবে, সত্যের সঙ্গে, আদর্শ ও নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে চলার কথাই বলে । ছোটগল্প কঠোর জীবনসত্য উন্মোচণে সদা উন্মুখ, যে জীবন চোরা লণ্ঠনের আলো নয় , বৃহৎ জীবনস্বরূপ উন্মোচক । কেননা যে খণ্ড জীবনের কথা আমরা ছোটগল্পে পড়ি, তা থেকে অখণ্ড জীবনসত্য আমাদের অনুভূত হয় । **''তাই ছোটগল্পকে**

'চোরা লণ্ঠনের আলো' বলা যায় না আর;বরং তাকে ভাবতে হয় দাউদাউ আগুনের স্ফুলিঙ্গ হিসেবে ।''[১৭]

ভাষা শুধুমাত্র একের সঙ্গে অপরের ভাব বিনিময়ের মাধ্যম নয়, তা ব্যবহারকারী ব্যক্তির বিশেষত্ব নির্দেশকও । কেননা, লেখকের মন-মানসিকতা, সমকালিক চেতনা, পরিবেশ-পরিস্থিতি সেই ভাষার অবয়ব গঠনের প্রভাব বিস্তার করে । এই ভাষা ব্যবহারের বিশেষত্বই একজন লেখককে অন্যান্য লেখকদের চাইতে বিশেষ করে তোলে । তাই ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে লেখক-ব্যক্তিত্ব যুক্ত হয়ে পড়ে । বিষয় ও প্রসঙ্গভেদে এই ভাষারূপ আবার পরিবর্তিত হয় । এইজন্য একজন লেখকের মধ্যে একাধিক ভাষাশৈলী আমরা পেতে পারি । সেই ভাষাশৈলীতে একজন লেখক কিরকম ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ, ছন্দ, আলঙ্কার, ছেদ-যতি, ক্রিয়া, বিভক্তি, বচন, প্রত্যয়, লিঙ্গ প্রভৃতি ব্যবহার করছেন তাতে তাঁর অন্তর্শায়ী চেতনার স্বরূপ ধরা পরে । কেননা একজন লেখক যখন কোন বিষয় ভাবেন, তখন তিনি সেই বিষয়ের উপযোগী ভাষাই ভাবপ্রকাশের জন্য ব্যবহার করেন, আর বিষয় থেকে ভাষার ব্যবধান যদি থাকে তবে সেখানে কৃত্রিমতা চলে আসে, রসহানি ঘটে । কবি জীবনানন্দের ভাষায় ---

''মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে ।'' (১৯৪৬-'৪৭, বেলা-অবেলা-কালবেলা)

বনফুল গল্পের চরিত্র গঠন করতে গিয়ে, গল্পের পরিবেশ নির্মাণে, বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা যথাযথ হয়েছে ।তাঁর ছোটগল্পের ভাষা আশ্চর্যজনকভাবে চরিত্রানুসারী, গল্পের সুর অনুযায়ী কথনরীতি স্বতন্ত্র স্বাদের, সংলাপে পরিমিতিবোধ, ভাষার আঁটসাঁট বাঁধন তাঁকে সে সময়ের লেখকেদের মধ্যে বিশিষ্ট করে তুলেছে । সমালোচক বনফুলের ছোটগল্পের ভাষা প্রসঙ্গে বলেছেন --- **''বনফুলের গল্পের সর্বাপেক্ষা বড়গুণ তাঁর ভাষায় কোন চটক নেই, চমক নেই, অলঙ্কার বাহুল্য নেই, সহজ সরল ।''**[১৮] বনফুল তাঁর ছোটগল্পের ভাষাশৈলী নির্মাণে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করেছে । বর্ণনা অংশে সাধুভাষা এবং প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন । বাক্য নির্মিতিতে ছোট-মাঝারি-বড়--- এই ত্রিবিধ শ্রেণির বাক্য বিচিত্র ভাবে প্রয়োগ করেছেন । এতে গল্পের বৈচিত্র্য যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি গল্পের গতি অব্যাহত থেকেছে । ছোট ছোট সরল বাক্যের ব্যবহারের পাশাপাশি একাধিক অসমাপিকাক্রিয়া সহযোগে দীর্ঘ জটিল, যৌগিক বাক্য প্রয়োগও করেছেন । সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার করেছেন । কর্তাহীন, ক্রিয়াহীন ছোট ছোট কাটা কাটা বাক্য তৈরী করেছেন ।কখনো এক-একটি শব্দে এক-একটি বাক্য তৈরী করেছেন । এতে কাহিনী ক্ষিপ্রগতিপ্রাপ্ত হয়েছে । বাক্যগুলিতে কাব্যগুণ,

চিত্রগুণ পরিব্যাপ্ত । বিশেষণধর্মী বাক্যাংশ ব্যবহার, উপমা-রূপম বিবিধ অলঙ্কারের প্রয়োগ গল্পের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে । তাছাড়া ভাষারীতিতে কথ্যভঙ্গির প্রবণতা এত প্রবল যে, মনেই হয় না তা সাহিত্যের ভাষা । মুখের ভাষাকে সাহিত্যের কৌলীন্যদানে বনফুলের বিশেষ অবদান আছে । চলিত ভাষারীতিতে তো আছেই, সাধুভাষারীতিতেও তিনি ক্রিয়াপদ আর সর্বনামপদ ছাড়া বিশেষ কিছু পরিবর্তন করেন নি ।এমনকি সাধু ভাষায় তিনি এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সচরাচর আমরা কথ্যভাষায় ব্যবহার করি । সেকারণে বনফুলের গল্পে তৎসম শব্দবহুল ভাষারীতির তুলনায় তদ্ভব, দেশী, বিদেশী শব্দের বাহুল্য লক্ষ্য করা যায় । এছাড়া আরবী-ফার্সী শব্দের ব্যবহারও আছে । বনফুলের গল্পের ভাষাশৈলীর আর একটি বিশিষ্ট দিক হল ইংরেজি শব্দের ব্যবহার এবং ভাষামুদ্রা (Register) ব্যবহার । ট্রেন সংক্রান্ত, ডাক্তারী সংক্রান্ত অনেক **'ভাষামুদ্রা'** ব্যবহার করেছেন বনফুল । বনফুল পেশায় ছিলেন চিকিৎসক এবং তাঁর বাসস্থান ও অন্যান্য জায়গায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে ট্রেনই ছিল সংযোজক । তাই এ ধরনের ভাষামুদ্রা ব্যবহার তাঁর গল্পে যেন খুবই স্বাভাবিক ছিল, তেমনি তাঁর ভাষার বিশিষ্টতাকে তা চিহ্নিত করেছে । এর সঙ্গে আছে হিন্দি শব্দ, বাক্যের ব্যবহার । তাঁর অনেক গল্পের চরিত্র হিন্দীভাষী বিহারী । এই বিবিধ শ্রেণির চরিত্রের ভাষাশৈলী নির্মাণে বনফুলের কৃতিত্ব প্রশ্নাতীত ।

বনফুলের ভাষাশৈলীর স্বচ্ছতা (ক্ল্যারিটি), সরলতা (সিম্প্লিসিটি), সংক্ষিপ্তি (ব্রেভিটি) এবং সরসতা তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে । বনফুলের ভাষাশৈলী থেকেই বনফুলের ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে । বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এই নিগূঢ় অন্বয়ে বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলী সফলতা অর্জন করেছে । বনফুলের গল্পের ভাষা বিষয়ের আলোকে উদ্ভাসিত ঝকঝকে এবং দ্রুতগতি সম্পন্ন । বনফুলের গল্পের ভাষা, বাক্য এমনভাবে বিন্যস্ত যাতে শুধু ভাষার বিশিষ্টতা নয়, চরিত্রটির অন্তর্ধর্ম সেই বাক্য ছাঁচে ধরা পড়ে যায় । এই প্রসঙ্গে **'মুহূর্তের মহিমা' 'ঐরাবত'** গল্পের নাম উল্লেখ করতে পারি । এবিষয়ে পূর্বের অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে । বনফুলের প্রত্যেকটি গল্পের ভাষাশৈলী নির্মাণে তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ মুদ্রিত করেছেন । ভাষার সঙ্গে বিষয় এবং লেখক ব্যক্তিত্বের অন্বয়ে এক বিশিষ্ট ভাষাশৈলী নির্মিত হয়েছে বনফুলের ছোটগল্পে । যেখানে তিনি পুরোপুরি সফল এবং একক ।

বনফুলের ছোটগল্পের ভাষাশৈলীর বিশেষত্ব সংক্ষেপে সূত্রাকারে নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল -
--

১। দীর্ঘ বাক্যের তুলনায় হ্রস্ব বাক্যের ব্যবহার প্রবণতা ।

২। বর্ণনা অংশে সাধুভাষা এবং প্রত্যক্ষ উক্তির ক্ষেত্রে চলিত ভাষার ব্যবহার ।
৩। গল্পগুলি কোনটি শুধু সাধুভাষা, কোনটি শুধু চলিতি ভাষায় রচিত ।
৪। ছোট ছোট সরল বাক্যের ব্যবহার ।
৫। কর্তাহীন, ক্রিয়াহীন কাটা কাটা বাক্য ব্যবহার ।
৬। সংযোজক অব্যয়ের ব্যবহার ।
৭। অসমাপিকা ক্রিয়াযোগে দীর্ঘ জটিল বাক্যের সৃষ্টি ।
৮। পদাকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি ।
৯। ছেদ ও যতি চিহ্ন ব্যবহারের বৈচিত্র্য ।
১০। বাক্য গঠনে বৈচিত্র্য ।
১১। অনুকার ও অনুগামী শব্দের ব্যবহার ।
১২। উপমা, রূপক বিবিধ অলঙ্কারের ব্যবহার ।
১৩। বিপ্রতীপতা সৃষ্টি ।
১৪। লেখক-ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত ।
১৫। তৎসম শব্দের তুলনায় দেশি শব্দের ব্যবহার প্রবণতা ।
১৬। প্রতীকের ব্যবহার ।
১৭। ফ্ল্যাস্‌ব্যাক্‌ পদ্ধতির প্রয়োগ ।
১৮। সক্রিয় কর্তার ব্যবহার ।
১৯। শব্দ বিচ্যুতি ।
২০। বাক্য গঠনে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার ।
২১। বিভিন্ন বাগ্‌ধারা প্রয়োগ ।
২২। সমাস-সন্ধিবদ্ধপদ যথাসম্ভব পরিহার ।
২৩। বিভিন্ন ঔপভাষিক রূপের ব্যবহার ।
২৪। বহুভাষিকতা ।
২৫। প্যারডিবক্র ভাষারীতি ব্যবহার ।
২৬। 'ভাষামুদ্রার' সৃষ্টি ।
২৭। ভাষায় স্থান-কালের ছাপ ।
২৮। পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা ।
২৯। বিবিধ প্রকার খণ্ড বাক্যের ব্যবহার ।
৩০। চিঠির ব্যবহার ।
৩১। মিশ্রভাষা রীতি ব্যবহার ।
৩২। গল্পের মধ্যে গল্প বলার রীতি ।
৩৩। শব্দচুম্বক বা বাক্যচুম্বক দিয়ে গল্পের নাটকীয় সূচনা ।
৩৪। শ্লেষাত্মক, ব্যঞ্জনাগর্ভ, তির্যক ভাষা ব্যবহার ।

৩৫। লেখরীতির ব্যবহার । ইত্যাদি ইত্যাদি ।

সার্থক শিল্প দেশ-কাল নিরপেক্ষ হলেও কোন শিল্পই সমকাল ও লেখক-ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়ে গড়ে উঠতে পারে না । কেননা সমকালের বিষয়বস্তু থেকেই লেখক উপাদান সংগ্রহ করেন এবং সেই উপাদানে বিশ্বজনীন সত্য প্রয়োগ করে চিরকালের প্রবাহের সঙ্গে তাকে মিশিয়ে দেন । মানুষের চরিত্র যেহেতু স্থায়ী নবরসের আধার, তাই যুগের পরিবর্তনেও মানুষের এমন কিছু চরিত্রধর্ম থাকে, সমাজজীবনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে, যা প্রত্যেক কালেই লভ্য । তার সঙ্গে শিল্পীর জীবনদর্শন, চিন্তা-ভাবনা, মানসপ্রবণতা মিলেমিসে সৃষ্টিকে বিশেষত্ব দেয় । তাই শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর একটা আত্মিক যোগ থাকে । শিল্প যেহেতু শিল্পী নিরপেক্ষ নয় , সৃষ্টি যেহেতু স্রষ্টা নিরপেক্ষ নয়, তাই শিল্পীর চরিত্রধর্ম শিল্পে প্রতিভাত হয় । বনফুলের **'ছোট'**, **'মাঝারি'**, **'বড়'** --- এই তিন আকৃতির ছোটগল্প তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে ।

বনফুলের ছোটগল্পগুলিতে একটি বিশেষ মুহূর্তের চিত্র আলিম্পনে অনন্ত জীবনে আভাসে, ভাবের একমুখিনতায়, অনাবশ্যক কাহিনীর বর্জনে, উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের রূপ নির্মাণে, মহামুহূর্ত সৃষ্টির তীব্রতায় ও গভীরতায়, ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা সৃষ্টিতে, দেশ-কাল ও জীবন দর্শনের দ্বারা গঠিত লেখক-ব্যক্তিত্বের প্রতিফলনে এক-একটি স্বর্ণসুষমায় পরিণত হয়েছে, রূপদক্ষ শিল্পীর জাদুস্পর্শে সার্থক ছোটগল্পের হীরকদ্যুতি বিচ্ছুরণ করেছে । বনফুলের কি **'ছোট'**, কি **'মাঝারি'**, কি **'বড়'** তিন ধরণের গল্পেই সার্থক ছোটগল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি উপস্থিত । তাই বনফুলের ছোটগল্পের শিল্পসার্থকতা প্রসঙ্গে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি একজন সার্থক শিল্পী ।

- ঃ উল্লেখপঞ্জী ঃ-

১। 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প' ---ড. সরোজমোহন মিত্র । তুলসী প্রকাশনী । প্রথম সংস্করণ ঃ আগস্ট, ১৯৯৭ । পৃ.--- ২৩৭ ।

২। 'বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প' --- জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত । বাণীশিল্প প্রকাশনী । দ্বিতীয়

সংস্করণ ঃ জুলাই, ২০০১ । পৃ. --- ৮ ।
৩। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' --- শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড । পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০১ । পৃ. --- ৬৮৪ ।
৪। 'কালের পুত্তলিকা' --- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় । দে'জ পাবলিশিং । চতুর্থ সংস্করণ ঃ জানুয়ারি, ২০১০ । পৃ. --- ২৭৬ ।
৫। 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' --- শ্রীভূদেব চৌধুরী । মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড । পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০৬-২০০৭ । পৃ. --- ৫৪১ ।
৬। 'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র' --- চিরন্তন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত । দ্বিতীয় খণ্ড । দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ । গল্প শতকের ভূমিকা । পৃ. --- ৭৫৭-৭৫৮ ।
৭। ঐ, পৃ. --- ৭৫৫ ।
৮। 'বনফুলের ফুলবন' --- ড. সুকুমার সেন । সাহিত্যলোক । প্রথম প্রকাশ ঃ দোলপূর্ণিমা ১৩৯০ । পৃ. --- ১০ ।
৯। 'সহিত্যে ছোটগল্প' --- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । চতুর্থ মুদ্রণ ঃ শ্রাবণ ১৪১৬ । পৃ. --- ২০১ ।
১০। 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প' ---ড. সরোজমোহন মিত্র । তুলসী প্রকাশনী । প্রথম সংস্করণ ঃ আগস্ট, ১৯৯৭ । পৃ.--- ২৩৮ ।
১১। 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' --- শ্রীভূদেব চৌধুরী । মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড । পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০৬-২০০৭ । পৃ. --- ৫৩০ ।
১২। 'কালের পুত্তলিকা' --- অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় । দে'জ পাবলিশিং । চতুর্থ সংস্করণ ঃ জানুয়ারি, ২০১০ । পৃ. --- ২৭৭ ।
১৩। 'বনফুল ঃ শতবর্ষের আলোয়' --- পবিত্র সরকার সম্পাদিত, ১৯৯৯, বনফুল জন্মশতবর্ষ সমিতি । পৃ. --- ৮৭ ।
১৪। 'বনফুলের উপন্যাসে পাখসাট শোনা যায়' প্রবন্ধ --- মনোজ চাকলাদার । পশ্চিমবঙ্গ । ৬ ও ১৩ ই আগস্ট, ১৯৯৯ । বনফুল জন্মশতবর্ষ স্মরণ ক্রোড়পত্র । পৃ. --- ১০৫ ।
১৫। 'বনফুলের ফুলবন' --- ড. সুকুমার সেন । সাহিত্যলোক । প্রথম প্রকাশ ঃ দোলপূর্ণিমা ১৩৯০ । পৃ. --- ৬৫ ।
১৬। 'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য'---গোপিকানাথ রায়চৌধুরী । দে'জ পাবলিশিং । দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুন ২০০০ । পৃ. --- ৩১৬ ।
১৭। 'ছোটগল্পের বিনির্মাণ' --- তপোধীর ভট্টাচার্য । অঞ্জলি পাবলিশার্স । পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ জুলাই, ২০০৬ । পৃ. --- ১৬ ।
১৮। 'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প' ---ড. সরোজমোহন মিত্র । তুলসী প্রকাশনী । প্রথম সংস্করণ ঃ আগস্ট, ১৯৯৭ । পৃ.--- ২৪১ ।

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ও পত্র-পত্রিকার তালিকা

পরিশিষ্ট

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী এবং প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা ।

(ক) বাংলা গ্রন্থ ঃ-

(গ)

১। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ ---'বাংলা গল্পবিচিত্রা'। প্রকাশ ভবন । পঞ্চম মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪১০ ।

২। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ ---'সাহিত্যে ছোটগল্প'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । চতুর্থ মুদ্রণ ঃ শ্রাবণ ১৪১৬ ।

৩। গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ ---'ছোটগল্পের সীমারেখা' । বাক্‌সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড তৃতীয় মুদ্রণ ঃ ফাল্গুণ, ১৪১২ ।

৪। গুপ্ত, ক্ষেত্র ---'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস'। গ্রন্থনিলয় । একাদশ সংস্করণ ঃ জুলাই ২০০৬ ।

(চ)

৫। চট্টোপাধ্যায়, ড. গিরিন্দ্রনাথ ---'শৈলীবিজ্ঞান পরিচিতি'। প্রজ্ঞাবিকাশ । প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া ২০০৭ ।

৬। চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার ---'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস'। 'শিল্পকলা' প্রবন্ধ । জিজ্ঞাসা প্রকাশনা । চতুর্থ প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০৩ ।

৭। চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ --- 'বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ'। প্রজ্ঞাবিকাশ । দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২৬শে জানুয়ারী ২০০৭ ।

৮। চৌধুরী, ভূদেব ---'ছোটগল্পের কথা'। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি । পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০০ ।

৯। চৌধুরী, শ্রীভূদেব ---'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার'। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড । পুনর্মুদ্রণ --- ২০০৬-২০০৭ ।

১০। চৌধুরী, শ্রীভূদেব ---'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'। চতুর্থ পর্যায় (রবীন্দ্র যুগ ঃ দ্বিতীয় পর্ব) । দে'জ পাবলিশিং । দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুন ২০০৩, আষাঢ় ১৪১০ ।

(ঠ)

১১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ---'কালান্তর'। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ । পুনর্মুদ্রণ ঃ চৈত্র ১৪০৩ ।

(দ)

১২। দত্ত, বীরেন্দ্র ---'বাংলা ছোটগল্প ঃ প্রসঙ্গ ও প্রকরণ'। প্রথম খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ২০০৩ মার্চ - ২০০৪ এপ্রিল ।

১৩। দাশগুপ্ত, ড. সুধীরকুমার ---'কাব্যলোক'। দে'জ পাবলিশিং । প্রথম দে'জ সংস্করণ ঃ অক্টোবর ১৯৯৮ ।

১৪। দাশগুপ্ত, ধীমান সম্পাদিত ---'বনফুলের কথা সাহিত্য'। বাণীশিল্প প্রকাশনা । প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৮২ ।

১৫। দাস, শিশিরকুমার ---'বাংলা ছোটগল্প'। দে'জ পাবলিশিং । পঞ্চম সংস্করণ ঃ ডিসেম্বর ২০০৭ ।

১৬। দাস, শিশিরকুমার ---' গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব'। দে'জ পাবলিশার্স । বৈশাখ, ১৩৯২ ।

(ন)

১৭। নন্দী, ড. ঊর্মি ---'বনফুল ঃ জীবন, মন ও সাহিত্য'। করুণা প্রকাশনী । প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা পুস্তকমেলা --- ১৯৯৭ ।

১৮। নন্দী, ড. ঊর্মি ---'বনফুলের জীবনকথা ঃ শিল্প প্রসঙ্গে'। করুণা প্রকাশনী । প্রথম প্রকাশ --- ১৯৯৯ ।

১৯। নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ---'আত্মশুদ্ধ জীবন দৃষ্টির আলোকে বনফুল' (প্রবন্ধ) । ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত । বাণীশিল্প প্রকাশনা । প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৮২ ।

(ব)

২০। বনফুল --- 'রচনাবলী' (১-২৪ খণ্ড) । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড । তৃতীয় প্রকাশ ঃ ৮ই জুলাই ২০০১ ।

২১। বনফুল ---'পশ্চাৎপট' (১৬-তম খণ্ড) । গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড । তৃতীয় প্রকাশ ঃ ২রা শ্রাবণ, ১৪০৭/১৮ই জুলাই, ২০০০ ।

২২। বনফুল ---'মর্জিমহল'(২৪-তম খণ্ড) । তৃতীয় সংস্করণঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০০০ ।
২৩। বনফুল ---'কাব্যপ্রসঙ্গ', 'শিক্ষার ভিত্তি (দ্বাদশ খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড । তৃতীয় প্রকাশ ঃ ২৭শে অশ্বিন ১৪১০/ ১৪ই অক্টোবর ২০০৩ ।
২৪। বনফুল ---'রবীন্দ্রস্মৃতি' (বনফুল রচনাবলী ১৯তম খণ্ড)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড । তৃতীয় প্রকাশ, ২রা শ্রাবণ, ১৪০৭/ ১৮ই জুলাই, ২০০০ ।
২৫। বনফুল ---'তিলোত্তমা' গল্প । জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প'। বাণীশিল্প সংস্করণ ঃ জুলাই ২০০১ ।
২৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার ---'সমালোচনার কথা'। মডার্ণবুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড । পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০৮-২০০৯ । পরিশিষ্ট --- ১ ।
২৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. অসিতকুমার ---'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' । মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড । পুনর্মুদ্রিত নতুন সংস্করণ ঃ ১৯৯৫ ।
২৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক ---'লেখকের কথা' । নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ ।
২৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী শ্রীকুমার ---'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড । পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০১ ।
৩০। বসু, বুদ্ধদেব ---'প্রবন্ধ সংকলন'। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধ । দে'জ পাবলিশিং । ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ আগষ্ট ২০০৮ ।
৩১। বসু, বুদ্ধদেব ---'রবীন্দ্রনাথঃ কথাসাহিত্য'। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । চতুর্থ মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৮৩ ।

(ভ)

৩২। ভট্টাচার্য, জগদীশ সম্পাদিত ---'বনফুলের শ্রেষ্ঠগল্প' । বাণীশিল্প সংস্করণ ঃ জুলাই ২০০১, ভূমিকা ।
৩৩। ভট্টাচার্য, তপোধীর ---'ছোটগল্পের বিনির্মাণ'। অঞ্জলি পাবলিশার্স । পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ঃ জুলাই, ২০০৬ ।
৩৪। ভট্টাচার্য্য, পরেশচন্দ্র ---'সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' । দ্বিতীয় খণ্ড । জয়দুর্গা লাইব্রেরী প্রকাশনা । দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুন ২০০২ ।
৩৫। ভট্টাচার্য, বীতশোক ---'বৃন্তলগ্ন বনফুল' (প্রবন্ধ)। ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত । বাণীশিল্প প্রকাশনা । প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৮২ ।
৩৬। ভট্টাচার্য, বীতশোক ---'বনফুল ঃ শৈলীবিজ্ঞানের একটি সমীক্ষা' (প্রবন্ধ) । ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত । বাণীশিল্প প্রকাশনা ।

প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৮২ ।

(ম)

৩৭। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার ---'বনফুলের ছোটগল্প' প্রবন্ধ । ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত । বাণীশিল্প প্রকাশনা । প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৮২ ।

৩৮। মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার ---'সাহিত্য সমালোচনার রূপ ও রীতি'। দে'জ পাবলিশিং । প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০০৩ ।

৩৯। মজুমদার, ড. অভিজিৎ ---'শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব'। দে'জ পাবলিশিং । প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারী ২০০৭ ।

৪০। মজুমদার, মোহিতলাল ---'সাহিত্য-বিতান'। করুণা প্রকাশনী । প্রথম করুণা সংস্করণ ঃ নভেম্বর ২০০৬ ।

৪১। মজুমদার, সরিৎশেখর সম্পাদিত ---'সুনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ বড়গল্প ঃ বনফুল'। মডেল পাবলিশিং হাউস । প্রথম প্রকাশ ঃ কোলকাতা বইমেলা ১৯৯৭ ।

৪২। মিত্র, ড. সরোজমোহন ---'বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প'। তুলসী প্রকাশনী । প্রথম সংস্করণ ঃ আগষ্ট ১৯৯৭ ।

৪৩। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার ---'কালের পুত্তলিকা'। দে'জ পাবলিশিং । তৃতীয় সংস্করণ ঃ বৈশাখ ১৪১১, এপ্রিল ২০০৪ ।

৪৪। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার --- 'সাহিত্য সন্ধান'। সাহিত্য বিহার । দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ মার্চ ১৯৮৮ ।

৪৫। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার ---'বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা'। দে'জ পাবলিশিং । প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ২০০৪ ।

৪৬। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার ---'কালের প্রতিমা'। দে'জ পাবলিশিং । চতুর্থ সংস্করণ ঃ নভেম্বর ২০০৫ ।

৪৭। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার ---'বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস'। দে'জ পাবলিশিং । প্রথম দে'জ সংস্করণ ঃ জুলাই, ২০০০ ।

৪৮। মুখোপাধ্যায়, চিরন্তন সম্পাদিত ---'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র'। বাণীশিল্প প্রকাশনা । প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৫ ।

৪৯। মুখোপাধ্যায়, চিরন্তন সম্পাদিত ---'বনফুলের ছোটগল্প সমগ্র'। বাণীশিল্প প্রকাশনা । দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০৫ ।

৫০। মুখোপাধ্যায়, ড. বিমলকুমার ---'সাহিত্য-বিবেক'। দে'জ পাবলিশিং । তৃতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ২০০৩ ।

৫১। মুখোপাধ্যায়, ড. বিমলকুমার ---'সহিত্যের মাত্রা ---দ্বান্দ্বিকসূত্র'। গ্রন্থ মেলা । প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৮১ ।

(র)

৫২। রায়, অন্নদাশঙ্কর ---'বনফুল প্রসঙ্গে' প্রবন্ধ । ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'বনফুলের কথাসাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত । বাণীশিল্প প্রকাশনা । প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৮২ ।
৫৩। রায়, অপূর্বকুমার ---'শৈলীবিজ্ঞান'। দে'জ পাবলিশিং । প্রথম দে'জ সংস্করণ ঃ অক্টোবর ২০০৬ ।
৫৪। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ ---'দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য'। দে'জ পাবলিশিং । দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৪০৭ / জুন ২০১০ ।
৫৫। রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ ---'রবীন্দ্রনাথ ঃ ছোটগল্পের প্রকরণশিল্প'। সাহিত্যলোক । ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ।

(স)

৫৬। সরকার, পবিত্র ---'কথাসূত্র'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড । প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪১০ ।
৫৭। সরকার, পবিত্র ---'গদ্যরীতি পদ্যরীতি'। সাহিত্যলোক । প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ ।
৫৮। সেন, ড. সুকুমার --- 'বনফুলের ফুলবন'। সাহিত্যলোক । প্রথম প্রকাশ ঃ দোলপূর্ণিমা ১৬৯০ ।
৫৯। সেন, সুকুমার ---'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'। আনন্দ । পঞ্চম খণ্ড । দ্বিতীয় মুদ্রণ, মে ২০০২ ।
৬০। সেনগুপ্ত, অচিন্তকুমার ---'কল্লোলযুগ'। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড । দশম প্রকাশ ঃ শ্রাবণ ১৪১৬ ।
৬১। সেনগুপ্ত, শ্রী সুবোধচন্দ্র ---'বাংলা সমালোচনা পরিচয়'। এ. মুখার্জী এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড । প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৭৬ ।

(খ) প্রবন্ধ ও পত্র-পত্রিকা ঃ -

১। গুপ্ত, ক্ষেত্র ---'স্বর্ণমুষ্টি ঃ বনফুলের গল্প'। যষ্ঠিমধু, বনফুল শ্রদ্ধার্ঘ সংখ্যা ১৩৮৬, বৈশাখ-আষাঢ় ।

২। গোস্বামী, পরিমল ---'বনফুল-এর গল্পসংগ্রহ'-এর দ্বিতীয় শতকে অন্তর্ভুক্ত ভূমিকা ।
৩। দাস, সজনীকান্ত সম্পাদিত ---'শনিবারের চিঠি'। নাথ প্রাইভেট লিমিটেড । ডিসেম্বর ১৯৯৪ । ৪। পশ্চিমবঙ্গ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ---'বনফুলের জন্মশতবর্শ স্মরণ ক্রোড়পত্র'। ৬ ও ১৩ই আগষ্ট, ১৯৯৯ ।
৫। বসু, রাজশেখর ---'বনফুল-এর গল্পসংগ্রহ'-এর প্রথম শতকে অন্তর্ভুক্ত ভূমিকা ।
৬। সেন, সুকুমার ---'বনফুল-এর গল্পসংগ্রহ'-এর তৃতীয় শতকে অন্তর্ভুক্ত ভূমিকা ।

ইংরেজি গ্রন্থ ঃ-

1) Allott, Meriam edited---'Novelist on the Novel'. Reprint-1965.
2) Beal, Anthony edited---'Selected Literary Criticism'. Heinemann pocket Book Edition, Reprint 1967.
3) DAVIN, DAN Selected---'English Short Stories of Today'. Second Series, Oxford University Press, Reprinted 1959 and 1961, Preface.
4) Hudson, Willam Henry --- 'An introduction to the study of literature'. Kalyani Publishers, Ludhiana, Reprint - 1989.
5) Nicoll, Allardyce ---'The Theory of Drama'. Doaba House Publishers, Reprinted - 2002.
6) Turner, G.W.---'A Pelican Book---Stylistics'. Penguin Books. Reprinted - 1979.
7) Trudgil, Peter --- 'Sociolinguistics: An Introduction'. Pelican Books. Reprinted 1982.

Nikhil Chandra Roy
26/4/2012
Associate Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

সুবল কান্তি চৌধুরী
26.4.2012

Associate Professor
Department of Bengali
University of North Bengal